আরব বেদুইন

বিক্রমাদিত্য

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা ১২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

প্রয়াত দিলীপকুমার গুপ্তকে

লেখকের অন্যান্য বই

রিভল্যুশন
মার্ডার অ্যাট মিডনাইট
লাভ ক্রাইম মার্ডার
লাভ মি কিস মি
ব্যাংক রবারি
সিন্ডিকেট
বেইমান
ডেডবডি
সিক্রেট এজেন্ট
পাপি
কলগার্ল স্পাই
সর্দার
ফতেনগরের লড়াই
নতুন যুগের স্পাই
স্পাই গেম
গোল্ড স্মাগলিং
ইনফরমার
স্বাধীনতার অজানা কথা
মুকুটহীন রাজা, জওহরলাল
কমরেড স্পাই
গ্রেট গ্যাম্বলার
স্পাই
স্মাগলার
ডবল ক্রস
অডিসিয়াস
কে. জি. বি. (রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশ)
অপারেশন সার্চলাইট

ভূমিকা

'আরব বেদুইন' নতুন করে ঢেলে লেখা হল। বহু কাহিনী যা প্রথম সংস্করণে ছিল না, জুড়ে দে'য়া হল। বলা যায় আজকের আরব বেদুইন হল এক 'নতুন বই'।

'আরব বেদুইন' লিখবার প্রথম অনুপ্রেরণা পাই ১৯৬৫ সালে, যখন বেরুটের বিখ্যাত প্রকাশক, খায়াত লাইব্রেরীর দুই মালিক পল খায়াত এবং সমীর খায়াত আমাকে 'স্যার রিচার্ড বার্টনের' 'আরব্য রজনীর সহস্র কাহিনী, (আলফ লায়লা ও লায়লা) খায়াত লাইব্রেরীর সংস্করণের জন্যে সংকলন ও সম্পাদনা করবার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ সময়ে আমার এ কাজের সহযোগী ছিলেন দুনিয়া শাবন্দর [ইরাকের প্রাক্তন গৃহমন্ত্রীর কন্যা]। সহস্র রজনী সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে আমি বহু কৌতূহলোদ্দীপক রসাল কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হই। পরে ঐ সব কাহিনী, বর্তমানের বিভিন্ন আরব রাজনৈতিক ঘটনা, নাইট ক্লাব এবং বিভিন্ন ধরণের স্মাগলিং-এর সত্যিকার ঘটনাকে এক ককটেল তৈরি করে আজ পাঠকদের কাছে পেশ করা হল।

কিন্তু এইখানে সহজে 'আরব বেদুইন' কাহিনীর দাঁড়ি টানা যাবে না। আরো অজস্র গল্প ও কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা আছে যা বর্তমান এবং অতীতে কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে ভাল ককটেল তৈরি করে পাঠকদের কাছে বলবার ইচ্ছা রইল। 'আরব হারেম কাহিনী', 'গোঁড়াপন্থীদের জীবনী', 'বেলি ড্যান্সারের জীবনী' মেয়েদের 'তালাক' ইত্যাদি নিয়ে কিছু বলবার আশা রাখি। এখানে বলা দরকার স্যার রিচার্ড বার্টনের 'সহস্র আরব্য রজনীর' কাহিনী ষোলো খণ্ডে প্রকাশিত করা হয়েছিল। এই ষোলো খণ্ডের পাদটীকায় বহু তথ্য, মূলক কাহিনী ঘটনা আছে যা বর্তমান যুগের শিক্ষকদের পাঠকদের জানা আবশ্যক। [দুঃখের বিষয় স্যার রিচার্ডের আরব্য রজনীর একটি ভাল মূল অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়নি।] এই সহস্র আরব্য রজনীর অনুকরণে আমি তিনটি বই 'নাইট ক্লাব' 'বেলি ড্যান্সার' এবং 'কালোসোনার প্রেম কাহিনী' লিখবার আশা রাখি। বিশেষ করে 'কালো সোনার প্রেম কাহিনী' আজ আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এই কালো সোনার প্রেম, যার আর এক নাম হল ব্ল্যাকগোল্ড 'সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয়' পেট্রোল নিয়ে প্রেম কাহিনী, রাজায়-রাজায় লড়াই, সহস্র আরব্য রজনীর কাহিনীর চাইতেও কৌতূহলোদ্দীপক।

আর একটা কথা এ জবাবদিহি শুধু পাঠকের কাছে নয়, প্রকাশকের কাছেও দেওয়া দরকার। একদিন দুদিন নিয়ে ভবঘুরের জীবনী নয়। দৈনন্দিন নিয়মে বাঁধা আইন কানুনে তার জীবনের চাকা ঘোরে না। যাযাবর কখনই সমাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। তাই ভবঘুরের জীবন কাহিনী বয়ে যায় অলস গতিতে।

লেখা শুরু হল। অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে কখনই বেগ পেতে হয়নি কিন্তু কল্পনা নিয়ে উপন্যাস তৈরী করতে গিয়ে কলম যেন আটকে গেল। তাই কয়েক বছর পরে আরব বেদুইনের অভিজ্ঞতা পেশ করলাম।

হয়তো আমার এই গল্প কখনই লেখা হত না। জীবনের বহু দুর্বল মুহূর্তে বহুজনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, তাদের জীবনীকে ভিত্তি করে উপন্যাস লিখব। লায়লা, কল্যাণী সেন, রুকশানা এবং সর্বশেষে ইভন পেরেরার জীবনী শুনে অভিভূত হয়েছিলাম। তাদের কাছে নিজেকে লেখক বলে পরিচয় দিয়েছিলাম এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যত মিথ্যে কথা লিখব তার মধ্যে শুধু তাদের জীবনই থাকবে সত্যি ঘটনা।

কল্যাণী সেন ছাড়া আমার এই কাহিনী পড়তে কেউ সক্ষম হবেন কিনা জানিনা। আমি জানি আমার এই কাহিনী পড়ে কল্যাণী সেন কী মন্তব্য করবেন? বলতে পারবেন, বিক্রমাদিত্য আর যাই পারুক না কেন অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস তৈরি করতে পারে না কিন্তু কল্পনার জাল বুনতে পারে। আর প্রকাশক এই বইয়ের ভালমন্দ বিচার করবেন বইয়ের কাটতি দেখে।

বিক্রমাদিত্য

আরব বেদুইন

চলুন আমরা বিদেশ ঘুরে আসি।

দেশ দেশান্তরে, আরব বেদুইনের দেশে, আরব্যোপন্যাসের রাজ্যে। আজ বিংশ শতাব্দী, ঐতিহাসিক নগরী দিল্লী থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিলাসিতার কেন্দ্রে ভ্রমণ করার জন্যে ময়ূরপঙ্খী নাও-এর প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের বাহক হলো আধুনিক সভ্যতার প্রতীক বোয়িং। সাগর পাড়ি দেবার দিন ঘুচেছে, আজ হলো পুষ্পকরথের যুগ। দুর্গম গিরি, নদ-নদীর বাঁধন ভাঙবার দরকার নেই। আজকের ভ্রমণ হলো আকাশে-বাতাসে, হোটেলে শহরে, নাইট ক্লাবে। এ হলো যাযাবরের যুগ, ভবঘুরের পৃথিবী।

হয়তো আপনারা আমাকে চেনেন না। কারণ দীর্ঘ কয়েক বছর হলো, দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচেছে। কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। কারণ আপনারা বাঙালী পাঠক, আমি লেখক। আপনাদের সুখদুঃখের কাহিনী নিয়ে আমার কারবার, আপনাদের মনের কথা নিয়ে আমি বেচাকেনা করি। আমি আজ পরদেশী বটে কিন্তু আমি বাঙালী, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির 'অকৃতজ্ঞ সন্তান'।

'অকৃতজ্ঞ' কারণ আমি তো ধুতি পরিনে, বাংলায় কথা বলিনে। আমি পাশ্চাত্যের প্রভাবে পরিপুষ্ট চটকদার সাপ্তাহিকী থেকে আমার জ্ঞান, কফি-হাউস আমার জীবনকেন্দ্র। আমি হলাম সেই—আপনারা যাকে বলেন 'জার্নালিস্ট'।

পরিচয় দিলাম বটে, কিন্তু নাম বলিনি। কারণ আমি বহুরূপী, ছদ্মবেশী, যে কোন নামে আপনারা আমায় ডাকতে পারেন। কিন্তু তবু যে নামে আপনারা আমাকে সহজে চিনতে পারবেন, অর্থাৎ আমার যে ছদ্মবেশ আপনাদের কাছে পরিচিত, সে হলো 'বিক্রমাদিত্য'।

চলুন, এবার আমার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিলাসিতার কেন্দ্র বেরুটে।

সে রাতের কথা আমার আজো মনে আছে, সেদিনকার স্মৃতি কেন আমার মনে আছে বলতে পারব না। কতো দেশ ঘুরেছি, কতো সকাল সন্ধ্যা আমার আকাশ-বাতাস, জলে-ডাঙায় কেটেছে কিন্তু সব ভ্রমণকাহিনী তো মনে ধরে রাখিনি। কিন্তু সে রাত্রে অন্ধকার ভেদ করে আমার পুষ্পকরথ যখন বেরুট বিমান বন্দরে পৌঁছল, তখন আমার মনে হলো যেন কোন বিস্মরণীর দেশে এলাম। দিল্লী থেকে বেরুট, দীর্ঘ তিন হাজার মাইলের দূরত্ব। কিন্তু তবু সেদিন এ যাত্রা মনে হয়েছিল ক্ষণিকের, স্বল্পকালের। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই

হলো প্রথম নিদর্শন, নতুন সভ্যতার চিহ্ন। দিল্লীর স্মৃতি তখনও আমার কাছে ঝাপসা হয়ে যায়নি। কুতুবমিনার, লালকিল্লা আর রাষ্ট্রপতি ভবনের বাতিগুলো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আমার কানে সঙ্গীতের রেশের মতো পুষ্পকরথের তীব্র গর্জন, ভয়ার্ত আর্তনাদ যা দিল্লীর ঘুমন্ত নাগরিককে সচকিত করেছিল, গেঁথে আছে।

দেশ দেশান্তরে ঘুরে শুধু আমার আনন্দ নয়, বিস্ময়। মানুষের জীবন-যাত্রা, তার সমাজের উচ্ছল তরঙ্গ হলো আমার জ্ঞানের উৎস। তারই সন্ধানে আজ আমি ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে ঘুরছি দুর্গম প্রান্তে কুহেলিকার দেশে। কোলাহল মুখরিত পারী নগরী, অতীতের স্মৃতি ভান্ডার রোম নগরী আজও আমার স্মৃতিপটে রঙ্গীন হয়ে আছে। আইফেলতুরের উপর থেকে আমি শুধু পারীর জনস্রোতকে দেখিনি, আমি দেখেছি ফরাসিজাতির সভ্যতা। রোমের কলসিয়ামের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমি শুধু অতীত ঐতিহাসিক স্মৃতিকে রোমন্থন করিনি, আমি দেখেছি খৃষ্টধর্মের জাগরণ, তার প্রসার।

কিন্তু এই অতীত, এই প্রাচীন ঐশ্বর্য্য, বর্ত্তমানের বিলাসিতা আমার মনকে তৃপ্ত করেনি। জীবনের হিসেব নিকেশ মেলাতে গিয়ে দেখছি, যে জিনিসের সন্ধানে ঘুরছি তার সন্ধান পেলাম কই?

একদিন আফ্রিকার সবুজ বনানী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিলাম ঐ বিস্মরণীর রাজ্যে, কুহেলিকা ভেদ করতে। তখন মনে হয়েছিল সত্যের কিছুটা আভাষ পেয়েছি, আলোর সন্ধান পেয়েছি। শুধু নদী, পর্বত নয়, সে দেশের নাগরিক আমাকে অভিভূত করেছিল। দেখতে পেয়েছিলাম তাদের নগ্ন সভ্যতা, যে সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর কঠোরতার প্রলেপে তার সৌন্দর্য্যকে হারায়নি।

আমি আফ্রিকার প্রেমে পড়েছিলাম। শুধু সে দেশের সবুজ বনপ্রান্তর, তার কুহেলিকা আমাকে আকৃষ্ট করেনি, সে দেশের নাগরিকের সরলতা, তার ঔদার্য্য আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। তার সংস্কৃতি ভাল লেগেছিল।

আফ্রিকার বুকে বসে আমি ভেবেছি যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা শুধু দূরত্বকে অতিক্রম করেছে, আধুনিকতার শৃঙ্খল ভেঙ্গেছে, কিন্তু আফ্রিকার আদিম অধিবাসীর মানবতাকে ভাঙ্গতে পারেনি।

কিন্তু আজ এলাম নতুন দেশে, যেখানে অতীত এসে হাত মিলিয়েছে বর্ত্তমানের সঙ্গে, যেখানে দেশের মাটির বুক ধরে পড়ে আছে অতীত বিস্মৃত দিনের রেশ। যে দেশে বিজ্ঞান হলো ধর্ম, ধর্ম হলো রাজনীতি। এই সেই দেশ যেখানে চোদ্দশ' বছর আগে ধর্মের বাণী শুধু মানুষকে উদ্বেলিত করে তোলেনি, দেশ জয়ের প্রেরণা দিয়েছিল। ঐ কারবালা, ঐ মক্কামদিনা আজো অতীতের ম্লান গৌরব নিয়ে বেঁচে আছে। এ হলো ইসলামের জন্মভূমি, হজরত মহম্মদের কর্মস্থল। হজরত আজ বেঁচে নেই বটে কিন্তু তাঁর প্রচারিত ধর্ম অটুট আছে।

আর আছে হজরতের অজস্র ভক্তবৃন্দ, যারা আজো পবিত্র মক্কার দিকে তাকিয়ে করুণকণ্ঠে বলে 'লা-ইলাহা, মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্।'

কিন্তু ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে তো আমি আসিনি। আমি এসেছি এখানকার মানুষকে জানতে, তার সুখদুঃখের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হতে।

এ প্রান্তে এসে যে মানুষের সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় হলো, যার কাছ থেকে আমি মধ্যপ্রাচ্যের জীবনের কিছুটা আভাষ পেলাম তার নাম মালকানি। পরদেশী ভারতীয়। মালকানির সঙ্গে আমার পরিচয় আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত।

মালকানির সঙ্গে এই বিমানবন্দরেই পরিচয় হয়েছিল বলে সে রাত্রের স্মৃতিকে আমি ভুলতে পারিনি।

আজকে তাই এ বিমানবন্দর থেকেই আমার গল্প সুরু করব।

*　　　*　　　*

মরহবা ··

পেছন থেকে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পাই। সচকিত হয়ে উঠি। অস্ফুট-স্বরে জবাব দিই—মরহবা।

তাকিয়ে দেখি আমার প্রশ্নকর্ত্রী এক আরব সুন্দরী। কৈশোরে আরব্য উপন্যাসে তিলোত্তমা রূপসীর কাহিনী পড়েছিলাম। যৌবনে সে কাহিনী আমার কাছে হয়েছিল সুদূরের স্বপ্ন। কখনও কল্পনা করিনি যে কাহিনী আর বাস্তবতার মধ্যে মিল আছে। আজ তার প্রমাণ পেলাম। আরব সুন্দরীর সৌন্দর্য আমাকে হারুণ-অল-রশীদের স্বপ্নপুরীতে নিয়ে গেলো। মনে হলো, আমি যেন আরব্য উপন্যাসের সুন্দরীদের রাজ্যে এসেছি।

রূপে মুগ্ধ হয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার দৃষ্টি রূপসীর মনে সংশয় জাগাল। জিজ্ঞেস করল—ইংলিশ, ফ্রান্সেস, দয়েচ ····

লা, লা, কাদিমতু মিন আলহিন্দ '—আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি।'

মিন আল হিন্দ।—ইউ স্পীক ইংলিশ।

নিশ্চয়—সুন্দরীর কণ্ঠে ইংরেজী শুনে যেন আকাশ পেলাম। মনে হচ্ছিল তার আরবী ভাষার সঙ্গে রূপ বনছে না।

দিস ওয়ে প্লীজ – নারীকণ্ঠের আদেশ আমাকে শুনতে হলো।

শেষ রাত্রের মৃদুমন্দ বাতাস এসে শরীরকে দোলা দিচ্ছিল। প্লেন থেকে বিমান বন্দরের দালান বেশ খানিকটা দূরে। এতোটা পথ হাটতে হলো। আপন মনে হাটছিলাম, এমন সময় আমার পাশের এক ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আপনি ভারতীয়?

প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে যাইনি। এ ধরনের প্রশ্ন আমার এই দীর্ঘ পরবাসে কতোবার শুনেছি কিন্তু গা করিনি। কারণ প্রশ্নকর্তারা ছিলেন পরদেশী। কিন্তু আজ যার কাছ থেকে এই প্রশ্ন শুনলাম, তার আকৃতি দেখে আমার একটুও সন্দেহ রইল না যে তিনিও আমার দেশবাসী।

সহজ, সরল কণ্ঠেই আমি জবাব দিই—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

আমিও ভারতীয়—আমার নাম মালকানি। তবে দিশী ভারতীয় নই, আপনারা যাকে বলেন পরদেশী ভারতীয়, মানে ওভারসীজ ইণ্ডিয়ান। বিদেশেই মানুষ, দেশের জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। শুধু আছে ব্যবসার সম্পর্ক, পয়সার লেন-দেনের ব্যাপার।

পরদেশী ভারতীয়, 'ওভারসিজ ইণ্ডিয়ান' এই কয়েকটি অক্ষর আমাকে বেশ দোলা দিল। বহুবার, বহু জায়গায় এই কয়েকটি শব্দ, এই দলের লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। নায়রোবী, মোম্বাসা, সিঙ্গাপুর, বাহেরিনে আজও অসংখ্য ভারতীয় যাদের ললাটে লেখা আছে এই পরিচয় পত্র। এরা মনে প্রাণে বিদেশী, ইংরেজের রাজনীতিতে পরিপুষ্ট তবু এদের জীবনে সন্ধ্যার প্রদীপের মতো ভারতের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। ব্যাঙ্কক থেকে আক্রা, কোয়েট থেকে ন্যুইয়র্কে, এরা মাতৃভূমির চিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছে।

মালকানির পরিচয় আমাকে খুসী করেনি। কারণ দীর্ঘকাল ধরে এই পরদেশী ভারতীয়দের প্রতি আমার একটা বিশ্বেষ ছিল। তাই তার কথাগুলোকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। কারণ তার কণ্ঠের মধ্যে এমন একটা বন্ধুত্বের রেশ ছিল, যা আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি।

বিমানবন্দরের কর্তাদের এবং কাস্টম্‌সের বেড়াজাল কাটিয়ে বাইরে এসে দেখি মালকানি আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

আপনার জন্যে দেরী করছিলাম—এমন সহজ কণ্ঠ যেন বহুদিনের পরিচয়।

আমার জন্যে?—আমার কণ্ঠের বিস্ময় তাকে একটুও বিচলিত করল না।

ম্লান হেসে জবাব দেয়—ভারতীয় কেউ বিদেশে এলেই আমরা তার দেখা-শোনা করি। আপনি আমাদের অতিথি। জানেন তো বিদেশে পরিচিত কেউ না থাকলে কতো অসুবিধে। মাঝ সমুদ্রে পড়তে হয়। আপনাকে এ বিপদের মধ্যে ফেলে যাই কী করে? যাক্‌গে কোথায় ঠাঁই হচ্ছে?

হোটেলে—আমার জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত।

হোটেল ঠিক হয়েছে?

না, তবে এয়ার-কোম্পানীর কর্তারা ভরসা দিয়েছেন হোটেল ঠিক করে দেবেন।

আপনার আপত্তি যদি না থাকে তবে আমার সঙ্গে যাবেন?

কোথায়?—আমার প্রশ্নে কৌতূহলের রেশ ছিল।

এ ধরনের নেমন্তন্ন আগে কখনও পাইনি। তাই একটু বিস্ময় হয়েছিল!

মালকানির মুখের হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি। হেসে জবাব দিল—ভয় পেয়ে গেলেন? চিন্তা করবেন না। আমার সঙ্গে থাকবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবো না। কারণ আপনি শিক্ষিত সাংবাদিক। আমি ব্যবসায়ী। পয়সা নিয়ে কারবার। আমরা তো শিক্ষার মর্যাদা দিইনে। আমাদের বিদ্যে

নাম সই-করা অবধি। তবে যা বলছিলাম। আমার জানাশোনা হোটেল আছে। সস্তা অথচ ভালো। বিদেশে এ দুটো জিনিষ কখনই পাবেন না। এয়ার কোম্পানীর মারফৎ হোটেল পাবেন সত্যি, কিন্তু এর জন্যে আপনাকে বিস্তর পয়সার খেসারৎ দিতে হবে। আলাদীনের হোটেলে তো আর সারাটা জীবন কাটাতে পারবেন না।

সেদিন মালকানির প্রস্তাব সহজে উড়িয়ে দিইনি। সংকোচ দ্বিধা থাকলেও আপত্তি করিনি। কারণ ভবঘুরের প্রয়োজন অর্থের। মধ্যপ্রাচ্যে এই একমাত্র সম্বল, বিপদের বন্ধু। পয়সার সাশ্রয় আমাকে করতেই হবে। সস্তায় ভালো হোটেল মেলা সত্যিই ভাগ্যের নিদর্শন। মালকানির প্রস্তাবকে সানন্দে গ্রহণ করলাম। ট্যাক্সিতে গিয়ে দুজনে চেপে বসলাম।

প্রভাতের আলো এসে তখনও বেরুট নগরীর অন্ধকারকে ঘুচায়নি। রাত্রের স্তব্ধতা, জনমানবহীন রাস্তা, সব মিলিয়ে নগরীকে আরো রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। কখনও কখনও বহুদূর থেকে ভেসে আসছে গভীর গর্জন, কুকুরের করুণ আর্তনাদ।

জোরে গাড়ী চালাবার যো নেই। কারণ বড়ো রাস্তার কোণে কোণে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন হয়ে আছে। তাদের হাত এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। শেষ রাত্রের ক্লান্ত যাত্রীকে তাদের কাছে জবাবদিহি দিতে হচ্ছে।

পুলিশের এই সতর্কতা আমাকে বিস্মিত করেছিল। হয়তো আমার মানসিক উত্তেজনা মালকানির নজর এড়ায়নি। হেসে বলল, বিক্রমাদিত্য, বিপ্লবের রাজ্যে এসেছেন। ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে Land of Coup D'etat দু-বছর আগে এদেশে শাসনতন্ত্রের অদল-বদল হয়েছে এই বিপ্লবের দরুণ। তাই দেশে সতর্কতার প্রয়োজন এবং খানাতল্লাসী এই সতর্কতার নিদর্শন।

সেদিন পুলিশের তীক্ষ্ম নজর এবং জবাবদিহির হাত থেকে আমিও রেহাই পাইনি। আমার সাংবাদিক পরিচয় আমার মুক্তিকে সহজ করে দিয়েছিল।

শেষ রাত্রের বেরুট নগরী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার সর্পিল পথ, ঐশ্বর্যের প্রতীক চকমিলানো অট্টালিকা, আমার মনে বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল। এই হলো মধ্যপ্রাচ্যের প্যারী, বিলাসিতার রাজধানী। আজ নয়, বহুদিন থেকে এই ছিলো পশ্চিম দিগন্তের দরওয়াজা, হৃদয় বিনিময়ের বাজার।

বহু একমুখী রাস্তা পার হয়ে আমরা যখন হোটেলে এসে পৌঁছলাম তখন ভোরের আলো এসে বেরুট নগরীকে সজাগ করে তুলেছে।

হোটেলের নাম ওমর খৈয়াম। শহরের একপ্রান্তে, আভিজাত্য বর্জ্জিত বহু-কণ্ঠস্বরে মুখরিত। এই হোটেলের মাধ্যমেই আমার মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয়।

* * *

সাংবাদিকের দিন কাটে কল্পনার জাল বুনে, কল্পনা দিয়ে সে সংসার গড়ে,

ভাঙ্গে, হাসি-কান্নার হাটবাজারে বেচাকেনা করে।

কিন্তু বেরুট নগরীর দ্রুত জীবন স্রোতে আমার মন বয়ে গেলো। অনামুখী কাল্পনিক ঔপন্যাসিক আমি মালকানির জীবনের আবর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

কী করে সেইটে বলছি।

আমাকে হোটেলে পেঁাছে দিয়ে বেশ কয়েকটা দিন মালকানি গা ঢাকা দিয়েছিল। কাজের চাপে আমিও মালকানির অস্তিত্বকে ভুলতে চলেছিলাম। কিন্তু ভুলতে পারলাম কই?

আবার হঠাৎ একদিন মালকানি এসে আমার হোটেলে উপস্থিত।

কোথায় ছিলেন? আমি কৌতূহলী, তাই প্রশ্ন করি।

ব্যবসায়ীর নানা ধাঁন্ধায় ঘুরতে হয়। সময় আর দিনরাতের হিসেব নিকেষ করে কাজ করলে কী আর পয়সা আসে। এই যে শহরটা দেখছেন, বিচিত্র শহর। কোথায় কী হচ্ছে কিছুই জানবার উপায় নেই। কী করে যে পয়সা রোজগার হয় এইটেও বিচিত্র ব্যাপার। ভেবে দেখুন, এ দেশের কী আছে? শুধু আপনাদের মতো যারা মুসাফির, অর্থাৎ যারা ভবঘুরে, কোথাও ঠাই নেই, তারা আসে এখানে পয়সা খরচ করতে

তাহলে এদেশের অর্থ আসে কোত্থেকে?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বিচিত্র মশায়, বিচিত্র। কী করে যে কী হয় কিছুই টের পাবেন না। তবু দেশ সমৃদ্ধশালী। কারণ বহু দেশের সরকার মনে করেন যে এখানে পয়সা খরচ করা সার্থক। কারণ এটাই হলো মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র দেশ যেথায় বাধ্য-বাধকতা নেই। এলেন এদেশে জানুন গোটামুলুকটা। নো দি কান্ট্রি এ্যান্ড—

মালকানি তার কথা শেষ করল না। কিন্তু আমি তার অসম্পূর্ণ কথাটা কী জানতে চাইলাম। বলুন না, কী বলছিলেন····

বলছিলাম ইউ মাস্ট নো দি কান্ট্রি এ্যান্ড উইম্যান। নারী ও নগরী, বিচিত্র স্যার। এই যে গোটা শহরটা দেখছেন, এর খ্যাতি কিসের জন্য? নাইট ক্লাবের জন্য। এখানে নাইটক্লাব, ক্যাবারে গার্লের ছড়াছড়ি। গিয়েছেন কখনও কাসিনো দ্য লিবাঁতে? দেখবেন রূপসীর ছড়াছড়ি। ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানিস, বর্তমানে অবশ্য কিছু সুইডিশ মেয়েও আসতে সুরু করছে, শুধু নেই আমাদের ভারতীয় মেয়ে। ভালোই, থাকলে আর শহরে থাকবার যো থাকতো না। সবাই দালাল ঠাওরাতো।

আমি এবার একটু সাহস করে বলি—আপনার কিসের ব্যবসা? মেয়ে ঘটিত কোন কিছু নয়—

পাগল হয়েছেন! ও দুষ্কর্মের ভেতর আমি নেই। বড়ো নোংরা কাজ। কিছুদিনের জন্যে একটা নাইটক্লাবও করেছিলাম। কোথায় মশায় দুটো পয়সা বানাবো, না পুলিশের টানাহ্যাচরায় জীবনটা অতিষ্ট হয়ে উঠল। নিশ্চিন্ত মনে

পয়সা রোজগার করব তার উপায় নেই।

কেন? কারণ জানতে চাইছেন? তবে শুনুন স্যার। বলতে যখন বসেছি তখন সব কথাই খুলে বলবো। ঐ যে নাইটক্লাব দেখছেন, যেখানে তিন ঘণ্টার জন্যে আপনার মতো মুসাফিরের দল 'মোঁয়ে শান'দ' শ্যাম্পাইনের বোতল ভাঙছেন আর ভাবছেন জীবনটা কী মজার, শুধু নারী আর সুরা এই নিয়ে পৃথিবী, তাদের মতো বোকা আর নেই। এই ধরুণ না কেন, নাইটক্লাব রাখতে হলে মেয়েমানুষ পুষতে হবে। হরির মা, গৌরীর পিসিকে রাখলে চলবে না, একদম সেরা জিনিস চাই। আর সেই মেয়েমানুষকে পোষা তো চাট্টিখানি কথা নয়। একটা মেয়ে নয় প্রায় ডজনখানেক। কেউ ফ্লোর-শো করবে, কেউ চা-চা নাচবে—কেউবা বেলি-ড্যান্সার হবে। বেলি ড্যান্স মধ্যপ্রাচ্যের স্পেশিয়ালিটি, নাচটা এমন যে আপনাদের বোম্বাই ফিল্মের ভাষায় বলতে হবে লিলটিং, টিলটিং। একবার দেখলেই মাথা ঘুরে যাবে—

মালকানি এবার একটু দম নিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—কিন্তু মশায় মেয়ের নাচ দেখিয়ে তো আর পয়সা আসে না। ভাড়া খাটাতে হয়! ঐটে হলো আসল ব্যবসা। আর খদ্দের কারা জানেন?

কারা?—আমি প্রশ্ন করি।

আপনি নন, বড়ো বড়ো সাহেব, ব্যবসায়ীরা নয়। এ বাজারের বড়ো কাপ্তান হলো সৌদী আরাবিয়ার শেখ আর কুয়েট অঞ্চলের রুই-কাতলারা। রিয়াদে গিয়েছেন কখনও? যাননি? দেখবেন ঐ রাজ্যে মদ মেয়েমানুষ, সিনেমা কিছুরই বালাই নেই! কিন্তু আমাদের শেখ সাহেবদের স্ফূর্তির মন। এই মরুভূমিতে জীবন কাটবে কী করে? তাই প্রতিমাসে নিদেনপক্ষে একবার বেরুট নগরীতে আসা চাই। ওদের দিয়েই বেরুটের নাইটক্লাব।

এবার আসুন আমার সঙ্গে নাইটক্লাবে। কাসবা আছে, লিডো আছে, কিট্-কাট্ মঁলারুজ। কিন্তু সব ক্লাবের একই ব্যবসা। নাচটা হলো আঙ্গিক—বাকীটা স্যার · যাক্ স্যার ও নিয়ে আলোচনা করব না। আইনে ধরবে। এবার তাকিয়ে দেখুন ফ্লোরের দিকে। ফ্লোরের উপর তীব্র লাইট এসে পড়েছে। দ্রুত লয়ে ফক্সট্রট কিংবা রাম্বা বাজছে। এমনি সময় শুনতে পেলেন—মাদাম, মঁসিও জে ভু সোয়াইত বোঁ সোয়ারি। নতর সোয়ারে কমান্স পারলা ড্যান্স দ্য হাওয়াই—। হাওয়াই নৃত্য সুরু হলো, ভাবছেন বুঝি হাওয়াই দেশে এলেন। দূর, দূর, আপনি যে নাচটা দেখছেন ওটা আমাদের ক্লাবেই তৈরী। কিছুটা কোমর বেঁকিয়ে, কিছুটা ঘাড় উঁচু করে, সব মিলে মাদকতার সৃষ্টি করা আর কী, অবশ্যি স্যার এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে যাতে আপনার মতো মুসাফিরের দল সজীব হয়ে ওঠেন।

এবার সৌদি আরাবিয়ার শেখ এলেন। প্রথম সারিতে তাঁর বাঁধা টেবিল। আসুন বা না আসুন ঐ টেবিল তার জন্যে বছরের জন্যে রিজার্ভ করা আছে।

মোটা ফী দেন। দেশে থাকতে যখন আর মন টিকছে না, অমনি এরোপ্লেন চার্টার করে এলেন বেরুটে। ভাবছেন পয়সার কথা? কিন্তু স্যার, গৌরী সেনের টাকা অর্থাৎ তেল কোম্পানীর টাকা। স্টার্লিং নয় ডলার। সেদিন আমাদের শেখ বেশী টাকা আনেন নি। লাখ খানেক। এ আর বেশী কী?

শেখ তো প্রথমে এসেই শ্যাম্পাইনের হুকুম দিলেন। সাদিয়া জামালের বেলী ড্যান্স। কী বলবো স্যার্ এমনি সেনসেশনাল প্রভোকেটিং ড্যান্স দেখলে আর বাড়ী ফিরতে চাইবেন না। নর্তকীর জন্যে শ্যাম্পাইন এলো। ওদিকে আলোর প্রখরতা বাড়ছে, কখনও লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনী। বিভিন্ন রংয়ে সাদিয়া জামালকে শেখ দেখলেন। কিন্তু তার মনে তৃপ্তি কই? চীৎকার করে বললেন—শ্যাম্পাইন! ভয়েব ক্লিকে। ম'য়ে শানদতে চলবে না। পর পর চারটা বোতল খোলা হলো। বোতল সব স্টেজের উপর রেখে দিলেন। আপনি ভাবলেন সাদিয়া জামাল ঐ শ্যাম্পাইন পান করলো বুঝি? দুত্তোর মশায়, ঐ মেয়ে কত মাছ খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলছে, ও ছোঁবে ঐ শেখের শ্যাম্পাইন। আর ঐ যে শ্যাম্পাইনের বোতল দেখছেন যার ভেতরে লেবেল আঁটা আছে মোঁয়ে শানদ ভয়েব ক্লিকে ঐ সব বুজরুকী। আমি তো জানি শেখ আসবে। তাই পুরানো বোতলে শুধু সোডা ভরে রেখেছি। শুধু খোলবার সময় একটু ভট করে আওয়াজ হলেই হলো। শেখ তুষ্ট। আর শেখ কী পান করছেন জানেন? শ্যাম্পাইন, হুইস্কি, ব্রান্ডি, ড্রাই মার্টিনি, শেরী, রাম—রাম-রাম। বসে বসে কী গিলছে জানেন, কোকাকোলা?

কোকাকোলা! আমি বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠি।

হ্যাঁ স্যার। কোকাকোলা, কোরাণে নিষেধ আছে, মদ ছোঁবেনা। থাক, এবার দেখুন ক'বোতল খোলা হলো। এক দুই তিন···প্রায় পঁচিশ বোতল। এক বোতলের দাম যদি হয় একশো টাকা তবে মোট কতো হলো? আড়াই হাজার। কিন্তু শেখের মস্তো পুঁজি। একলাখ। স্টেজের উপর শ্যাম্পাইনের বোতল রেখে তার মন তুষ্ট নয়।

রাত আড়াইটে তিনটের সময় শো শেষ হলো। আপনারা মুসাফিরের দল, পবিত্র মন নিয়ে হোটেলে ফিরে গেলেন। কিন্তু আমার আসল শো সুরু হলো। শুধু শেখ নয়, আরো দু'চার জন খদ্দের ওয়েটারদের মারফৎ আমার মেয়েদের খবর পাঠিয়েছেন। আমার ওয়েটারগুলো চালাক; লোক দেখলেই মক্কেল চেনে। বুঝতে পারে কতো টাকা। পয়সা নেই তবে জবাব শুনতে পাবেন—মাদমাজোয়েলের শরীরটা আজ ভালো নেই। বহু আশা ভরসা নিয়ে মক্কেল যদি কাল এলো তবেও এ কথাই শুনতে পাবেন। আর মক্কেল যদি শাঁসালো হন তবে শো'র শেষে মেয়েটির সঙ্গে দেখা পাবেন।

এবার শুনুন শেখের কাহিনী, সাদিয়া জামাল ড্রেসিংরুমে গিয়ে জামা কাপড় পাল্টাচ্ছে। পাউডার মাখছে, রুজ মাখছে, লিপস্টিক লাগাচ্ছে, এমনি সময় শেখ

দরজায় নক্ করলেন।

মরহবা—শেখ বলেন।

'আহ্লাওয়াসালান—সাদিয়া জামাল জবাব দেয়। শেখ কবিতা জানেনা। মরুভূমির লোক বেদুইন জাত কী করে প্রেম নিবেদন করতে হয় জানা নেই। কিন্তু হুঁসিয়ার লোক। রিয়াদ থেকে প্লেনে উঠবার সময় ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট, সোনার ইয়ারিং সব মিলিয়ে প্রায় এক কিলো সোনা নিয়ে এসেছে সাদিয়া জামালের জন্যে।

এক কিলো! এবার আমার বিস্ময়ের পালা।--মালকানি সাহেব আপনি কি বলছেন?

ঠিক বলছি স্যার, এক কিলো সোনা। এক ভরি নয়, দু'ভরি নয়, এক কিলো! কখনও কখনও দু-কিলো সোনা। ব্যাস ভালবাসার কথা বলবার আগেই ঐ সোনা ওর টেবিলে রেখে দিল।

সাদিয়া জামাল এমনি ভাব করল যেন সোনার তালটাকে দেখতে পায়নি। শুধু মাত্র একটুখানি মধুর প্রলোভনের হাসি হাসল। কিংবা বড়ো জোর শেখের একটু গা ঘেঁসে দাঁড়াল। শেখ চেষ্টা করল সাদিয়া জামালকে জড়িয়ে ধরতে, সাদিয়া একটু সরে গেলো? শুরু হলো লুকোচুরি খেলা।

আমি কী করছি জানেন। আড়াল থেকে এই কাণামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা দেখছি। কারণ এই খেলা শেষ হলেই আমার বখরাটা আসবে।

ইতিমধ্যে কাণ্ড ঘটে গেছে। শেখের প্রতিদ্বন্দ্বী বড়ো শেখ খবর পেয়েছেন, ছোট শেখ এক কিলো সোনা নিয়ে সাদিয়া জামালের কাছে গিয়েছে। ব্যস, বড়ো শেখ দু-কিলো সোনা নিয়ে আমার নাইটক্লাবে এলেন।

রাত প্রায় তিনটে। ছোট শেখের সঙ্গে সাদিয়া জামাল তখনও লুকোচুরি খেলছে। কখনও বা জড়িয়ে ধরবার ভান করছে—কিন্তু চুমু, নেভার স্যার। সাদিয়া জামাল অমন কাজটি কক্ষনো করবে না।

বড়ো শেখ এসেই বলে—মরহবা।

আমি জবাব দিই—মরহবা।

ওয়াহণ জামাল—জামাল কোথায়?

'সাহুন'—আমি ঘরটা দেখিয়ে দিই। মজাটা বাড়ছে। ছোট শেখের মুখটা তখন আমার দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়। বড়ো শেখ দরজায় নক্ না করেই ঢুকে গেলো। এবার দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখুন। সাদিয়া জামাল তাড়াতাড়ি ছোট শেখের সোনার তালটা টেবিলে ভরে রাখল, বড়ো শেখ দু-কিলোর সোনার তালটা সাদিয়া জামালের হাতে তুলে দিল। তারপর ছোট শেখ বড়ো শেখ দুজনেই চুপচাপ।

ভোরের আলো পৃথিবীর বুকে ধরা দিতে তখন আর বেশী দেরী নেই। সাদিয়া জামালের ঘুমন্ত চোখ। বেলী ড্যান্স করতে তার কম পরিশ্রম হয়নি।

তাই ছোট শেখের দাড়িতে একটা চুমু, বড়ো শেখের দাড়িতে দুটো চুমু খেয়ে সেদিনকার মতো ওদের বিদায় দিল।

এবার শুনুন আমার হাঙ্গামা কোথায়। সাদিয়া জামাল তো সোনা পেলো। আমার ভাগ্যে কী জুটলো? যাবার সময় বড়ো শেখ পঞ্চাশ ডলার দিল, ছোট শেখ দিল পঁচিশ। সে রাতের ইনকম পঁচাত্তর ডলার। অবশ্যি বাকি মেয়েদের দিয়ে আরো পঁচিশ-ত্রিশ ডলার হয়। কিন্তু আমার খরচ কী কম? মেয়েমানুষ পয়সা রোজগার করবে, কিন্তু একটা পয়সা খরচ করবে না। এবার ভেবে দেখুন, ঐ মেয়ের এবং আরো যে জনা দশেক মেয়ে আছে ওদের কসমেটিক্স্ লিপস্টিক, জামা কাপড় এই বান্দা যোগাড় করে কোত্থেকে?

বলুন যোগাড় করে কে?—আমি জিজ্ঞেস করি।

হাওয়ায়। কী করে যে এই সব জিনিস প্রেজেন্ট আসে আমি জানতেও পারিনে। রোজ দেখি কারু না কারু একটা-আধটা জিনিস আসছেই। এদিকে বড়োশেখ ছোটশেখ এন্তার টাকা খরচ করেই যাচ্ছে। সাদিয়া জামালের ভাবনা নেই। কিন্তু আমার খরচ আছে। পুলিশকে দিতে হয়, দালালকে দিতে হয়, আরো কতো কী বলতে পারি কিন্তু আপনাকে ঐসব বাংলাভাষায় লিখতে দেবেনা। যাকগে ছ'মাসের মধ্যে সাদিয়া জামাল লক্ষপতি আর আমি মালকানি যে তিমিরে সেই তিমিরে। তারপর একদিন হঠাৎ সাদিয়া জামাল সুইজারল্যান্ড চলে গেলো। চুনোপুটি নিয়ে কী আর দোকান চলে? আমার কারবার পাততাড়ি গুটালো। থাক স্যার, মেয়েমানুষের গল্প শোনালুম তো। এবার চলুন।

কোথায়?—আমি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করি।

শহর দেখতে। বিবলস দেখতে। আসল কথা কী জানেন। রাত্রিবেলা তো নাইটক্লাব করতুম, দিনের বেলায় ট্যুরিস্ট গাইড। বিবলস বালবেক ত্রিপোলী আর কতো কী! কয়েকটা গাইড কিনে মুখস্থ করেছি। আমেরিকান ট্যুরিস্ট দেখলেই বকতে সুরু করি—বিবলস থেকে বাইবেলের নাম উৎপত্তি। এডোনিস নদীর মুখে · ।

আমার কথা শেষ হবার আগেই শুনতে পাই আমেরিকান ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর হনি!

হনি—স্বামীর জবাব আসে।

আই থট্ বাইবেল কামস ফ্রম জেরুজালেম।

শুনুন কথা বিক্রমাদিত্য! বাইবেল কামস ফ্রম জেরুজালেম! ঐ যে বিবলস শহর দেখছেন, এখান থেকে বেশী দূর নয়। সোজা মোটরে চলে যান। প্রথম একটা নদী পার হবেন। নাম হলো নহর আল কলব অর্থাৎ কুকুরের নদী! আরবী ভাষায় নহর মানে নদী, কলব মানে কুকুর। এ নাম কী জন্যে জানেন? শত্রু যখন এ দেশে হানা দিতো তখন ঐ কুকুর চীৎকার করে সবাইকে

সজাগ করে তুলতো। এই নদীর সঙ্গে কতো দেব দেবীর নাম জড়িয়ে আছে জানেন ?

আমেরিকান সাহেব মেমসাহেবকে এডনিস নদীর গল্প শোনাই। এডনিস নদী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অবশ্যি প্রাচীন গ্রন্থে এডনিসের বিভিন্ন নাম। এখন শুনুন, প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসে আছে যে আসিরিসের স্ত্রীর নাম হলো ইসিস। হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনায় আসিরিস মারা গেলো। নীল-নদীর স্রোতে আসিরিসের কফিন ওই বিবলসের ডাঙ্গায় এসে উঠলো। কফিনটা দেশের সম্রাটের নজরে পড়লো।

সম্রাট কফিনটা যত্ন করে রেখে দিলেন। ঐদিকে স্বামীর চিন্তায় ইসিস এসে বিবলসে উপস্থিত··· সম্রাটের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে মৃতদেহ ঐখানে কবর দিল।

কিন্তু যাক বিবলসের খ্যাতি কেন জানেন ? কারণ এই নাম থেকে বাইবেলের নামাকরণ হয়েছে।

এর পুরো ইতিহাস শুনতে হলে আপনাকে অতীত দিনে চলে যেতে হবে। এই বিবলস ছিলো ভূমধ্যসাগরের এক সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা বন্দর। বেচাকেনার জন্যে দূর-দূর দেশ থেকে সওদাগরেরা আসতো। বিবলসের ব্যবসায়ীরাও বিদেশে যেতো। কি জিনিস বিক্রী করতো জানেন ? প্যাপিরাস, প্যাপিরাসের নাম শুনেছেন নিশ্চয়, মানে কাগজ। বিবলস থেকে প্যাপিরাস আসতো বলে এর নামকরণ হলো বিবলিয়া। খৃষ্টধর্মগ্রন্থ এই প্যাপিরাসে ছাপা হলো বলে এর নাম হলো বাইবেল।

যাক অনেক বিষয় নিয়ে আপনাকে বক্তৃতা দিলাম। এবার বিবলসের খ্যাতির আর একটা কারণ আপনাকে বলছি। ঐ যে ইংরেজী ভাষায় এ, বি, সি, ডি বা এলফাবেট—এই বিবলস থেকেই এই এলফাবেটের উৎপত্তি। বিজ্ঞান সম্মত হাতের লেখা সর্বপ্রথম এই বিবলসেই চালু হলো। থাক মশায়, এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার মতো জ্ঞান আমার নেই। তাই আর কোন বক্তৃতা না দিয়ে আপনাকে এবার বিবলসে নিয়ে যাবো।

চলুন, বিবলস।

*   *   *

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সমুদ্রপ্রান্ত ধরে আমরা ক্লান্ত মন ক্লান্ত দেহ নিয়ে বেরুট নগরীতে ফিরছি। রাস্তায় গাড়ীর উজান বইছে। দিন কাটাতে সবাই বেরুটের বাইরে গিয়েছিল। ছুটীর দিনে এমনি সবাই যায়।

মাঝরাস্তায় মালকানি হঠাৎ গাড়ী থামাল। বলল—যাবেন নাকি ক্যাসিনো দা লিবাঁতে ?

ক্যাসিনো দা লিবাঁ ? একটু বিস্মিত হয়েই আমি প্রশ্ন করি।

স্যার লেবাননের বিখ্যাত নাইটক্লাব। এ অঞ্চলে কেন সমস্ত ইয়োরোপেও

এর প্রচুর খ্যাতি। লেবাননে এসে যদি এই নাইটক্লাবে একবার না এলেন তবে আপনার এই দেশ দেখা হলো না। ভালো শো আছে আজ 'সিলভু প্লে'।

অলরাইট! আমি মালিকানির প্রস্তাবকে অনুমোদন করি।

এই তো পুরুষ মানুষের মতো কথা বলছেন। আসল কথা কী জানেন? এই দেখুন না, দেশ থেকে বড়ো বড়ো কর্তারা আসেন, তারপর চুনোপুঁটীর দল। আমি তাদের গাইড। শহর দেখিয়ে যেই তাদের বললাম—নাইট ক্লাবে যাবেন? অমনি তাদের মুখ শুকিয়ে গেলো। ভাবছেন ভয় পেয়েছে। পাগল আর কী! উৎসাহিত স্যর, উৎসাহিত। মেয়েমানুষ দেখবার প্রলোভন কী সামলাতে পারে। কিন্তু মনের কথা মুখে প্রকাশ করবেনা। ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে পয়সা কোথায়, ফরেইন এক্সচেঞ্জ নেই, তারপর · সব জবাব শুনে আপনি নিশ্চয় দমে গেলেন। কিন্তু মস্তো ভুল করলেন। ঠিক হোটেলে ফিরবার আগে কর্তা আপনাকে বললেন···অতো করে বলছেন যখন, তখন চলুন একবার নাইটক্লাবে ঘুরে আসি। এটাই যখন এ দেশের সবচাইতে বড়ো আকর্ষণীয়।

নিয়ে এলেন এদের কাসিনোতে। কাসিনো দ্য লিবাঁ বা কাসবায়। ভালো ফ্লোর-শো হচ্ছে। 'সিলভু প্লে' বা 'মন আমুর' কিংবা 'জয়েন ফী' দেখতে। নাচ হলো, গান হলো, ড্রিংক্ক হলো। কিন্তু কর্তার মন তুষ্ট নয়। রাত তিনটার সময় বহু সঙ্কোচ, বহু লজ্জা ভেঙ্গে হঠাৎ প্রশ্ন করল—মালকানি সাহেব, এই সব কাসিনোগুলো দেখলে মনে হয় বেশ রেসপেক্টবল জায়গা। কিন্তু এর চাইতে অন্য কোন কোথায় ঐ যে পারীর পিগাল অঞ্চলে বিস্তর ছড়িয়ে আছে কি যে বলে ওগুলো···দূর ছাই নামগুলো আমি ভুলেই গেছি····

হয়তো নাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন—লিডো, ফলি বার্জার? তীব্র প্রতিবাদ এলো—আরে না, না। এতো ভালো জায়গা। পিগালে একবার একটা ক্লাবে গিয়েছিলাম। ক্লাবটার পরিচয়পত্র নিয়ে যাইনি। কিন্তু মালকানি সাহেব, ভেতরে ঢুকে দেখি জঘন্য কাণ্ড-কারখানা। একা মানুষ গিয়েছি। স্ত্রী সঙ্গে নেই। বেশীক্ষণ একা বসে থাকতে লজ্জা হলো। ভাবলাম চলে যাই। কিন্তু যাই কী করে বলুন তো? এন্তার লোক আসছে, যাচ্ছে। এর মধ্যে যদি হঠাৎ উঠে যাই তবে লোকগুলো কী ভাববে! হয়তো বলবে ইণ্ডিয়ানগুলো ফ্রেঞ্চ কালচার এপ্রিসিয়েট করতে পারে না। তাই ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বসে থাকতে হলো। এমনি সময় আমার টেবিলে একটি মেয়ে উপস্থিত। বয়সের বিচার করিনি, কিন্তু রূপের কথা কী বলবো। একেবারে হেলেন অব ট্রয় ·

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি···কার কথা বলছেন?

হেলেন অব ট্রয়। নাম শোনেননি বুঝি অথচ ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করছেন? একটু ভর্ৎসনার কণ্ঠেই আমার কর্তা জবাব দেন। তার পর বলতে থাকেন মেয়েটি এসে আমায় বললে···ভুলে ভু ড্যান্সে আভেক মোয়া? মেয়েটির

কথা আমি বুঝতে না পেরে প্রথমটায় চুপ করে থাকি। এবার মেয়েটি ফিক করে হেসে বলে—কাম্ অন, ড্যান্স উইথ মী। আমি চমকে উঠলাম। বুড়ো মানুষ, পঞ্চাশের উপর বয়স। দেশে স্ত্রী পুত্র, ছেলের বউ আছে। অথচ পারীর পিগালে বসে একটা ছুকরীর হাত ধরে নাচবো। কিন্তু উপায় নেই। সে রাত্রে তিন চারবার মেমসাহেবের সংগে নাচলাম। কিন্তু মেমসাহেবের হাত থেকে রেহাই পাবার যো নেই। এর পর ড্রিংক্‌ক এলো, ফুড এলো, সব মিলিয়ে সে-রাত্রের খরচ হলো প্রায় পঁচাত্তর স্টার্লিং। ব্যবসার প্রসারের জন্যে সরকার দুশো পাউণ্ড দিয়েছিলেন। তার মধ্যে থেকে মেয়েমানুষের পেছনে পঁচাত্তর স্টার্লিং খরচ হয়ে গেলো। হোটেলে ফিরে এসে দেখি প্রোগ্রাম কার্ডে লেখা আছে—ন্যাডিস্ট ক্লাব। ছিঃ ছি! কী অপকর্মই না করলাম।

কর্তাকে সহানুভূতি দেখালেন। কিন্তু আপনার কথাকে বাধা দিয়ে তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা এই বেইরুতে এই সব ক্লাব নেই বুঝি?

থাকবে না কেন? তবে ওদের টাকার খাইটা বড্ডো বেশী। ফরেইন এক্সচেঞ্জের টানাটানির দিনে সব দিকটা আর সামলাতে পারবেন না।

কর্তা নিরাশ হলেন। এবার ভেবে দেখুন বিক্রমাদিত্য কী সব খদ্দের নিয়ে আমাদের কারবার। সামান্য নাইটক্লাবে যেতে প্রথমে যাঁর কুণ্ঠা হয়েছিল তিনিই 'ন্যাডিস্ট ক্লাব' দেখবার জন্যে ব্যাকুল। বৃদ্ধ মানুষ, দেশে ফ্যামিলি আছে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আসা অথচ প্রলোভনকে সামলাতে পারছেন না। কিন্তু আপনাদের মতো ইয়ংম্যানদের এই কপটতা নেই দেখে ভারী খুশী হলাম।

চলুন এবার কাসিনো দ্য লিবাঁতে যাই।

* * *

নাইটক্লাবে গিয়েছেন কখনও?

যাননি? কলকাতার বুকে বসে প্রকাশ্যে নাইটক্লাবে যেতে আপনার শরমে]ধবে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং শত্রুর দল আপনার পানে তীক্ষ্ণ জর দিয়ে তাকিয়ে আছে। কোন রাত্রে গ্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডের প্রিন্সেস বে গেলেন তো পরদিন আপনার এই অপকর্মের কথা সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে ড়লো। কলকাতা কী আর সেই অতীতের কলকাতা আছে? একেবারে াড়াগাঁ হয়ে গেছে।

তারপর আপনাকে নিয়ে প্রতিদিন যে কতো মুখরোচক গল্প হচ্ছে আপনি ·তে পারবেন না। যাক, এবার আপনাকে মধ্যপ্রাচ্যের বেরুট নগরীর িসিনো দ্য লিবাঁতে নিয়ে যাবো। সম্ভ্রান্ত জায়গা, গোলমাল হাঙ্গামার কোন নেই। অবশ্য আপনাকে কাসবা, কিট-কাট, লিডোতে নিয়ে যেতে রতাম, বেলী ডান্সার আমিনা বা সঈদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম ন্তু অশ্লীল সাহিত্য রচনা করবার জন্যে আপনাকে যে জরিমানা দিতে হবে

তার খেসারত প্রকাশকের দক্ষিণা থেকে কুলোবে না।

নাইটক্লাবের জন্যেই এই বেরুট নগরীর খ্যাতি। লন্ডন, ন্যুইয়র্ক বা ভিয়েনাতে আপনি যে জিনিস পাবেন না, তা পাবেন বেরুটে। বাগদাদ বা দামাস্কাসে নাইটক্লাবের উদ্দেশ্যে ঘুরে লাভ নেই। তেহরান বা ইস্তানবুলে গেলে পস্তাতে হবে। প্যারীর সীমা অতিক্রম করে যদি কোনো মনমাতানো নাইটক্লাবের খোঁজ করেছেন তো প্রথমেই আপনাকে বেরুটে আসতে হবে।

কাসিনো দ্য লিবাঁতে তখন লোক গিস্ গিস্ করছে।

আজকের শোর টাইটেল হলো 'মন আমুর' অর্থাৎ আমার ভালোবাসা।

মালকানি হেসে বলল—কী আশ্চর্য নাম! 'মন আমুর'। এর ভেতর ভালোবাসার নাম গন্ধও পাবেন না, শুধু নাচ গান হৈ-হল্লা। যাক এবার বলুন কোন শ্যাম্পাইনের অর্ডার দেবো। শাঁতোব্রিয়া না জার্মান স্পার্কলিং ওয়াইন।

শাঁতোব্রিয়া. কিন্তু পেট ভরাবার জন্যে তো কিছু খাবার নিতে হবে।

নিশ্চয়। দুটো ডিনারের অর্ডার দিচ্ছি। আলা কার্ত। সুপ লো আইনো, শিককাবাব আভেক দ্য রি, তারপর কাফে এবং সর্বশেষে শ্যাম্পাইন। মেনুটা কী প্রকার বলুন না?

চমৎকার।

কয়েক মিনিটের মধ্যে খাবার এলো। ইতিমধ্যে কাসিনোর খদ্দের ক্রমেই বাড়ছে। কেউ বারে বসে মদ গিলছে। কেউবা রুলেট বা ব্ল্যাক জ্যাক খেলছে।

মালকানি হেসে বলল —এইটেই বেরুটের বৈশিষ্ট্য, এখানে আপনি ইচ্ছেমতো জুয়ো খেলতে পারেন। আপনাকে বাধা দেবার কেউ নেই। অথচ এই কাজটি আপনি বাগদাদ বা দামাস্কাসে কিংবা আমানে বসে করেছেন তো আপনার গলাটি কাটা গেলো—অবিশ্যি আপনি যদি মুসলমান হন। কিন্তু বেরুটে এইসব ঝামেলা নেই। আপনি যে জাতেরই হোন না কেন, জুয়ো খেলার পথ আপনার জন্যে সর্বদাই খোলা।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—কারণটা কী বলুন না! মালকানি বলে—জুয়ো খেলা কোরাণে নিষেধ। বাগদাদে রিয়াদে কোরাণের বড্ডো বেশী কড়াকড়ি। কিন্তু লেবানন হলো বহু জাতির দেশ। এ শুধু মুসলমানদের নগরী নয়, ক্রিশ্চয়ান আর্মেনিয়ানদের শহর। কাজেই একের ইচ্ছেয় সব কাজ করা যায় না।

এবারে শো সুরু হলো।

প্রথমে দুটো ক্যারিকেচার। তারপর নাচ। মাঝখানে বেলীড্যান্স। নাচটা যখন বেশ জমে উঠেছে, দর্শকেরা যখন সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ মালকানি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—কী ব্যাপার?

বিক্রমাদিত্য—সী ইজ হিয়ার! হোয়াট দি হেল ইজ সী ডুয়িং হিয়ার?

সী ? কার কথা বলছো মালকানি ? আমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

লায়লা। মাই গার্ল লায়লা।

কথা শেষ করবার আগেই মালকানি কাসিনোর ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো। আমি স্তম্ভিত হয়ে শ্যাম্পাইনের বোতল নিয়ে টেবিলে বসে রইলাম।

* * *

কতোক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম মনে নেই। ইতিমধ্যে ইণ্টারভ্যাল সুরু হয়ে গেছে। মদের গ্লাস নিয়ে যে-যার ব্যস্ত। আমি শ্যাম্পাইন ছেড়ে হুইস্কীর অর্ডার দিলাম।

এই সঙ্কটে আমার কী কর্তব্য সেইটে চিন্তা করার প্রয়োজন।

কিন্তু বেশীক্ষণ চিন্তা করতে হলো না। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে বলে উঠলো— বিক্রমাদিত্য তুমি এখানে? বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখি— মাধবন নায়ার।

আমার কাহিনীর মধ্যখানে হঠাৎ মাধবন নায়ারের আবির্ভাব দেখে আপনারা যদি বিস্মিত হয়ে থাকেন তবে এইখানে আপনাদের একটু অতীতের বিবরণী দেওয়া প্রয়োজন।

মাধবন নায়ার পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহই তার কাজ।

মাধবন নায়ারের সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় আফ্রিকায় ডাকারে, পাঁওরুজ ক্যাবারেতে। ব্রাজাভিল থেকে সদ্য আমি ডাকারে এসেছি। একটা রাত এখানে কাটিয়ে বামাকোতে যাবো। এমনি সময় ঘটনাচক্রে পাঁওরুজ ক্যাবারেতে মাধবন নায়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো।

সেদিন আমি নাচ দেখতে পাঁওরুজে যাইনি, গিয়েছিলাম মনের ক্লান্তি মেটাতে। মাধবন নায়ার গিয়েছিল কোন এক ভারতীয়ের সন্ধানে। বহুদিন ধরেই সে লোকটার খোঁজ করছিল। অবশেষে খবর পেয়েছে, পাঁওরুজ ক্যাবারের রান্না ঘরে লোকটা চাকরের কাজ করছে।

আমি কাউণ্টারে বসে ড্রাই মার্টিনিকে ককটেল বানিয়ে খাচ্ছি এমনি সময় ওয়েটার এসে প্রশ্ন করল—মঁশিও ফরাসি বলেন ?

নিশ্চয়। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? ফরাসি ভাষায় পরীক্ষা দিতে তো এখানে আসিনি।

ওয়েটার হেসে জবাব দেয়— আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। এক ভারতীয় আমাদের কাছ থেকে কিছু খবর জানতে চান। তিনি ফরাসী বলতে পারেন না। যদি তার বক্তব্যটা তর্জমা করে দেন তবে সুবিধে হয়।

এমনি করে মাধবন নায়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সেদিন আমার চেষ্টায় মাধবন নায়ার সেই ভারতীয়ের সন্ধান পেয়েছিল। কাজ শেষ হবার পর আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বলল—আমার নাম মাধবন নায়ার।

সেদিন মাধবন নায়ার আমাকে তার প্রকৃত পরিচয় দেয়নি। কিন্তু তার পুরো জীবনী আমি পরে শুনেছিলাম। এর পর বহু জায়গায় সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি ও মাধবন নায়ার একসঙ্গে গিয়েছি এবং খবর সংগ্রহ করেছি।

আজ মাধবন নায়ারকে হঠাৎ বেরুট নগরীতে দেখে প্রথমটায় বিস্মিত হলেও পরে নিজেকে সামলে নিতে দেরী হয়নি। কারণ দেশ ঘুরে সংবাদ সংগ্রহই তার কাজ।

লুকিং ফর এ ম্যান? আমি হেসে প্রশ্ন করি।

সার্টেনলি। একটা গ্যাংগের সন্ধানে এই মধ্যপ্রাচ্যে ঘোরাঘুরি করছি।

গ্যাংগ! মাধবন নায়ারের কথা শুনে আমি একটু হকচকিয়ে যাই।

ইয়েস। ইউ নো হোয়াট ইজ হ্যাপিনিং ইন আওয়ার কান্ট্রি? গোল্ড স্মাগলিং। এই বেরুট আর হংকং হলো সেই স্মাগলিং এর ঘাঁটি। এ কাজটা শুধু বিদেশীদের কাজ নয়, ভারতীয়েরাও এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। আমি জানতে পেরেছি ওদের খবর। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে তোমায় দেখতে পাবো, এ কিন্তু কখনও আশা করিনি। হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর?

লুকিং ফর নিউজ। পরচর্চা হলো ভবঘুরের নেশা।

কদিন থাকবে?

ঠিক নেই। শুধু বেরুট নয়, বাগদাদ, দামাস্কাস, আমান নিয়ে আমার কারবার, মাঝে মাঝে আমাকে কায়রোও যেতে হতে পারে।

দেন হেল্প মী—মাধবন নায়ার এমন মৃদুকণ্ঠে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করল যে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

কিসের হেল্প?

এই গ্যাংগদের ধরবার জন্যে তোমার সাহায্য চাই। আমার খবর ওদের জানা আছে। অতএব প্রকাশ্যে কাজ করার অনেক অসুবিধে। তাই তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।

নায়ারের অনুরোধ আমি কোনদিনই উপেক্ষা করিনি। আজও করতে পারলাম না।

কথাটি মাধবন নায়ার আরো ফেনিয়ে বলল—বিচিত্র শহর বেরুট। বাইরে থেকে দেখলে পর বোঝবার যো নেই, এর ঐ পর্বতমালার অন্তরালে, রাত্রের জীবনের পশ্চাতে কতো রহস্য লুকিয়ে আছে। তুমি আমি যারা মুসাফির, শহর দেখে বেড়াই, শুধু হোটেলে হোটেলে জীবন কাটাই, এই রহস্যের কতোটুকু জানি? রোজ ভোরবেলা উঠে যে দৈনিক সংবাদপত্র পড়ো, ভাবতে পারো ঐ সংবাদের পেছনে শুধু অজানা অজ্ঞাত কুহেলিকা নয়, আরো কতো কী রহস্য জড়িয়ে আছে?

মাধবন নায়ারের কথা আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, কৌতূহলী করে তুলল। আমি সাংবাদিক, অতএব সংবাদপত্রের রহস্য সন্ধানী। সংবাদের পশ্চাতে যে

গোপন তথ্য থাকে সেইটুকু জেনেই আমার তৃপ্তি নয়—রহস্যের উৎস এবং কারো বিচিত্র কাহিনী জানবার আকাঙ্ক্ষাও আমার অপরিমিত।

মাধবন নায়ার বলল—জানো বিক্রমাদিত্য, মধ্যপ্রাচ্যে এই বেরুট নগরী হলো গুপ্তচরদের এক প্রধান ঘাঁটি। শুধু গুপ্তচরদের রাজধানী বললে ভুল হবে, বলতে পারো এ হলো আরব রাজনীতির এক প্রধান কেন্দ্র। এই মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে কোথায় কী হলো, জানতে চাও—চলে এসো বেরুটে। আজ এ শহরে যে খবর পাবে, বিশ্বজগত সে খবর পাবে আগামী কাল কিংবা আরো পরে। আর এই গুপ্ত সংবাদ-সংগ্রহের জন্যে কতো দেশের কতো বিভিন্ন জাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এক কথায় বলতে পারো বেরুট হলো মধ্যপ্রাচ্যের সুইটজারল্যান্ড।

যাক, এবার আমার কথায় আসা যাক। বহুসূত্রে জানতে পেরেছি যে, প্রতিদিনই এ শহর থেকে শুধু সোনা নয়, আরো বহু মূল্যবান জিনিস ভারতে পাচার হচ্ছে। কে করছে, কী করে হচ্ছে এসব যে আমাদের অজ্ঞাত তা নয়, কিন্তু মাল সমেত আসামীকে ধরতে পারছি না।

আমি হেসে জবাব দিই—বেশ তোমার বক্তৃতা তো শুনলাম। এবার আমার কাজটা কী হবে শুনি?

শুধু কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হবে।

তুমি কী বলছো নায়ার! এ ঘটনার ভেতর বান্ধবী এলো কোত্থেকে? আমি উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার করেই জবাব দিই।

ধীরে, বন্ধু ধীরে। জানোতো নারী জীবনের অপরিহার্য। সে জীবন ফুলের মতো নিষ্পাপ হোক কী কীটের হোক। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে—যারা এই কাজ করছেন, তারা শুধু অর্থ বিলিয়েই তাদের কার্য সমাধা করেন না, নারীর সাহায্যও তাদের একান্ত প্রয়োজন। কী করে, তার পূর্ণ বিবরণী আজ তোমাকে দিতে চাইনে। অন্য একদিন দেবো। এবার বলো--আমার প্রস্তাবে রাজী?

রাজী নিশ্চয়। কিন্তু প্রস্তাবটা যে কী—সেইটে তো জানতে পারলাম না।

অতি সামান্য। এই বেরুট নগরীতে যাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে শুধু তাদের উপর নজর রেখো। তুমি ভারতীয়—এ কাজের জন্যে এরা বহুদিন থেকেই ভারতীয়ের সন্ধানে আছে। যদি কোন বিচিত্র ঘটনা ঘটে তবে আমায় জানাতে ভুলো না। কার্লটন হোটেলে আমার সন্ধান পাবে।

মাধবন নায়ার চলে গেলো। আমি হতবাক হয়ে তার কথাগুলো ভাবতে লাগলাম। কী রহস্যের সন্ধানে মাধবন নায়ার ঘুরছে! আর আমি? গোপন তথ্য উদ্ঘাটন করতে আমি কী করতে পারি?

সেদিন নয়, বহুদিন পরে তার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

* * *

তার পরবর্তী ঘটনা এক দূতাবাসের ককটেল পার্টিতে।

নিমন্ত্রিত হয়ে সেই ককটেলে গিয়েছিলাম। সেইখানে হঠাৎ কিম ফিলবির সঙ্গে দেখা। লন্ডন-অবজার্ভার এবং ইকনমিস্টের মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদদাতা ফিলবিকে আমি চিনতাম। পার্টিতে আমার বন্ধু বিশপও ছিল। বিশপ লন্ডন ডেলী-এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা। এটা তার ছদ্মনাম, সাংবাদিক মহলের উপাধি। আফ্রিকা জগৎ সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান। সেইখানেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। দূরপ্রাচ্যে যাবার পথে বেরুটে কয়েকটা দিন কাটাচ্ছে।

বিশপ আমাকে বলল—লোকটা কে জানো?

না, সহজ সরল কণ্ঠেই আমি জবাব দিই।

কিম ফিলবি এম-আই-সিক্সের লোক। বিশপ বলল। আমি এবার একটু বিস্মিত হলাম। মাধবন নায়ারের কথা মনে পড়লো। বেরুট নগরী গুপ্তচরদের ঘাঁটি। তবে কী ফিলবি তাদেরই একজন!

সেদিন ফিলবির সঙ্গে পরিচয় করার আগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আলাপ করার সুযোগ হয়নি। পরে অবশ্য হয়েছিল, সে কাহিনী বারান্তরে বলা যাবে। হঠাৎ দেখতে পেলাম ফিলবি একটি আরবী মেয়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলছে, —হ্যালো লায়লা, তোমার কী খবর?

লায়লা, নামটা শুনেই আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে উঠলো। এই কী সেই লায়লা যার সন্ধানে মালকানি সেদিন কাসিনো থেকে হঠাৎ চলে গিয়েছিল। আমি তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে লায়লাকে দেখতে লাগলাম। অপূর্ব সুন্দরী, যার রূপ শুধু মানুষকে আকর্ষণ করে না, দগ্ধ করে। কিন্তু লায়লার রূপে আমি বিমুগ্ধ হইনি, লায়লার নামই আমাকে হতবাক করেছিল।

ফিলবির সঙ্গে সেদিন আমার কথা হয়নি। কিন্তু লায়লার সঙ্গে কিছু-দিনের মধ্যেই কয়েকটি ঘটনার ভেতর দিয়ে পরিচয় হয়ে গেলো। কী করে সেইটে এবার বলার প্রয়োজন।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে হঠাৎ মালকানির টেলিফোন পেলাম। বিক্রমাদিত্য সাহেব, একবার আসবেন আমার বাড়ীতে?

সেদিনকার কাসিনোর ঘটনা তখনও আমার হৃদয়ে রঙ্গীন হয়ে আছে। তাই বেশ একটু রূঢ়কণ্ঠেই জবাব দিলাম—যদি না আসি?

তাহলে শুধু দুঃখিত নয়, মনে আঘাত পাবো! আমার ব্যবহারে নিশ্চয় দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য, সেদিনকার পুরো ঘটনা যদি বলি, তাহলে আপনি আমাকে নিশ্চয় মার্জনা করবেন। আর সেই ঘটনা বলবার জন্যেই আপনাকে আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করছি। আসবেন কী?

এতো অনুরোধের পর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। আমিও করিনি।

সায়রা কানতারীতে মালকানির বাড়ী। বাড়ী খুঁজে নিতে প্রথমটায় বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল। রাস্তার এক প্রান্তে একটা ছোট গলির মুখে। এ অঞ্চলে

বাড়ীর নম্বর বললে তার হদিস কেউ দিতে পারে না—বাড়ীর মালিকের নাম বলতে হয়। সেই সূত্র ধরেই আমি মালকানির বাড়ী খুঁজে পেলাম। চারতলায় মালকানির আবাস। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। লিফট নেই। অন্ধকার দেওয়ালে হাত দিয়ে অনেক কষ্টে উপরে উঠে এলাম।

সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠবার সময় আমার বার বার মনে হয়েছে এ কোথায় এলাম! বাড়ীর আকৃতি দেখে আমার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেলো। একবার মনে হলো ফিরে যাই। কিন্তু এখন ফিরবার যো নেই। অনেকটা পথ চলে এসেছি। দেখা যাক আমার যাত্রার শেষ কোথায়?

চারতলায় আমার সামনে যে ঘর চোখে পড়লো সেইখানে মালকানির সন্ধান করলাম। এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। ফরাসী বা ইংরাজী কোন ভাষাই জানেন না। তবু আমার কথা বুঝতে পারলেন। আমি প্রশ্ন করি, ওহায়েদ হিন্দী বিল বেইত?

নাম--সংক্ষিপ্ত জবাব। পাশের একটা ঘর দেখিয়ে বললেন—লা হুন।

'শুক্রণ'।

কম্পিত হৃদয়ে এবার মালকানির দরজার কাছে এসে বেল টিপলাম। বেশ খানিকক্ষণ হলো, কোন সাড়া শব্দ নেই। এই খানিকটা সময় আমার কাছে প্রায় এক যুগ বলে মনে হলো।

প্রথমটায় মনে হলো হয়তো বাড়ীতে কেউ নেই। কিন্তু খানিকটা বাদেই যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—কাম ইন।

না, এ মালকানির কণ্ঠস্বর নয়। মনে হলো নারীকণ্ঠ। আমরা বাঙ্গালী, নারীকণ্ঠ সাধারণতঃ আমাদের সঙ্কুচিত করে তোলে। অতএব সেদিনও যে আমি ভীত হইনি একথা বলবো না। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার মনে হলো, আমি কলকাতা থেকে দীর্ঘ চারহাজার মাইল দূরে। এই পরবাসে আমার জীবন সম্বন্ধে কেউ অনুসন্ধিৎসু নয়। অতএব নারীকণ্ঠে দ্বিধা হবে কেন? ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম।

বেশ বড়ো ঘর। সাজসরঞ্জাম নেই বললে চলে। কয়েকটা চেয়ার টেবিল ঘরের আসবাবপত্র। বহু দূরে একটা শোবার খাট। আমার মনে হল কে যেন শুয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার সন্দেহ দূর হলো। আমি ভুল করিনি। সত্যি খাটের উপর শুয়ে আছে একটি মেয়ে। দেহ অনাবৃত, ঘরের মৃদু আলোর এ দৃশ্য চোখের দৃষ্টি এড়ায় না।

আমি অবিবাহিত, সভ্য সমাজের জীব। নারীর অনাবৃত দেহ দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। নারীর সৌন্দর্য সুধা আমি দূর থেকে পান করি। কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতি আমাকে শুধু ভীত নয়, অস্থির করে তুলল।

আমি ইতঃস্ততা প্রকাশ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে হলো,

জীবনের উপর দিয়ে যেন মস্তো ফাঁড়া কেটে গেলো। ভুল করেছি, এতো মালকানির আস্তানা নয়। ভাবছি কী করবো. এমনি সময় মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে সে পোষাক পরে নিয়েছে।

আমি লজ্জা প্রকাশ করলাম। সত্যিই কী অপরাধ করেছি?

আমার ক্ষমা ভিক্ষা যেন মেয়েটিকে লজ্জিত করে তুলল। হেসে বলল—সাঁন ফারিয়া। ভু শাসে' কেলকোঁ।

তার মধুর হাসি দেহ-সৌন্দর্যকে আরো মনমুগ্ধ করে তুললো।

'উই, উই'। আমি ফরাসী ভাষাতে জবাব দিই। মঁশিও মালকানি। ভু সাভে সোঁ আপরতামাঁ।

জবাব এলো ইংরাজী। দিস ইজ হিজ হাউজ। ইংরাজী এবং জবাব, দুটোই আমাকে আশান্বিত করে তুললো।

আমার নাম বিক্রমাদিত্য। জার্নালিস্ট। মালকানির বন্ধু। মালকানি আমায় আজ এখানে আসতে অনুরোধ করেছিল।

মঁশিও বিক্রমাদিত্য। নিশ্চয় আমি জানতুম আপনি আসবেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মালকানি বাইরে গেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন।

আমি এবার নির্ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। ঘরের অন্ধকারকে দূর করার জন্যে বাতি জ্বালতে হলো। সেই আলোয় তাকে চিনতে আমার কোন অসুবিধাই হলো না। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলল—মালকানির কাছে নিশ্চয় আমার নাম শুনেছেন। আমার নাম লায়লা।

* * *

বিস্ময় ও কৌতূহল বেঁচে থাকার সবচাইতে বড়ো অবলম্বন। জীবন-জটিলতা অনেক সহজ সরল হয়ে ওঠে, যখন বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙ্গে, কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। বহুদিন যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি—কিংবা যার অজ্ঞাত চরিত্রকে নিয়ে বহু স্বপ্ন দেখেছি, সে যখন এসে নিজে ধরা দেয় তখন সে হয় পরমপ্রিয়।

আরো কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে আমি লায়লাকে দূতাবাসের ককটেলে দেখেছিলাম। সেদিন তার দেহ-সৌন্দর্যের চাইতে তার রহস্যময়ী চরিত্র আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আজ যখন তার পরিচয় পেলাম, তখন তার রূপই যেন আমার কাছে সবচাইতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো।

আমি মানুষ, রক্ত-মাংসের জীব। পঞ্চ রিপুকে দমন করে এখনও দার্শনিকের স্তরে এসে পেঁছুতে পারিনি। রূপ আমাকে শুধু দহন করে না আমাকে বিচলিতও করে। কিন্তু তবু মনের আকাঙ্খাকে দমন করে আমাকে সভ্যতার মুখোশ পরতে হয়। অভিনয় করতে হয়, মিথ্যে কথা বলতে হয়। কারণ আমি সমাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ পশু।

বহুক্ষণ লায়লার কথার কোন জবাব দিইনি। হয়তো দেবার মতো আমার মানসিক অবস্থাও ছিল না। তাই লায়লা নিস্তব্ধতা ভাঙল।

আপনি আসবেন আমি জানতুম। কিন্তু ভোর থেকেই শরীরটা ভালো ছিল না। তাই বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। এমনি সময় আপনি এলেন।

আমি দুঃখিত। আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম। আমার জবাব যেন বেসুরো শোনাল।

কী বলছেন আপনি! বরং আমার প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত ছিল। কারণ, আপনি আসছেন এতো আমি আগেই জানতাম!

এবার আমি একটু অবাক হলাম, কারণ আমার আগমনের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কয়েক মুহূর্ত আগে যে ঘটনার সম্মুখীন আমাকে হতে হলো, তার কারণই আমি খুঁজে পেলাম না।

কী খাবেন? কফি না চা? মৃদুকণ্ঠে লায়লা প্রশ্ন করে।

যা আপনার মর্জি। আমি সর্বভুক।

বেশ, কফি?

টার্কিশ কফি তৈরী হলো। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে এসে লায়লা বলল— শুনেছি আপনি এ অঞ্চলে নবাগত। এখানকার দেশ আর জীবন নিশ্চয় আপনার নতুন লাগছে?

প্রতি দেশের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, মধ্যপ্রাচ্যের যে নতুনত্ব নেই এ কথা অস্বীকার করবো না। কিন্তু আমি বলবো যে প্রতিদেশের মানুষ হলো ··

লায়লা আমার কথাকে শেষ করতে দিল না। বলল—আপনি কী বলবেন জানিনা। কিন্তু আমি জানি—মানুষ কী। আমার কাছে বিংশ শতাব্দীতে সর্বদেশেই সর্বক্ষেত্রে মানুষ হলো 'হায়ওয়ান'। অর্থাৎ মানুষ হলো 'পশু'। বনেজঙ্গলে আপনি পশুর হিংস্রতা দেখতে পাবেন শুধু খাঁচার ভেতর নয়। তেমনি মানুষের হিংস্রতার আস্বাদ পাবেন যখন পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসে। ভগবান অন্ধকারের সৃষ্টি করেছেন কেন জানেন? ঐ অন্ধকারের রাজ্য হলো আমাদের বনজঙ্গল। ঐ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আমরা অনায়াসে বিচরণ করতে পারি, মুখোশ পরার দরকার নেই।

আমি একটু স্তম্ভিত হলাম। শহরের এক নির্জন প্রান্তে, পরিচিত বন্ধুর সন্ধানে এসে জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বা আরব বিপ্লব হয়তো এর চাইতে মুখরোচক বিষয় ছিল। নারীর কণ্ঠ সে যতোই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, জীবনদর্শনের বিশ্লেষণ সে-কণ্ঠে বেসুরো শোনায়। পুরুষের দর্পে আঘাত দেয়।

তাই আলোচনার মোড়কে ঘোরালাম। বললাম—আমি বাউণ্ডুলে। গেরুয়া পরে ভগবানের সন্ধানে আমি দেশান্তরী হইনি। আমি শুধু নগর নাগরিককে দেখতে এসেছি, তাদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আমার এই কৌতূহলের পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই।

আমার কথা শেষ হবার আগেই মালকানি এসে উপস্থিত। চীৎকার করে

বললো—বিক্রমাদিত্য, দীর্ঘদিন বাদে আবার আপনার দেখা পেলাম। লায়লার সঙ্গে আপনার নিশ্চয় পরিচয় হয়েছে। আমার মারফৎ আপনার সুখ্যাতির সঙ্গে লায়লা পরিচিত। যাক, সেদিন হঠাৎ লায়লার সন্ধানে আপনার বিনানুমতিতে ক্যাসিনো থেকে চলে গিয়েছিলাম, বান্দার অপরাধকে মার্জনা করবেন। এবার চলুন।

কোথায়? আমার কণ্ঠে থাকে বিস্ময়ের সুর।

বালবেকে—শুনুন বিক্রমাদিত্য, নাইটক্লাবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর নেই বটে কিন্তু এখনও আমি টুরিস্ট গাইড। শহর দেখানো এখনও আমার পেশা। শুধু অতীতের ঐশ্বর্য দেখানো নয়, যদি ইচ্ছে থাকে তবে আপনাকে এই রাত্রে বেরুট নগরীকে দেখাবো। কিন্তু আজকে আমাদের যাত্রা ঐতিহাসিক নগরী বালবেকে। চলুন, আর দেরী নয়। বহু আমেরিকান ট্যুরিস্ট আমার জন্যে বাইরে প্রতীক্ষা করছে। আপনাদের সবাইকে একসঙ্গে বালবেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। লায়লা, ডার্লিং, কাম অন।

যাবার জন্যে লায়লা কোন প্রতিবাদই করল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা সদলবলে বালবেকের দিকে রওনা হলাম।

*　　　*　　　*

বালবেকের সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় হয়েছিল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলির মারফৎ।

কয়েক বছর আগে হাক্সলি মধ্যপ্রাচ্যে এসেছিলেন। তার এই মধ্য-প্রাচ্যের এক ভ্রমণ কাহিনীর ভেতর থেকে আমি সর্বপ্রথম বালবেকের সন্ধান পাই।

বেরুট অতিক্রম করে দামাস্কাসের পথে চলুন। পাহাড়ের বুক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, কিন্তু গাড়ীর গতি কমাবেন না। একটানা গাড়ী চালিয়ে যান। দুপাশে দেবদারু গাছের সারি। ধীরে ধীরে বেরুট নগরীর আলোকমালা মিলিয়ে যাবে।

এবার যে গ্রামটায় এলেন তার নাম সাতুরা। এই সাতুরায় খানিকটা বিশ্রাম করে আপনি রওনা হন বালবেকের দিকে।

যাবার পথে মালকানি মুখর হয়ে উঠলো। তার শ্রোতা শুধু আমি নই, বহু বিদেশী ট্যুরিস্ট।

সাতুরায় খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে বালবেকের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া গেলো। মালকানির বক্তৃতা তখন পুরোদমে চলছে।

*　　　*　　　*

ঐ যে প্রাচীন ধ্বংস নগরী দেখছেন, ঐ হলো বালবেক। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ওর আসল নাম হলো 'দি লর্ড অব দি বেক্কা'। গ্রীক পুরাণে অবশ্যি এর পরিচয় পাবেন 'সূর্য নগরী বা হেলিওপোলিস' নামে।

বহু শতাব্দী আগে, রোম সাম্রাজ্যের যৌবনে এই বালবেক স্থাপিত হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের রোমান সম্রাটরা এক শস্যের আড়ত খুঁজছিলেন। হঠাৎ বালবেকের সন্ধান পাওয়া গেলো। ব্যস, কয়েক বছরের মধ্যে রোমানদের দৌলতে বালবেকের চেহারা পাল্টে গেলো।

ক্রমে ক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলো কিন্তু রোমান সভ্যতার কৃষ্টি বালবেকের বুকে গেঁথে রইল! এখনও এই শহরের বুকে রোমান দেব-দেবীর মন্দির দেখতে পাবেন, দেখতে পাবেন অতীত রোম সাম্রাজ্যের অট্টালিকা।

প্রথমেই নজরে পড়বে জুপিটারের মন্দির। ছয়টি চকমিলানো পিলার আজও সহস্র বছর আগের ঐশ্বর্য নিয়ে বেঁচে আছে। এক সময়ে জুপিটারের মন্দিরে সোনা-দানার অভাব ছিল না। কিন্তু আরব বেদুইনের কৃপায় একদিন সেই ধন-দৌলত নিশ্চিহ্ন হলো।

জুপিটারের মন্দিরের পাশেই বাকুর মন্দির। রোম স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তার পাশেই ভেনাসের মন্দির।

ভেনাসের নাম শুনেছেন নিশ্চয়? ভালবাসার প্রতীক ভেনাস। গ্রীক ইতিহাসে ভেনাসের নাম হলো আফ্রোদিতে। কিংবদন্তী আছে আফ্রোদিতের জন্ম হয় সমুদ্রের ফেনা থেকে। সাইপ্রাস অঞ্চলে পাপোস গ্রামের সমুদ্রতীরে আফ্রোদিতের জন্ম হয়।

বালবেকের চতুর্দিকে যতোই ঘুরবেন, আপনার দৃষ্টি ততোই ঝলসে যাবে। আজ প্রকৃতির পরিহাসে এবং মঙ্গোলদের আক্রমণে এই শহরের সৌন্দর্যের কিছুটা হানি হয়েছে বটে তবু বালবেক আপনাকে অতীত দিনের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

এবার কোথায় যাবেন? বালবেকের বাইরে। ঐতো একটু দূরে হোম লেক, কাদিসার ধ্বংসস্তূপ। ঐ যে লেক দেখছেন, তার উপর তিন হাজার বছর আগে বাঁধ তৈরী করা হয়। আজো সেই বাঁধ অটুট আছে।

*　　　*　　　*

আলিকানির বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

বিস্মরণীয় দেশ মধ্যপ্রাচ্য। অতীতের স্মৃতিতে ভরা। এ শুধু হজরত মুহম্মদের জন্মভূমি নয়, খৃষ্ট এবং ইহুদি ধর্মের তীর্থস্থান। কতো শতাব্দী, কতো যুগ ধরে এই মরুভূমির বুকে কতো শিক্ষা, সংস্কৃতির জাগরণ হয়েছে, ভেঙ্গেছে গড়েছে কতো সাম্রাজ্য, তার হিসেব নেই। কিন্তু তবু এ অঞ্চলের কাহিনী বলতে গেলে যে কথা সর্বপ্রথমে মনে পড়ে সে হলো ইসলাম ধর্ম।

মক্কা মদিনা কারবালায় গিয়েছেন কখনও?

যাননি। আসুন আমার সঙ্গে। কিন্তু প্রথমেই সতর্ক করে দিচ্ছি যদি ইসলাম ধর্মে আপনি দীক্ষিত না হন তবে ঐ পবিত্র তীর্থভূমির দোর আপনার কাছে বন্ধ। তাই আপনাকে শুধু সৌদী আরবিয়ার রাজধানী রিয়াদে নিয়ে যেতে পারি। আর সেইখান থেকে আপনাকে বলতে পারি মুহম্মদের গল্প।

আমি জানি ইসলামধর্ম সম্বন্ধে আপনার অগাধ জ্ঞান। তবু আমার এই কাহিনীর সঙ্গে আপনার মনের কথাগুলো মিলিয়ে নিতে আপত্তি কিসের?

* * *

আরব বেদুইনের দেশ।

বালির রাজ্য, মরুভূমির সমুদ্র।

'উড়ছে বালি ছুটছে ঘোড়া দিগন্তে বিলীন।'

কিন্তু শুধু বালি আর ঘোড়া নিয়ে মানুষের জীবন নয়। এ কঠোর নির্মম জীবনের মাঝে আর একটা স্তর আছে, সে হলো ভালোবাসার ফল্গুধারা। এদের ভালোবাসার ও বন্ধুত্বের মধ্যে কোন খাদ নেই। সরল ও সুন্দর।

ইসলাম ধর্মের তখনও জাগরণ হয়নি। প্রাচীন রীতি তখন দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। মানুষের বিশ্বাস কালো পাথরকে পুজো করলে পুণ্য হয়। এ পাথর কোথা থেকে, কবে কী করে এলো, কেউ জানে না। জানবার আগ্রহও নেই। প্রাচীর দিয়ে পাথরটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। সবাই বলে এ হলো কাবা। 'কাবার' চারপাশে সাতপাক ঘুরলে পুণ্য হয়।

শুধু পাথর পুজো নয়, সামনেই একটা কুয়ো আছে। এ কুয়োর নাম জমাজমা। এই জল পান করা পরম ভাগ্যির কথা।

এগিয়ে চলুন। একটু দূরেই এক পর্বতসংকুল জায়গা। তার নাম মীনা। পুণ্য করার জন্যে সবাই সেখানে গিয়ে পশু বলি দেয়।

বহু বছর আগে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর বাদে এই এলাকায় যারা বাস করতেন তারা ছিলেন কোরেইস সম্প্রদায়। এদের এক নেতার নাম আবদ আল মোতালিব।

যুদ্ধবিগ্রহ সেকালে ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। একটা না একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে রোজই ঝগড়া-বিবাদ লেগে আছে।

একদিন লড়াই যখন পুরোদমে চলছে তখন আবদ আল মোতালিবের ছোট ছেলের একটি শিশু সন্তান জন্ম নিল জমাজমা কুয়োর পাশে। আদর করে দাদামশায় নাম রাখলেন 'মুহম্মদ'।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই শিশুর জন্ম এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

* * *

শিশু মুহম্মদ কিন্তু তার বাবাকে জীবিত দেখতে পাননি। মা রুগ্না। অবএব তাকে দেখবার ভার নিলেন আর একটি মেয়ে। নাম বানু সাদ। মক্কার কাছে তাইফ বলে একটা গ্রাম আছে। সেইখানে মুহম্মদকে নিয়ে বানু সাদ বাস করতেন।

অতোবড়ো ধনীর নাতি, কিন্তু তবু মুহম্মদের দুঃখের অন্ত নেই। বরং দিন যতোই যায়, শিশু মুহম্মদের দুঃখ বাড়ে। এদিকে হঠাৎ একদিন পালিতা মাতা বানু সাদের মৃত্যু হলো। কিছুদিন পরে দাদামশায় মারা গেলেন।

পৃথিবীতে মুহম্মদেক দেখবার আর কেউ রইল না। মুহম্মদের এক কাকা ছিলেন তার নাম আবু তালিব। পয়সা-কড়ি বেশ ছিল। তিনি এবার মুহম্মদের দেখা শোনার ভার নিলেন। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ কাকার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হাতে নিলেন।

মুহম্মদের বয়স যখন পঁচিশ তখন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। মক্কায় এক সমৃদ্ধশালী ধনী ভদ্রমহিলা ছিলেন। তার নাম খাদিজা বেগম। মুহম্মদ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মুহম্মদকে তিনি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেন। অর্থের দুর্ভাবনা থেকে মুহম্মদ রেহাই পেলেন।

মুহম্মদের সুখী বিবাহিত জীবন। দিন কাটে, বছর যায়, খাদিজা বেগমের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করাই তাঁর একমাত্র কাজ। বয়স যখন তাঁর পঁয়ত্রিশ তখন তার জীবনে পরিবর্তন এলো।

সেদিন ছিলো গুমোট রাত্রি। বাতাসের নাম গন্ধ নেই। মনে হলো ঝড় আসন্ন।

বালির রাজ্য মক্কা। ঝড় মানেই বালির তুফান। তাই হলো। এমনি সময় অন্ধকারের ভেতর মুহম্মদ যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন — শোন!

কে ?—অস্ফুট কণ্ঠে মুহম্মদ জবাব দেন।

পড়ো! —অজানা কণ্ঠস্বর জবাব দেয়।

আমি যে পড়তে জানিনে—মুহম্মদ জবাব দেন।

পড়ো বলছি — কণ্ঠস্বর ধমক দিয়ে বলে।

এবার অজানা কণ্ঠস্বর পড়তে আরম্ভ করল। মুহম্মদ শুনতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ বাদে ঝড় থেমে গেলো। মুহম্মদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই। কিন্তু অজানা কণ্ঠস্বর মুহম্মদকে যে কয়েকটি কথা বলেছিলো, তাঁর কানে সে কথা গেঁথে রইলো।

তারপর আর একদিন রাত্রে মুহম্মদ সেই অজানা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। মুহম্মদ, আমি আল্লার বার্তাবাহক। আমার নাম গাব্রিয়েল।

প্রথমটায় মুহম্মদ এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলেননি। তারপর একদিন স্ত্রী খাদিজা বেগমকে সব কথা খুলে বললেন। মুহম্মদের ধারণা তার স্ত্রী হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে তার কথাগুলো। কিন্তু খাদিজা বেগম তাকে বিশ্বাস করলেন।

বাড়ীতে থাকতেন এক বৃদ্ধ আবু বকর। এবার তাকে সব কথা খুলে বলা হলো। তিনিও মুহম্মদের স্বপ্নকে সত্যি বলেই মেনে নিলেন। মুহম্মদের ভৃত্য জায়দ। এবার তাকে বলা হলো এই স্বপ্নের কথা। চাকর তার মনিবকে বিশ্বাস করল।

এমনি ভাবে লোক পরম্পরায় মুহম্মদের অভিজ্ঞতার কাহিনী চতুর্দিকে

ছড়িয়ে পড়লো। কেউ বা তাকে বিশ্বাস করল, কেউ বা হেসে বলল—লোকটা পাগল। এসব স্বপ্নের কী কোন মানে আছে? তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপে মুহম্মদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

যারা মুহম্মদকে বিশ্বাস করল তারা এসে মুহম্মদের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করল। শত্রুপক্ষও কম শক্তিশালী নয়। ক্রমে ক্রমে মক্কায় দুটো দল গজিয়ে উঠলো। মুহম্মদের ভক্তবৃন্দ এবং বিরোধী কোরেইস সম্প্রদায়।

বিরোধী দলের নেতা উমর সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। মুহম্মদের উপর তার একটুও বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মুহম্মদ পাগল। তিনি কী সব আজেবাজে কাজ করছেন। এই পাগলামোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হলো মুহম্মদকে হত্যা করা।

একদিন উমর খবর পেলেন যে তার বোন এবং ভগ্নীপতি মুহম্মদের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। খবরটা শুনে উমর রেগে কাঁই। দৌড়ে গেলেন বোনের বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন বোন মুহম্মদের দেওয়া মন্ত্র পড়ছে। 'লা ইলালাহা, মুহম্মদই রসুলল্লা লাহা।' ক্ষিপ্ত হয়ে বোনকে হত্যা করতে গেলেন উমর। কিন্তু তার হাত উঠলো না। বিস্মিত, হতবাক হয়ে উমর প্রশ্ন করলেন—তোমাদের মুহম্মদ কী শিখিয়েছে?

আল্লার মন্ত্র।

শুনতে পারি সেই মন্ত্র?

তোমার হাত অপবিত্র। পরিষ্কার হাত না নিয়ে এলে এ মন্ত্র হাতে নেবার অধিকার তোমার নেই।

হাত ধুয়ে এলেন উমর। পাতায় লেখা মন্ত্র ভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন বোন।

মুহম্মদের দেওয়া বাণী পড়ে মুগ্ধ উমর। পরদিন সকালে মুহম্মদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে গেলেন।

মুহম্মদের কাছে মাথা নত করেছে উমর, একথাটা কোরেইস সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো।

কোরেইস সম্প্রদায়ের প্রাচীনপন্থীরা বেশ একটু চিন্তিত হলেন। সর্বনাশের কথা। অমন ছেলে উমর, সে কী না মুহম্মদের শিষ্য হলো। সত্যিই ভাবনার বিষয়! ভাবনার চাইতে উত্তেজনাটাই বেশী। এর পর আর চুপ করে থাকা যায় না। আর কয়েকটা দিন মুহম্মদকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। কাজেই মুহম্মদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বাড়লো। বিদ্রূপ ঠাট্টার অন্ত নেই।

* * *

দিন ঘুরে বছর যায়।

আপন মনে ধর্ম নিয়ে মুহম্মদ দিন কাটান। ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে

বাড়তে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তার কষ্ট।

মক্কার সামনেই মদিনা। সেখানকার অধিবাসীরা মুহম্মদের অলৌকিক শক্তির কথা শুনতে পেয়েছিলেন। একদিন সেই নগরী থেকে কয়েকজন মুসাফির এলো মুহম্মদের সঙ্গে দেখা করতে। মুসাফিরের দল ইহুদী। তাদের বিশ্বাস মুহম্মদই তাদের অবতার, যিনি আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবেন। তারা এসেছেন পরখ করে দেখতে, সত্যিই মুহম্মদ তাদের অবতার কিনা।

মুহম্মদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মুসাফিরের দল তুষ্ট। তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে মুহম্মদই তাদের গুরু।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো মুসাফিরের দল—বছর বাদে আবার তারা ফিরে আসবে মক্কায়। মুহম্মদকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে মদিনায়।

পরের বছর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যাত্রীর দল ফিরে এলো। এরা যে ফিরে আসবে এটা কিন্তু মুহম্মদ কখনই বিশ্বাস করেননি। অতএব তাদের দেখে বেশ খানিকটা বিস্ময় হয়েছিল। মুহম্মদের কাছ থেকে এবার যাত্রীরা দীক্ষা দিল।

মদিনার মুসাফিরের দীক্ষার কাহিনী গোপন রইল না। মক্কার কোরেইস সম্প্রদায় রেগে আগুন। কিন্তু মুহম্মদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নেওয়া সহজ কথা নয়। সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাড়বে। এটা বেদুইন সমাজের কানুনের বাইরে। এ হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিরোধী দলের নেতা আবু সাহেব প্রস্তাব করলো, মুহম্মদকে হত্যা করতে হবে।

মুহম্মদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হচ্ছে এটা কিন্তু মুহম্মদের কানে এসেছিল। এবার তিনি সতর্ক হলেন।

ছ'শো বাইশ বছর—খৃষ্ট জন্মের পর। অন্ধকার রাত। মদিনার যাত্রী এবং শিষ্যদের নিয়ে মুহম্মদ এবার মক্কা নগরী ত্যাগ করলেন।

মুহম্মদ পালিয়ে গেছেন এ খবর শহরে চাপা রইল না। শত্রুপক্ষ প্রথমটায় একথা বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু যখন জানতে পারল যে, কথাটা মিথ্যে নয়, তখন চতুর্দিকে চর পাঠানো হলো মুহম্মদকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। সুরাকা বলে এক নামকরা যোদ্ধা, তিনি ঘোড়সওয়ার নিয়ে গেলেন মুহম্মদের সন্ধানে। মুহম্মদের ভক্ত আবু বকর। তিনি এসে মুহম্মদকে সতর্ক করলেন। শত্রুপক্ষ সজাগ। গ্রেপ্তার করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

আল্লার উপর মুহম্মদের অগাধ বিশ্বাস। তিনি অনুচরবৃন্দকে ভরসা দিলেন —আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি থাকতে আমাদের কোন অমংগল হতে পারে না।

সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মুহম্মদ মদিনায় এলেন।

বছরটা স্মরণীয়। ৬২২ খৃষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর মাস। ইসলাম পঞ্জিকা এই দিন থেকে সুরু। এ হলো হিজরা, ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় বছর। বন্ধন মুক্তির দিবস, নতুনের আহ্বান।

*　　　*　　　*

মদিনায় এসে মুহম্মদ জাঁকিয়ে বসলেন। মুহম্মদের বিচার শক্তিতে সবাই তুষ্ট। কোন সমস্যার সমাধান করতে হলেই সবাই তাঁর কাছে যায়। সবাই তাঁর আদেশ মেনে নেয়।

এ অবস্থায় ধর্মপ্রচারে বাধা নেই। ঠিক হলো শুক্রবার হবে জুম্মা দিবস। নামাজ পড়বার জন্যে ইমামের প্রয়োজন। এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো মুহম্মদের চাকর বিলালের উপর। এদিকে প্রতিদিনই ভক্তবৃন্দ বাড়ছে।

ইতিমধ্যে মদিনার ইহুদীরা বুঝে নিয়েছে যে মুহম্মদ তাদের সেই অবতার নয়, যার এই পৃথিবীতে আগমনের প্রতীক্ষা তারা করছে। ক্রমে ক্রমে তাদের অসন্তোষ বাড়তে লাগলো। মনের কথা মুখে প্রকাশ করার যো নেই। কারণ ইতিমধ্যে মুহম্মদ কিন্তু মদিনায় কায়েমী হয়ে বসেছেন। প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়ছেন। এতোদিন জেরুজালেমের দিকে তাকিয়ে নামাজ পড়তেন। এবার থেকে মক্কার পানে তাকিয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। আর শুধু কী তাই। শিষ্যদের জন্যে কড়া আইনকানুন করে দিয়েছেন। যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্যে সাজা দিয়েছেন মৃত্যুদণ্ড।

মক্কার স্মৃতি কিন্তু মুহম্মদ ভুলতে পারেন নি। মদিনায় কায়েমী হয়ে বসে এবার তিনি মক্কার দিকে তাকালেন। তাঁর প্রথম কাজ হলো মক্কার ব্যবসায়ীদের নাজেহাল করা। মদিনায় তিনি একটা ছোট সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন।

মক্কার ধনী ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান। সওদা নিয়ে লোহিত সাগর থেকে মক্কার দিকে আসছিলেন। এ খবরটা মুহম্মদের কানে গেলো। তিনি তাঁর সৈন্য-বাহিনীকে পাঠালেন আবু সুফিয়ানকে পাকড়াও করতে।

সুফিয়ান এই সৈন্যবাহিনীর আগমনের খবর পেলেন। অতএব মক্কার সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। সৈন্য এলো, হাতিয়ার এলো, এলো ঘোড়সওয়ার। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এলো মস্তো বড়ো সেনাপতি আবু জল।

আবু সুফিয়ান কিন্তু মুহম্মদের সৈন্যসামন্তদের দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আপোষে ব্যাপারটা মীমাংসা করার জন্যে প্রস্তাব করলেন—যুদ্ধ করে লাভ নেই। প্রাণ নিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আবু সুফিয়ান তো প্রস্তাব করলেন কিন্তু সেনাপতি আবু জল তার প্রস্তাব সহজে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হুমকি দিয়ে বললেন—ফিরে যাবো! কাপুরুষ নাকি? বদর নগরীতে আস্তানা গাড়বো। ফূর্তি করবো, বদর নগরীতে নাচবো, খাবো-দাবো, তারপর দেখা যাবে মুহম্মদ যায় কোথায়?

লড়াইতে জয় হবে এ বিষয়ে মুহম্মদের কোন সন্দেহই ছিল না। প্রধান সঙ্গী আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রোজই আল্লার কাছে প্রার্থনা করছেন—শক্তি দাও, সাহায্য দাও, যেন শত্রুকে দমন করতে পারি।

তারপর এক বর্ষাক্রান্ত দিন। ভোরবেলা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

লড়াই সুরু হয়ে গেলো। সৈন্যরা হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে, মুহম্মদ তাঁর শিবিরে বসে প্রার্থনা করছেন আল্লার কাছে। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেলো। তারপর উঠল বালুর ঝড়। আল্লার কাছে মুহম্মদ যা প্রার্থনা করেছিলেন, হলো তাই। লড়াইর গতি পাল্টে গেলো। দৈবশক্তি এসে মুহম্মদের সৈন্যবাহিনীকে তাজা করে তুললো। লড়াইতে মুহম্মদের জয় হলো। যুদ্ধে প্রাণ দিলেন কোরেইসদের প্রধান সেনাপতি আবু জল।

মক্কা কিন্তু এ পরাজয়কে সহজভাবে গ্রহণ করল না। বছর বাদে আবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মুহম্মদকে আক্রমণ করা হলো। নামাজ পড়ছেন মুহম্মদ। এমনি সময় খবর এলো, মক্কা থেকে শত্রু এসেছে। মুহম্মদ কিন্তু অবিচলিত রইলেন। নামাজ বন্ধ করলেন না।

খানিক বাদে পরামর্শদাতাদের নিয়ে আলোচনা করতে সুরু করলেন—কী করা যায়। নানান মুনির নানা মত। কিন্তু মুহম্মদের এক কথা—বিধর্মীকে পরাজিত না করে আমি ঘরে ফিরবো না।

মদিনার সামনেই উহুদ বলে একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের সামনে ছোটখাটো একটা লড়াই হলো, কিন্তু এ লড়াইতে মুহম্মদ বেশী সুবিধা করতে পারলেন না। এরপর মুহম্মদকে নাজেহাল করার জন্যে মক্কা উঠে পড়ে লাগলো। কয়েকদিন বাদে মক্কার সৈন্যবাহিনী আবার মদিনায় এসে হানা দিল।

মুহম্মদের ক্রীতদাস সুলেমান আল ফারসি মুহম্মদকে বললেন—এ লড়াইতে একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

মুহম্মদ জিজ্ঞেস করেন—কী?

মদিনার চারদিকে পরিখা খনন করতে হবে।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, ভেবে দেখলেন মুহম্মদ। ব্যস্, সেই সংগে সংগে কাজ সুরু হয়ে গেলো।

এদিকে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদিনার সামনে আবু সুফিয়ান হাজির কিন্তু শহরে ঢুকবার যো নেই। কারণ শহর ঘিরে চারদিকে আছে পরিখা। এর আগে এ ধরনের এমন কিছু দেখা যায় নি। অতএব আবু সুফিয়ান আর তার দলবল বেশ হতভম্ব। শহরের বাইরে এক মাস দলবল নিয়ে আবু সুফিয়ান কাটালেন। কিন্তু এভাবে তো বেশীদিন থাকা যায় না। তাই পাত্তাড়ি গুটিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে মদিনার ইহুদীরাও বেশ হাঙ্গামা সুরু করে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে তাদের উপর কঠোর পন্হা অবলম্বন করতে হলো মুহম্মদকে।

* * *

'মদিনত নবী আল্লা'—আল্লার প্রতিনিধির শহর মদিনা। দীর্ঘ ছ'বছর মুহম্মদ মদিনায় কাটালেন। কিন্তু এভাবে তো বেশীদিন থাকা যায় না। মক্কায় যে তাকে ফিরে যেতেই হবে।

সদা সর্বদাই মুহম্মদ ভাবছেন, কী করে মক্কার ভেতর ঢোকা যায়।

হঠাৎ একটা সুযোগ মিলে গেলো। মক্কায় কয়েকদিনের জন্যে ধর্ম করতে সবাই যেতে পারে। ঐ সময়টা কারও কোন কিছু বলার যো নেই। মুহম্মদ ঠিক করলেন এই সময়টার সুযোগ নিতে হবে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে মক্কা আক্রমণ করতে হবে। আর, সেই সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভেতর অন্তর্বিপ্লব ঘটাতে হবে।

কিন্তু মুহম্মদ যা ভেবেছিলেন তা হোল না। লড়াই হলো না। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলেন ইবন আমর। অনেক ভেবেচিন্তে মুহম্মদ এ সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হলেন। কারণ জানতেন যে, এবার মক্কা তার হাতের মুঠোর ভেতর।

* * *

এবার দেশজয় আরম্ভ করলেন মুহম্মদ। কয়েক মাসের মধ্যে সামনের অনেক ছোটখাটো শহর দখল করে নিলেন। আশেপাশের দেশগুলো দখল করে মুহম্মদ আবার মক্কার উপর হানা দিলেন।

এবার কিন্তু মুহম্মদের সৈন্যবাহিনী দেখেই মক্কার বাসিন্দারা বিচলিত হলো। লড়াইয়ের পরিণাম কী হবে বলা যায় না। এমনি পরিস্থিতির ভেতর মক্কা দখল করে নিতে মুহম্মদের একটুও বেগ পেতে হলো না।

প্রভাতের আলো এসে তখনও মক্কা নগরীকে উদ্ভাসিত করে তোলেনি। বিজয় গর্বে সৈন্যসামন্ত নিয়ে মুহম্মদ মক্কা নগরীতে ঢুকলেন। তার বহুদিনের আশা, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। আল্লাকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন।

পথের কাঁটা দূর হয়েছে। সুরু হলো জয়-জয়কার। ইসলামের জয়, মুহম্মদের গৌরব।

এরপরের কাহিনী দীর্ঘ। এক নগরী থেকে অন্য নগরী, এক দেশ থেকে অন্যদেশে উঠলো মুহম্মদের জয়ধ্বজা। চতুর্দিকে তার জয়-জয়কার, তার গৌরব।

মুহম্মদ অস্ত গেলেন, এলেন আবু বকর তারপর উমর। এক খলিফা গেলেন তো এলেন অন্য খলিফা।

কিন্তু মুহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা দেশে দেশে শহরে শহরে বিস্তারিত হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো কতো নতুন দেশ, নতুন মানুষ। এক সমাজ ভেঙ্গে উঠলো অন্য এক সমাজ। এক ইতিহাস মুছে গিয়ে সৃষ্টি হলো অন্য ইতিহাস। গড়ে উঠলো নতুন কৃষ্টি, নতুন সংস্কৃতি।

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ হল 'কোরান' যার মানে হল 'আবৃত্তি।' এই ধর্মগ্রন্থে আছে হজরত মুহম্মদ কর্তৃক আল্লার নিকট থেকে প্রাপ্ত বাণী সমষ্টি। 'কোরান' শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, ইসলাম ধর্মের অনুগামীদের সামাজিক জীবনযাত্রার দিন পঞ্জিকা। কোরানকে একশো চোদ্দটি সুরা কিংবা 'অধ্যায়ে' ভাগ করা হয়েছে। এই 'সুরা' হল আল্লার বাণী যা তিনি নবীর মাধ্যমে সবাইকে দিয়েছিলেন। কিছু সুরা ছোট, কিছু বড়। ছোট সুরাগুলি পুরাণ অর্থাৎ মক্কা থাকাকালীন যে স্বপ্নাদেশ মুহম্মদ পেয়েছিলেন। কিছু সুরা দীর্ঘ, অর্থাৎ নতুন, মদিনা

থাকাকালীন যে নির্দেশ মুহম্মদ পেয়েছিলেন। কোরান প্রথমে কুফি অক্ষরে লেখা হয়েছিল। কুফিক নুবেতীয়ানদের হস্তাক্ষরের অনুকরণে লেখা হয়েছিল। 'কুফি' শব্দটির দক্ষিণ ইরাকের 'কুফা' শহর থেকে উৎপত্তি। পরে "নসখী" লেখা কোরানে ব্যবহার করা হয়েছিল। 'কোরান' ছাড়া অন্য মূল্যবান ইসলামিক গ্রন্থও নসখী অক্ষরে লেখা হয়েছে। এছাড়া আর একটি লেখা আরবীক ভাষায় প্রচলিত আছে। এ হল 'রিহানী' অক্ষর। মুয়াদের সুলতানের জন্যে কোরান 'রিহানী' অক্ষরে লেখা হয়েছিল। 'বিদগ্ধ' আরবীক ভাষার হস্তাক্ষর লেখকদের কুফি, নসখী এবং রিহানী লেখা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। কারণ ইসলামিক জগতে সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল বিদগ্ধতার পরিচায়ক ? লাইব্রেরীতে সুন্দর হস্তাক্ষর যুক্ত লেখকদের বই নকল করা হত।

আজকের মধ্যপ্রাচ্য শুধু ধর্মের তীর্থস্থান নয়, শুধু মুহম্মদ-যীশুর জন্মভূমি নয়, এ হলো নতুন সংস্কৃতির ভূমি।

*　　　*　　　*

যে গল্প বলতে সুরু করেছিলাম সে কাহিনী থেকে দূরে সরে এসেছি। আমার কথা এখনও বলা হয়নি। কিন্তু আজকের এই গল্পের জন্যে আমার এই কাহিনী বলার প্রয়োজন ছিল। কারণ ইতিহাস আর গল্প নিয়েই আজকের এই উপন্যাসের পটভূমি। লায়লা এবং মালকানির কাহিনীতে আবার ফিরে আসা যাক।

বালবেকের ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন বেরুটে ফিরে এলাম তখন বৈদ্যুতিক আলোকমালায় শহর ঝলমল করছে।

রৌসের সমুদ্রতটের পাশে ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাব। সেইখানে আমাদের নিয়ে গেলো মালকানি। বলল—ভারী ভালো জায়গা। এইখানেই তো আমি সর্বপ্রথম লায়লার দেখা পেয়েছিলাম। তাই নয় কী ?

একটু মৃদু হাসল লায়লা। হাসলে তাকে আরো সুন্দরী দেখায়, এটা লক্ষ্য করলাম। আমার সুতীক্ষ্ণ নজর হয়তো তার দৃষ্টি এড়ায়নি। খানিকক্ষণের জন্যে অপ্রস্তুত বোধ করল কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে বেশী সময় নিল না। একটু লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল—হ্যাঁ। সে তো আজকের কাহিনী নয়, সাত বছর আগের ঘটনা। এই ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাবের আমি তখন ক্যাবারে গার্ল।

কথায় বাধা দিল মালকানি। বলল—অধর্মের কথা বলতে গেলে মদের প্রয়োজন হয় বন্ধু। এবার বলুন কোন মদ চেখে দেখবেন। স্পিরিট না স্পার্কলিং ওয়াইন, অর্থাৎ হুইস্কী না শ্যাম্পাইন ?

উঁহু, স্রেফ জিনটনিক—আমি জবাব দিই।

পাপ আপনি করতে পারবেন না বিক্রমাদিত্য। নইলে এতো জিনিস থাকতে আপনি কিনা জিন টনিকের অর্ডার দিচ্ছেন। দূর-দূর, জিনটনিক তো ইংরেজ

টমি সৈনাদের মদ। আপনার আমার জন্যে হলো শ্যাম্পাইন। নেভার মাইন্ড - লেট আস হ্যাভ জিনটনিক এবং শ্যাম্পাইন।

একটু বাদেই মদ এলো। লায়লার গল্প আবার সুরু হলো।

আমি ক্যাবারে গার্ল বিক্রমাদিত্য, যাদের নগ্ন দেহ দেখবার জন্যে আপনারা দেশ দেশান্তর থেকে মৌমাছির মতো ছুটে আসেন। আমাদের মধুর কটাক্ষে আপনারা বিমোহিত হন, আমাদের নৃত্য আপনাদের হৃদয়ে জাগরণ তোলে।

তবে শুনুন আমার জীবন কাহিনী। চির জীবন তো আর ক্যাবারে গার্ল ছিলাম না, আমার বাল্যকাল ছিল, শৈশব ছিল, আর আছে যৌবন।

প্রকৃতি যখন বসন্তের রূপে ধরা দেয় তখন পৃথিবী হয়ে ওঠে চঞ্চল। নারীর দেহে যখন যৌবন আসে তখন পুরুষ হয় উম্মাদ। পুরুষ আর প্রকৃতি এই নিয়েই তো আজকের সৃষ্টি।

শৈশব আমার কাছে বিস্মৃতপ্রায় বিক্রমাদিত্য। কিন্তু তবু বিগত দিনের কিছু কাহিনী অস্পষ্ট মনে আছে। সে কাহিনী বলতে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে আপনাকে সৌদী আরবিয়ার রাজধানী রিয়াদে যেতে হবে।

এই যে সৌদী আরবিয়া দেশটা দেখছেন, পাহাড় পর্বত আর বালুর দেশ। এই দেশের বুকে লুকিয়ে আছে প্রচুর সম্পদ। এ হলো তেলের দেশ, পেট্রোলিয়ামের সমুদ্র।

শুধু মাত্র তেল নিয়ে গোটা দেশ নয়। সৌদী আরবিয়া হলো গোঁড়া মুসলমানের দেশ ধর্মপ্রধান রাজ্য। আমি জাতে কৃশ্চান। কী করে এই মুসলমান-প্রধান দেশে ভেসে এলাম হয়তো আপনার জানবার আকাঙ্ক্ষা হবে।

অল্প বয়সেই বাবা-মাকে হারিয়েছিলাম। থাকবার মধ্যে ছিল এক বোন। তার কাছেই মানুষ হয়েছিলাম। যখন আমার বয়স হলো, জগৎকে চিনতে শিখলাম তখন জানতে পারলাম যে, আমার বোন সৌদী আরবিয়ার এক শেখের রক্ষিতা। হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, রক্ষিতার কী প্রয়োজন? যে দেশে হারেমের অভাব নেই, সেখানে পয়সা দিয়ে মেয়েমানুষ পোষার কী অর্থ? আমার বোনের মনিব শেখ অবশ্য একটু অন্য ধাঁচের লোক ছিলেন। তার বহু ব্যবসা — মেয়ে নিয়ে কারবার তার মধ্যে অন্যতম। মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের নিয়ে যে ব্যবসা চলে একথা নিশ্চয় শুনেছেন?

শেখের ছিল নাইট ক্লাব। আমার বোন সেখানেই কাজ করতো। জীবন চালাতে হলে লজ্জা সরমের বালাই রাখলে চলে না। আমার বোনও রাখেনি। তারপর আমার যখন যৌবন এলো তখন আমিও ঐ পথই বেছে নিলাম। কেন নিলাম জানেন? পথের মেয়ে পথেই বাস করবো। সভ্য সমাজের ভেতর আনাগোনা করে লাভ কী? কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন? আজ বুঝতে পেরেছি আপনাদের সভ্য সমাজের আমরা হলাম অপরিহার্য বস্তু,

লোভনীয় সামগ্রী।

যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম সেই কথাতেই ফিরে আসা যাক।

শেখ মস্তো বড়ো মানুষ। তেলের টাকা, নাইটক্লাবের টাকা। তেলের টাকাটা অবশ্য তাকে কষ্ট করে রোজগার করতে হয়নি। সম্রাটের টাকা। সম্রাট সাউদ দেশের শেখদের মধ্যে এই টাকা বিলোন। বলতে পারেন মনিব তার চাকরকে বকশিস দেন। যে শেখকে সম্রাটের পছন্দ হলো, অমনি ঢালা হুকুম গেলো খাজাঞ্চীর কাছে, দাও শেখকে এককোটি টাকা। খাজাঞ্চী তো ভেবে আকুল। টাকা দেবার ফরমাস তো সম্রাট করেছেন কিন্তু কোষাগারে টাকা কোথায়? ভাণ্ডার শূন্য। যে টাকা ছিল সবই শেষ। আর সম্রাটের ফূর্তি'তে টাকা উড়ে গেছে। আর সোদী আরবিয়াতো শুধু এক শেখকে নিয়ে নয়। হাজার হাজার শেখ কাঙ্গালীর মতো হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজভাণ্ডার শূন্য। ভয়ে ভয়ে এ কথাটা গিয়ে খাজাঞ্চী সম্রাটকে বললেন। সম্রাটকে এ কথা বলা সহজ কথা নয়। হাজার হোক খাজাঞ্চী হলেন সম্রাটের ভৃত্য। অতএব একটু ভয় করেই কথা বলতে হবে আর কী!

ঢালা হুকুম হলো বাজার থেকে টাকা ধার করো। রসিদ কেটে টাকা ধার শুরু হলো। বছর শেষে রসিদ গেলো তেল কোম্পানীর কাছে। পাওনাদারদের দেনাপত্তর মিটিয়ে বাকী টাকা তেল কোম্পানী সম্রাটকে দিলেন।

এবার আমার শেখের কাহিনী শুনুন। দেখতেই তো পাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যে কী দ্রুতলয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হচ্ছে। শেখ বুঝে নিয়েছেন যে, সম্রাটের বকশিসে আর বেশীদিন চলবে না। তাই ব্যবসা শুরু করেছেন। আর এতো সহজ ব্যবসা নয়। কামিনী-কাঞ্চনের ব্যবসা।

যাক, বড়ো হয়ে আমি এলাম এই বেরুট নগরীতে। 'ডোলচা ভিটা' নাইট ক্লাবের আমি হলাম নর্তকী। কতো দেশ বিদেশ থেকে নর্তকী এলো। আমিও এলাম।

এবার লায়লার কথায় বাধা দিল মালকানি। বলল—কাহিনীর বাকী অংশটুকু আমার মুখ থেকে শুনলে জমবে ভালো।

বুঝলেন বিক্রমাদিত্য। বোম্বাই থেকে এক কোম্পানীর সেলসম্যান হয়ে বেরুট নগরীতে এসেছিলাম। দোকানে দোকানে ঘুরে জিনিস বিক্রী করা ছিল আমার কাজ। দিনের ক্লান্তি মিটাবার জন্যে প্রায়ই সিনেমা আর নাইট ক্লাবে যেতাম। একদিন এলাম এই ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবে।

মধ্যরাত্রে নাচের আসর তখন বেশ জমে উঠেছে। মিস আমিনার বেলী ড্যান্সের পর দর্শকবৃন্দ বেশ একটু উত্তেজিত। এর পরের প্রোগ্রামে এলো লায়লা।

বিক্রমাদিত্য, আমি কবি নই। তাই কোন ভাষা দিয়ে আপনাকে লায়লার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারব না। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলতে পারি যে,

প্রথম দর্শনেই আমি লায়লার প্রেমে পড়েছিলাম।

ঘরের এক প্রান্তে বসে আমি চুক-চুক করে হুইস্কী খাচ্ছি আর লায়লার রূপসুধা পান করছি, এমনি সময় ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাবের মালিক আর লায়লার মনিব শেখ এসে আমার টেবিলে বসল।

কোত্থেকে এসেছো?—শেখ আমায় জিজ্ঞেস করে।

হিন্দুস্থান— আমি জবাব দিই।

চমৎকার। ক'দিন থাকবে?

ঠিক নেই। একমাস, দুমাস, প্রয়োজন হলে বছর।

কি কর?

ব্যবসা।

মেয়েমানুষ ভালো লাগে? শেখের প্রশ্ন শুনে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। এমন সহজ, স্পষ্ট ভাষায় কেউ কোনদিন জিজ্ঞেস করেনি যে, মেয়েমানুষে আমার রুচি আছে কিনা।

শেখ যতো সহজে আমাকে প্রশ্ন করল আমি কিন্তু অতো সহজে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। আর শুধু তাই নয়। আমার মনে একটু আতঙ্কও হয়েছিল। ভাবলাম যদি বিপদে পড়ি। এ অঞ্চলে পরিচিত তো কেউ নেই। তাহলে কী হবে?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শেখ হেসে বলল - মেয়েমানুষ বড়ো ঝামেলার ব্যাপার। পয়সার দরকার। আর পয়সা ঢাললেই কী সব মেলে। টাকা ঢাললেই তো হৃদয় পাবে না।

তারপর লায়লাকে দেখিয়ে বলল—ঐ যে মেয়েটিকে দেখছো— দি বিউটি কুইন অব মাই নাইট ক্লাব। কিন্তু থাকগে—নেভার মাইন্ড। কিন্তু কেন সতর্ক করছি জানো? পয়সা না থাকলে কিসসু সুবিধে হবে না।

জবাব দেবার মতো কোন কথা আমি খুঁজে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

তারপর কদিন নাইটক্লাবে যাইনি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ঐখানে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হলো। কিন্তু পয়সা হাতে নেই। একরাত্রে নাইট ক্লাবে তো কম খরচ হয়না। মদ আছে, ওয়েটার আছে, তারপর আরো যদি আনুসঙ্গিক কিছু চান, তবে তো পয়সার কোন হিসেবই থাকবে না। কোম্পানীর কিছু টাকা আমার হাতে ছিল। সেই টাকা নিয়ে গেলাম ক্লাবে।

ফ্লোর শো সবে মাত্র শুরু হয়েছে। একটা নাচ আর গানের পার্ট ছিল লায়লার। সেই সময়ে আমি ম্যানেজারকে শ্লিপ পাঠালাম। ম্যানেজার এলো। জিজ্ঞেস করলাম—শেখের সঙ্গে দেখা করতে পারি কী?

উনি তো এখানে নেই। রিয়াদে গেছেন। দুহপ্তা বাদে আসবেন—আপনার কী প্রয়োজন?

ঐ মেয়েটির নাম কী বলতে পারেন? লায়লাকে দেখিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার উদ্দেশ্য যেন এবার ম্যানেজারের কাছে স্বচ্ছ সরল হয়ে গেলো। বলল—ওর নাম লায়লা। কিন্তু ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। ওতো শেখের পুষি্য মেয়ে।

আই সী—আমি মৃদু কণ্ঠে জবাব দিই, তারপর বলি—না, আমি ওর সঙ্গে শুধু একবার আলাপ করতে চাইছিলাম। সম্ভব হবে কী?

অসম্ভব নয়। তবে কী জানেন? সাধারণতঃ আমরা খদ্দেরকে আর্টিস্টদের সঙ্গে মিশতে দিইনে। বড্ডো ঝামেলায় পড়তে হয়। তবে আপনি যখন অনুরোধ করছেন তখন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু⋯

ম্যানেজারের 'কিন্তুর' মানে আমি জানতাম। তাই ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলাম। হেসে জবাব দিল—আফটার দি শো।

শো শেষ হলো রাত তিনটেয়, দর্শকবৃন্দ একে একে বাড়ী চলে গেলো। একটা টেবিলে আমি তখনও হুইস্কীর বোতল নিয়ে বসে আছি। ওয়েটার এসে বলল—শো শেষ হয়ে গেছে। বাড়ী যাবেন না?

ম্যানেজার কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করি।

উনি তো এইমাত্র বাড়ী চলে গেলেন।

বুঝতে পারলাম ম্যানেজার আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু ওয়েটারকে তো আর সব কথা বলা যায় না! শুধু জিজ্ঞেস করলাম - লায়লাকে চেনো?

ওয়েটার হাসল। অর্থপূর্ণ হাসি। হয়তো বহুজনার কাছে এমনি ধরনের হাসি হেসেছে। তাই তার হাসি আমাকে একটু লজ্জা দিল।

ওয়েটার বলল—বৃথা মন খারাপ করছেন। বাড়ী যান।

চুপ করে গেলাম। বুঝলাম শুধু অর্থ নয়, মান-ইজ্জতও গেছে।

নাইট ক্লাবের বাইরে এলাম। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। নির্জন রাস্তায় বৃষ্টির সেই সোঁদাগন্ধ ভেসে আসছে। আমি ভাবছি কী করবো? এমনি সময় একটা ট্যাক্সি এসে দরজায় দাঁড়াল। –বিদাক ট্যাক্সী?

নাম? আমি জবাব দিই।

তায়। ভেতরে এসো, ট্যাক্সিওয়ালা বলল,—আমি ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলাম।

কোথায় যাবে? ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করে।

হোটেল ওমর খৈয়াম। আমার জবাবের মধ্যে সঙ্কোচ, ইতস্ততার সুর ছিল। হয়তো ট্যাক্সিওয়ালা আমার মনের কথা বুঝতে পারল। জিজ্ঞেস করল—কারু জন্যে প্রতীক্ষা করছেন?

না, আমার কণ্ঠে ছিল হতাশার সুর।

বুঝেছি। হেসে ট্যাক্সিওয়ালা বলে। কিন্তু মেয়েরা তো সব বাড়ী চলে

গেছে। আমরা ট্যাক্সিওয়ালা। আমরা এদের সব খবর রাখি। কোথায় কার সঙ্গে কে যায় সবই আমাদের নখদর্পনে। আজকে শুধু মিস আমিনার আর মিস লায়লার খদ্দের ছিল। মিস আমিনার অবশ্যি বাঁধা খদ্দের।

কৌতূহল মানুষের মনকে তীক্ষ্ম করে তোলে। আমি অনুসন্ধিৎসু। ভালো মন্দ জানবার আগ্রহ অপরিসীম। ড্রাইভারেরর কথাগুলো আমার জানবার আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে তুলল। উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায় আমি যেন দগ্ধ হতে লাগলাম। লায়লাকে কাছে পাবার আগ্রহ হলো কিন্তু লায়লা যে আমার কাছে শুধু স্বপ্ন, সুদূরের কল্পনা!

আমি অন্যমনস্ক কিন্তু ড্রাইভার আপন মনে তার মনের কথা বলে চলেছে। তার সব কথা আমার কানে ভেসে আসেনি। যেটুকু শুনেছিলাম তার কিছুটা মনে আছে। বলছিলো—এসব মেয়েদের বাজারে বড্ডো চাহিদা। এদের জন্যে নিত্য নতুন কাপ্তান আসছে। আজ দুটো আমেরিকান এসেছিলো। আগে কখনও এ মহল্লায় আমেরিকান দেখিনি। তাই নজরে পড়লো। কিন্তু এ নিয়ে মন খারাপ করবেন না। নাইট ক্লাবের মহল্লায় এ হলো দৈনন্দিন জীবন। নতুন নিয়ে কারবার।

হোটেলে এসে ড্রাইভারের কথাগুলো মনে পড়লো। নিত্যি নতুন নিয়ে কারবার, ভালোবাসার ছিনিমিনি খেলা। কিন্তু এ প্রহসনের মধ্যে আমি কেন? সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে এসে এক অপরিচিতা কাবারে গার্লের পেছনে কেন ঘুরছি আমি? আলেয়ার পেছনে ঘুরে লাভ কী? কিন্তু কী করে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো—লায়লার রূপ যে আমাকে অন্ধ করে রেখেছে।

নাইট ক্লাবের আকর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দু'একবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নারীর আকর্ষণ এমনি তীব্র চুম্বকের মতো যে, এর হাত থেকে মুক্তি সহজে মেলে না। যতো দূরে সরে যেতে চাই ততোই যেন আরো নিকটে আঁকড়ে ধরে। জানিনা এ কীসের আকর্ষণ—দেহের না মনের। আমি রিক্ত, বলতে গেলে পথের ভিখিরী। নাইট ক্লাবের পয়সা যোগাবার মতো সম্পদ আমার নেই। কিন্তু সেদিন অর্থের দিকে তাকাইনি। ছুটে গেলাম আবার ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাবে, যেখানে বাজছে নর্তকীর ঘুঙুর, বাজছে মন মাতানো সঙ্গীত। কোম্পানীর সামান্য অর্থ আমার জিম্মায় ছিলো। সেই পুঁজি নিয়ে গেলাম নাইটক্লাবে। কিন্তু এর পরিবর্তে কী পেলাম? ভাঙ্গা হৃদয়, ক্লান্ত দেহ। প্রতিদিন যাই ফিরে আসি—যাওয়া আর আসা, এই হলো আমার জীবনের একমাত্র কাজ।

ভাগ্য নিয়ে কোনদিন জুয়ো খেলেছেন? রেসে কিংবা তাসে? হয়তো এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন কিন্তু নারীর ভালোবাসা নিয়ে যদি জুয়ো খেলেন তবে মুক্তি নেই। তাই আমি শুধু স্টেজের ফুটলাইটের পশ্চাতে থেকে লায়লার

রূপসুধা পান করতাম আর ভাবতাম কবে এ নাটকের সমাপ্তি হবে ?

আশা-নিরাশার শেষপ্রান্তে এসে একদিন সাহস করে ওয়েটারের মারফৎ স্লিপ পাঠালাম লায়লার কাছে। মনের ভেতর একটা শংকা ছিলো, দ্বিধা ছিলো কিন্তু লজ্জা ছিলো না। জবাবের প্রত্যাশা করিনি। কারণ লায়লার বহু স্তাবকদের মধ্যে আমি অন্যতম। আমার পরিচয় তার কাছে অজ্ঞাত।

কিন্তু তবু সেদিন আমাকে নিরাশ হতে হয়নি। ভগবান সদয় ছিলেন, তিনি আমার মনের বাসনাকে পূর্ণ করলেন। কী করে, সেইটে বলছি।

সেদিনকার প্রোগ্রামে একটা নাচ ছিলো। শিল্পী লায়লা। নাচ আর গান —এই নিয়ে তার প্রোগ্রাম। প্রতিদিনই এ প্রোগ্রাম হতো। গান গাইতে গাইতে লায়লা দর্শকদের মাঝে চলে আসতো। তারপর সেখানে থেকে এক ভাগ্যবান দর্শককে তুলে নিয়ে যেতো স্টেজে। লায়লার সঙ্গে নাচবার সৌভাগ্য সাধারণতঃ প্রথম সারির দর্শকদেরই হয়ে থাকে। আমি দ্বিতীয় সারির দর্শক। দূর থেকে লায়লাকে দেখেই আমি সুখী। লায়লার সঙ্গ নাচবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সেদিন প্রোগ্রামে অদল-বদল ঘটলো। প্রথম সারির দর্শকদের এড়িয়ে গিয়ে লায়লা এলো আমার কাছে। তারপর হাত ধরে স্টেজের উপর নিয়ে গেলো। দর্শকদের ভেতর এক গুঞ্জরণ উঠলো।

নাচের ফাঁকে লায়লা প্রশ্ন করে—স্লিপ পাঠিয়েছিলে কেন ? কী চাও ?

সাক্ষাতের প্রত্যাশী। একবার দেখা করতে চাই।

প্রয়োজন ? ভুলে যেওনা আমি নর্তকী। দর্শকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু প্রোগ্রামের ভেতর দিয়ে।

কারু সঙ্গে দেখা করাটা নিশ্চয় অপরাধের নয় ?

এ কাজের জন্যে পয়সার দণ্ড দিতে হবে জানো ? ক্যাবারে গার্লের রূপের যাচাই করতে হলে রূপোর প্রয়োজন।

জীবনের সর্বত্র রূপোই প্রবেশপত্র কিনা এটা যাচাই করে নিতে আপত্তি কিসের ? আমার কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস ছিলো।

চুপ করে গেলো লায়লা। বুঝতে পারলাম যে তার মনের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব চলছে। খানিক বাদে লায়লা আবার প্রশ্ন করল—তুমি কোন দেশের ?

ভারতীয় ! আমার জবাব ছিলো সংক্ষিপ্ত।

শুনেছি তোমরা গোঁড়াপন্থী। মেয়েদের সঙ্গে নাচতে তোমাদের শরমে বাঁধে।

আমার বাঁধে না। যদি বাঁধতো তাহলে তোমার কাছে আসতুম না।

বেশ, এসো তাহলে কাল রাত বারোটার সময়। ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করো—আমার বাড়ীর সন্ধান দেবে। ক্যাবারে গার্লের বাড়ীর সন্ধান ওয়েটারেরা দিয়ে থাকে। এখানকার এইটে প্রচলিত নিয়ম।

নাচের সমাপ্তির শেষে নিজের আসনে চলে এলাম। নিজেকে ভাগ্যবান বলে

মনে হলো। আমার জীবনের স্বপ্ন, বাসনা পূর্ণ হয়েছে। যে নারীর সান্নিধ্য আমি চেয়েছিলাম আজ সে আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে।

মনের উত্তেজনায় শো'র বাকী অংশটুকু দেখতে পারিনি। এজন্যে মনে কোন ক্ষোভ ছিলো না। শো দেখতে আমি তো এখানে কোনদিন আসি না —আমি আসি লায়লাকে দেখতে।

সেদিন রাতে আমার ঘুম হয়নি। সারাটা রাত লায়লাকে নিয়ে আকাশকুসুম রচনা করেছি। কল্পনার জাল বুনেছি। সুখ দুঃখের স্বপ্ন দেখেছি। আমার জীবনে নারীর সংস্পর্শ এই প্রথম; তাই এই উত্তেজনা, এই কৌতূহল।

রাত গড়িয়ে ভোর হলো। প্রভাতের সূর্য এসে পৃথিবীকে জাগিয়ে তুললো। আজকের পৃথিবী আমার কাছে আরো সুন্দর বলে মনে হলো। মনে হলো, বেরুট নগরীর মাধুর্য যেন আমার কাছে বেড়েছে। আজ সবই আমার কাছে নতুন বলে মনে হলো। বুঝতে পারলাম পৃথিবীকে আমরা দেখি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যখন বদলায় তখন পৃথিবীর রংও বদলায়।

সময় বয়ে যায় স্রোতের ধারার মতো। কিন্তু সেদিন আমার কাছে প্রতিমুহূর্ত যেন এক যুগ বলে মনে হলো। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। কী করে কাটবে আমার সময় এইটে আমার চিন্তা। প্রেমের এমনি যন্ত্রণা! কিন্তু তবু স্বীকার করবো প্রেম আমার দেহে বা মনে কোন ক্লান্তি বা অবসন্নতা আনেনি।

নির্ধারিত সময়ের বহু আগেই চলে এসেছি লায়লার বাড়িতে। কোলাহল বর্জিত নির্জন রাস্তা। তার বুকের উপর দিয়ে আপন মনে পায়চারী করছি। প্রেমের স্বপ্নে আমি বিভোর। পৃথিবী যেন আমার মন থেকে দূরে সরে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে কে এলো, কে গেলো তার নজর করিনি।

দুপুর বারোটা বাজলো। আমি লায়লার বাড়ীতে গিয়ে কড়া নাড়লাম। প্রথমটায় যে একটু ভয়, সংকোচ হয়নি এমন নয়। কিন্তু প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দিতে হলে সাহসের প্রয়োজন; তাই বুকে বল নিয়ে লায়লার বাড়ীতে উপস্থিত হলাম।

কড়া নাড়া দিতে একটি মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। পোষাক পরিচ্ছদে আচার ব্যবহারে কোন সন্দেহ রইলো না যে মেয়েটি লায়লার ঝি। হয়তো সে আমার আগমনের কারণ জানতো। তাই কোন প্রশ্ন করেনি। বসবার ঘরে নিয়ে আমাকে বসাল।

আমার জন্যে লায়লা প্রস্তুত হয়ে ছিলো। সাজ গোজ করে যখন বেরিয়ে এলো তখন তাকে ভারী সুন্দরী বলে মনে হলো। আমি মুগ্ধ হয়ে বেশ খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোন প্রশ্ন করার অবকাশ পাইনি।

লায়লা আমাকে সতর্ক করল। বলল —এখানে থাকা চলবে না। শেখের অনুচরবৃন্দ চারদিকে নজর রাখছে কে এলো, কে গেলো। কোন নিরালা পার্কে গিয়ে বসা যাক।

আমরা দুজনে গেলাম—রৌসে অঞ্চলে। সমুদ্রতট, লোকে-লোকারণ্য। দুপুরের প্রখর রৌদ্র তবু যেন জনতার ভাঁটা কমেনি। জনকলরবে মুখরিত বেরুটের সমুদ্রতট। এক নির্জন নিরালা রেঁস্তোরায় গিয়ে বসলাম। ঐ যে 'সিন্দাবাদ' রেস্তোরাঁ দেখছেন, সেদিন ঐখানেই আমরা দুপুরটা কাটিয়েছিলাম। কিন্তু সারাটা সময় আমরা কোন কথা বলিনি। হয়তো ভাষা ছিলো কিন্তু বলবার কিছু ছিলো না। হয়তো বা যা বলতে চেয়েছিলাম ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম যে, আমাদের এই ক্ষণিকের মিলন, স্বল্পকালের দেখা হলো ভালবাসার টান, হৃদয়ের আকর্ষণ। পথের কলরব সেদিন আমাদের মনে কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি।

শুনেছি প্রেম মানুষের জীবনকে মহান করে কিন্তু সেদিন আমি প্রেমের আগুনে দগ্ধ হয়েছিলাম। তার উত্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনি। তবু সে ভালোবাসার উত্তাপ, তার আকর্ষণ আমার ভালো লেগেছিলো।

লায়লার সাহচর্য আমার প্রতিমুহূর্তের কামনা। কী করে তাকে নিকটে পাবো এই ছিলো আমার স্বপ্ন।

আমার জীবনের এই অস্থিরতা লায়লার দৃষ্টি এড়ায়নি। পতঙ্গের মতো আমি যে তার ভালবাসায় দগ্ধ হচ্ছি এটা সে বুঝেছিলো। তাই একদিন আমাকে সতর্ক করে বলল—নাইট ক্লাবে তুমি বড্ডো বেশী আনাগোনা করো। নাইট ক্লাব হলো মুসাফিরের পান্থশালা, দেহের খিদে মেটাবার জায়গা। তুমি আমি যারা দিন আনি দিন খাই, এ স্থান তাদের জন্যে নয়। আর শেখকে জানোতো? রমণীর চাইতে রূপোই তার কাছে কাম্য। কপর্দকহীন মালকানির নাইট ক্লাবে যাতায়াত সে সহ্য করবে না।

লায়লার সতর্কবাণী আমায় নিরুৎসাহ করেনি। আমার মনের শক্তি, আমার কামনা বাসনা তার কথায় বিসর্জন দিইনি। নিজের উপর বিশ্বাস রেখেছি। ভেবেছি প্রেম সাগর পার হতে হলে সামান্য বাধা-বিপত্তিতে দ্রূক্ষেপ করলে চলবে কেন?

তারপর ভেবেছি, এই নিশাচরের জীবন, নাইট ক্লাবের উচ্ছৃঙ্খলতা, এর হাত থেকে কী নিষ্কৃতি নেই? এই উন্মুক্ত পৃথিবী, কতো জায়গা আছে যেখানে কোলাহল নেই, বিবাদ নেই, হিংসা নেই, সেখানে কী আমরা গিয়ে বসবাস করতে পারিনা! মনের কথা একদিন লায়লার কাছে প্রকাশ করেছিলাম। বলেছিলাম—রাত্রির এই জীবনের কী স্থিতি? দেহের মাদকতা বিতরণ করে, মানুষের দেহের খিদে মিটিয়ে তোমার কী শান্তি? চলো, আমরা দুজনে এমনি কোথাও যাই যেখানে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করব না, কাউকে ভয় করতে হবে না।

আমার কথাগুলো যেন লায়লার কানে বেসুরো শোনাল। হয়তো তার ভালো লাগেনি আমার এই প্রস্তাব। তাই সে মৃদু হাসল। জবাব দেয়নি।

যে কথা তার ভালো লাগেনা সে কথার কোন জবাব লায়লা দিতো না। হাসতো, তার হাসির মধ্যে এমনি একটা মাধুর্য ছিলো যে, আমাকে নির্বাক করে দিত। আর একদিন এই কথা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেদিন লায়লা আমাকে বলেছিলো—আজ আমি সমাজ-সংসারের অনেক বাইরে। আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যার এগোবার পথ নেই তাকে হাতছানি দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে লাভ কী? মালকানি, আমাকে ফিরতে বলো না। আর কোথায় বা যাবো? সভ্য সমাজের বাধা ধরা আইন কানুনে তো মানুষ হইনি। আমি পথের মেয়ে, পথে থাকাই আমার উচিৎ। বরং তুমি যদি আমায় তোমাদের দেশে নিয়ে যাও, তবে ভেবে দেখতে পারি।

এবার আমার ইতস্তত করার পালা। আমি দেশত্যাগী, পরবাসে এসে কী জীবনযাপন করছি এ আমার দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত। আজ এক পরকীয়ার হাত ধরে আমার পরিচিত সমাজে গিয়ে উঠতে কুণ্ঠা বোধ করবো। কলঙ্কের জয়টিকা পরতে আমার সঙ্কোচ।

আমি লায়লার প্রস্তাবকে এড়িয়ে গেলাম।

*　　　*　　　*

তারপর একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো আমার প্রেমের জীবনে মেঘ ঘনিয়ে এলো। আজকের বিপদ শেখকে নিয়ে নয়, পুলিশের হাঙ্গামা সংক্রান্ত।

একরাত্রে নাচের আসর বেশ জমে উঠেছে। যেমনি আসর জমে প্রতি রাত্রে। কিন্তু আজকের শো'র বৈশিষ্ট্য ছিলো। আমিনার নতুন নাচ, দেহভঙ্গী, জনতার হৃদয়কে সাড়া দিয়েছিলো। তাই প্রতি মুহূর্তে দর্শকের তীব্র উল্লাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো যে নাইট ক্লাবের জীবনে আর কিছু না থাক, জীবন উপভোগের বস্তু আছে। কিন্তু হঠাৎ নাচের তাল ভেঙ্গে গেলো। বাইরে একটা সোরগোল শোনা গেলো। ব্যাপারটা কী ভালো করে জানবার আগেই দেখতে পেলাম সশস্ত্র পুলিশ নাচের ফ্লোরে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা ম্যানেজারের অনুসন্ধানী।

ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাবের ম্যানেজারের প্রতিভা বহুমুখী। সেই প্রতিভার এক অংশ ছিলো চোরাই মালের কারবারে লিপ্ত। এ কাজটা অতি সন্তর্পণে চলতো। জানবার উপায় ছিলো না কিন্তু ব্যাপারটা পুলিশের অজ্ঞাত ছিলো না। মাল সমেত ধরবার ফিকিরে ছিলো। তাই একাজ হাসিল করতে আজ নাইট ক্লাবে হানা দিয়েছে। কিন্তু আজো তাদের নিরাশ হতে হলো। সতর্ক, চতুর ম্যানেজার পুলিশের আগমনের আভাস পেয়েছিলো আগে থেকেই। তাই পুলিশ যখন নাইট ক্লাবের স্টেজে অবতীর্ণ হলো তখন সে রাতের অভিনয়ের প্রধান নায়ক পশ্চাৎদ্বার দিয়ে বিদায় নিয়েছে। তাই ম্যানেজারের হয়ে জবাবদিহি দিতে হলো নাইট ক্লাবের শিল্পী আর, কর্মচারীদের। নিজেদের

নির্দোষ প্রমাণ করতে তারা নাজেহাল হয়ে পড়ল।

আমি দর্শক, আমার কাছে পুলিশের আগমন নাটকের দৃশ্যের পরিবর্তনের সামিল। কিন্তু লায়লা সম্বন্ধে আমি চিন্তিত ছিলাম। পুলিশের জবাবদিহি থেকে কী করে লায়লাকে ছাড়িয়ে আনা যায়, এইটে হলো আমার প্রধান চিন্তার বিষয়। কিন্তু লায়লা চতুরা। গোলমালের আভাস পেয়ে সামান্য দর্শকের বেশে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কানে কানে মৃদুস্বরে বলল—নর্তকীর আর পুলিশের মিলন কখনই শুভ নয়। হাঙ্গামা বাড়তে পারে। চলো সরে পড়া যাক।

কোথায়? কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

যেখানে দু'চোখ যায়। বিপদকে এড়াতে হ'লে এ স্থান ত্যাগ করাই প্রধান কর্তব্য।

যাবার কোন স্থানই সে রাতে ভেবে পাইনি। পেলেও খুঁজে বার করা সহজসাধ্য ছিলো না। আমার পরিচিত একমাত্র স্থান আমার হোটেল। এ অঞ্চলে লোকনিন্দা বা মুখরোচক আলোচনার সম্ভাবনা নেই। হোটেলের ঘরে নারীর আগমন এখানে আলোড়নের বা প্রতিবাদের ঢেউ সৃষ্টি করে না। চরিত্রে কলঙ্কের ছাপও পড়ে না। তাই সে রাত্রে আমার সঙ্গে বাস করতে লায়লা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয়নি।

রাত কাটাবার ভাবনা থেকে মুক্ত হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ছিলো, এরপর কী হবে, কোথায় যাবো? আজ এ সংসারে আমি একা নই। আমার সঙ্গী লায়লা। একার উপার্জিত অর্থে দুজনার চলতে পারে না। আর আমার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল নয়। কোম্পানীর কাজে মন দিইনি, তাই তারা আমাকে জবাবদিহি করতে বলেছিল।

বেশ কয়েকটা দিন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ভেবে উঠতে পারিনি। কিন্তু চিন্তিত ছিলাম। কারণ বেরুট নগরীতে জীবনের একমাত্র বন্ধু অর্থ। বিনা অর্থে জীবন কাটানো যে সমস্যা হবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিলো না।

লায়লা শেষ অবধি প্রস্তাব করল—আমি শেখের পালিতা কন্যা। এতএব তার কাছে হাত পাততে আমার সঙ্কোচ নেই। উনি যদি আমাকে বিপথে এনে থাকেন তাহলে আজ এ পথের পাথেয় সংগ্রহ করে দেবেন।

কিন্তু শেখের কাছে হাত পাততে আমার দ্বিধা হলো। মনে মনে শঙ্কা ছিলো যে, শেখ হয়তো বা লায়লাকে আমার কাছে আসতে বাধা দেবে। কিন্তু লায়লার অনুরোধ সেদিন উপেক্ষা করতে পারিনি।

পুলিশের হাঙ্গামায় শেখ একটু কাবু হয়েছিলেন। বহু অর্থ ব্যয়ে, বহুজনার কাছে ধর্ণা দিয়ে, এই ঝামেলার হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছে। নাইট ক্লাবের মেয়েদের, কর্মচারীদের ছাড়িয়ে আনতে তাকে বেশ মোটা অর্থ খেসারত দিতে হয়েছে।

আমাদের আগমনে শেখ একটুও খুসী হননি। তার কথাবার্তায় বিরক্তির

আভাস ছিলো। কিন্তু প্রয়োজন আমাদের। তাই শেখের মনের বিষন্নতা দেখে নিরাশ হইনি। হয়তো আমাকে উনি লায়লার সঙ্গে দেখতে পাবেন এটা কখনও কল্পনা করেন নি। তাই তার বিস্ময়ের মাত্রা একটু উঁচু পর্দায় ছিলো।

শেখের মনকে ভেজাল লায়লা। তার হাসি এবং বাকচাতুর্যের কাছে শেখ হার স্বীকার করল। লায়লা তাকে জানাল—নাইট ক্লাবের ম্যানেজার চোরাই মালের কারবারের অংশীদার। এ তার বহু পুরাতন ব্যবসা। জীবিকা উপার্জনের এইটি তার একমাত্র পথ নয়। নাইট ক্লাবের মেয়েদের ভাঙ্গিয়েও সে বেশ কিছু অর্থ রোজগার করছে।

সংবাদটা শেখের কাছে বিস্ময়কর নয়, অপ্রত্যাশিত। তাই হকচকিয়ে প্রশ্ন করল একথা তো কেউ আমায় বলেনি।

নর্তকীর পেশা স্টেজে অবতীর্ণ হওয়া। স্টেজের অন্তরালে কী ঘটছে সেইটে নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। - লায়লা জবাব দেয়।

প্রথমটায় চুপ করে থাকে শেখ। তারপর বলে,—যদি নাইট ক্লাব বন্ধ করে দি ?

লায়লা মৃদু হাসল। বহু পুরাতন হাসি। এর মানে আমার কাছে অজ্ঞাত নয়। বলল—নারীর সবচাইতে বড়ো সম্পদ দেহ আর যৌবন। এ দুটো অটুট থাকলে জীবিকা উপার্জনের চিন্তা করতে হয় না।

শেখ লায়লার জবাব শুনে চুপ করে গেলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, শেখ নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছেন। নাইট ক্লাব আর লায়লা দুই-ই যেন তার কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় এইটেই তার প্রধান চিন্তা।

এবার শেখ আমার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল—তোমার কী বক্তব্য ? তুমি কী বলো ?

আমি ! আমার জবাবে ছিলো বিস্ময়ের আভাস।

হ্যাঁ। লায়লাকে নিয়ে যে জীবন বেছে নিয়েছো সে জীবনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। মেয়েমানুষের বিস্তর খরচ। আমার উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় হয় আমার হারেমের পেছনে। ভুলে যেও না লায়লা ক্যাবারে গার্ল। সৌখীন জীবন। অতএব খাওয়ানো পরানো নয় পোষাক পরিচ্ছদ, কসমেটিকস, সব কিছুর জন্যে তোমাকে ব্যয় করতে হবে।

আমি নিরুত্তর। কোন জবাব দেবার মতো কথা খুঁজে পাইনি। শেখের উপদেশের ভেতর কোন নতুনত্ব ছিলোনা নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি উদাসীন নই।

শেখ হঠাৎ আমায় একটা উপায় বাতলে দিল। বলল—চাকরী করবে ?

চাকরীর প্রস্তাব আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। তাই ক্ষণিকের জন্যে নির্বাক হয়েছিলাম। শেখ বলল—আমার নাইট ক্লাবের ম্যানেজারের চাকরী ! এ কাজটা

সহজ নয়। পুলিশের হাঙ্গামা, মেয়েমানুষের আব্দার, দর্শকের কলহ, নাইট ক্লাবের ম্যানেজারের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে!

ভেবে দ্যাখো এ ঝুঁকি নেবে কিনা? যদি প্রস্তুত থাকো তবে নাইট ক্লাবের মুনাফার এক অংশ তোমার। অবশ্য এ জীবনে শুধু ঝামেলাই নয়, এর ভেতর নতুনত্বও আছে। রমণীর মন জয় করার জন্যে শহর উজাড় করে দর্শক তোমার কাছে আসবে। তুমি হবে ভালোবাসার ছিনিমিনি খেলার বিচারক। যাক, একবার ভেবে দেখো কী করবে?

একাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা ছিলো। কিন্তু দূর থেকে সংকেতে লায়লা আমার মনের সংশয়কে দূর করল! আমি শেখের প্রস্তাবকে গ্রহণ করলাম।

শেখ হেসে বলল—নাইট ক্লাবের দায়িত্ব আজ থেকে তোমার মালকানি। আমার সংগে শুধু লাভ-লোকসানের সম্পর্ক। এর হিসেব হবে বৎসরান্তে।

আমার জীবন পাল্টে গেলো বিক্রমাদিত্য। সেলসম্যান মালকানি হলো নাইট ক্লাবের ম্যানেজার। জিনিষের দালালী ত্যাগ করে মেয়ের দালালী ধরলাম।

নাইট ক্লাবের জীবনের মাঝে যে বিচিত্র রং দেখেছিলাম, অতি স্বল্পকালের মধ্যে সেই আলোর ঝলকানি দূর হয়ে গেলো। আলো হলো আলেয়া। কেন? শুনুন তবে আমার নাইট ক্লাবের জীবনী।

* * *

মানুষ কী চায় বিক্রমাদিত্য? ভালোবাসা, না ঐশ্বর্য?

বিংশ শতাব্দীতে ঐশ্বর্য দিয়ে ভালোবাসাকে কিনতে পাবেন। আর সেই বিকিকিনির দোকান হলো নাইট ক্লাব। জীবনে নাইট ক্লাবের প্রয়োজন আছে। মনের আকাঙ্ক্ষাকে এইখানে আপনি সঙ্গীতের রেশের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন। অতীতে আমাদের দেশে ছিলো বাইজীর ঘর—বিংশ শতাব্দীতে তারই নাম হয়েছে নাইট ক্লাব।

যাক, এবার আসুন আমার সঙ্গে নাইট ক্লাবে। বড়ো রাস্তার উপর আলোয় ঝকমক করছে আপনার ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাব। না কোন ভুল করেননি, ঘরে ঢোকবার মুখেই দেখতে পাবেন অর্ধনগ্ন রমণীর বিভিন্ন পরিবেশ। বহু লোভনীয় চিত্র যা দর্শকবৃন্দকে এই ঘরের ভেতর টেনে আনে। নাইট ক্লাবে যাবার সঙ্কল্পের দ্বিধা বা সঙ্কোচ দূর করার জন্যে এদের বিচিত্র ভঙ্গীতে টাঙানো হয়েছে। ভেতরে আসুন, দেখতে পাবেন মস্তো বড়ো আসর। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলবার সংগে সংগে এই ঘুমন্তপুরী যেন জেগে ওঠে। জনকোলাহলে, সংগীতের রেশে নির্জনপুরী মুখরিত হয়ে ওঠে। ভেতরের এই চাকচিক্য বাইরে থেকে বোঝবার যো নেই।

প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যায় আমার নাইট ক্লাবের সামনে যখন অসংখ্য লোক এসে

ভীড় করে দাঁড়াতো, তখন আমি বুঝতাম বুভুক্ষু মানুষ কী চায়? এরা সমাজের মণি, নাগরিক জীবনের স্তম্ভ। জীবনকে এরা উপভোগ করতে চায়, বোঝাতে চায় বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে। শুধু ছেলের দল নয়, মেয়েরাও আসে বিস্তর। প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রাত্রে এই নাইট ক্লাবে যেন রূপের হাটবাজার বসে।

এবার কল্পনা করুণ ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাবের ম্যানেজারের গদীতে আপনি বসে আছেন। ভুল সতর্কবাণী করেনি শেখ। নাইট ক্লাবের হাঙ্গামা বিস্তর। প্রতিদিনই এই ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে। সারাটা দিন আপনার যথেষ্ট খাটুনি গিয়েছে। টেবিল সাজিয়েছেন, নাচের ফ্লোর ঠিক করেছেন। লাইটের বন্দোবস্ত করেছেন। ভি. আই পি-দের টেবিলে ফুলের তোড়া দিয়েছেন। সব টেবিলে এ্যাসট্রে আছে কিনা নজর রাখতে হবে। নাচের ফ্লোরে একটু পাউডার ছড়িয়ে দিন। অনেকদিন এ ফ্লোরটা ব্যবহার করেছেন। তাই একটু ঝালিয়ে নেওয়া ভালো। শুধু কী তাই? ওয়েটারদের গুনে দিয়েছেন মদের বোতল। নইলে রক্ষে নেই। বড্ডো সেয়ানা, চতুর এই সব ওয়েটারের দল। শুধু নাইট ক্লাবের দর্শকদের ফাঁকি দিতে পটু নয়, সুবিধে পেলে আপনাকেও লেংড়ি দেবে। এদের ঝক্কি সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ এদের ছাড়া আপনার ক্লাব চলবে না। শুধু মদ বিতরণের জন্যে নয়, দর্শকদের সামলাবার জন্যে, মেয়েদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্যে, কিংবা রাস্তার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে এদের সাহায্য আপনার চাই। আপনার জীবন এদের নখদর্পনে। কে কোন মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে একটু হেসে কথা বলেছে, এরা জানে। কোন মেয়ে আপনার পেয়ারের, এরা বলতে পারে। মেয়েদের গতিবিধি বা তাদের স্তাবকদের ইতিহাস এদের কণ্ঠস্থ। অতএব নাইট ক্লাব চালাতে হলে এদের খুসী না রেখে উপায় নেই।

আসুন আমার সঙ্গে বারের কাউন্টারে। র‍্যাকের উপর সাজানো আছে হরেক রকমের মদ। হুইস্কী, রাম, জিন, শেরী, পোর্ট বা ভেরমুথ - সাদা অথবা পিভাস রিগ্যাল,—লাল—সবুজ রংয়ের বিচিত্র সুরা। এক ধরনের মদ রাখলে চলবে না। সাত আট রকমের মদ, বিভিন্ন মার্কা থাকা চাই। শুধু মাত্র স্কচ হুইস্কী, ভ্যাট সিক্সটি নাইন নয়—আপনার ঘরে মজুত রাখা চাই জন হেগ, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, জনিওয়াকার, রেড লেবেল বা ওল্ড স্মাগলার কিংবা 'বেল'। হরেক রকমের, বিভিন্ন রুচির ক্রেতা। নিত্যি নতুন লোক আসছে। কেউ বা চাইবে স্কচ হুইস্কী, কারু পছন্দ আমেরিকান বা কেনাডিয়ান হুইস্কী। দিনটা বেশ জমজমাট। বাইরে একটু হিমেল হাওয়া বইছে। অমনি কনিয়াকের চাহিদা বেড়ে গেলো। থ্রিস্টার মার্টেলের বোতল নিয়ে আপনার ওয়েটার ঘোরা-ফেরা করছে। কিন্তু হঠাৎ ঘরের এক কোণের টেবিল থেকে চাইল কুরভোশিয়ের। কিংবা নাসোলিও অর্ডার দেবার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারলেন মস্তো বড়ো

খদ্দের। কোম্পানীর ডাইরেক্টর। এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টে ডিনার দিচ্ছেন বান্ধবীদের। মেয়েদের মধ্যে কেউ বা চাইল নাঁপোলিও কেউ বা 'পেতিত করপোরাল'। এর পাশের টেবিলে বসে আছেন এক রাজদূত। সঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরের হোমড়া-চোমড়ার দল। এদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রতিমুহূর্তে এসে এদের প্রয়োজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এদের চাই সেরা মাল। কিস্কুই দেবুসে বা রেমে মাঁরতা। একটু স্ট্রেগ কনিয়াক।

আপনি ভাবছেন শুধু যুবক-যুবতীদের নিয়ে আপনার কারবার? ভুল করলেন। অল্প বয়সের খুকীরাও আপনার নাইট ক্লাবের দর্শক। এদের কী দেবেন? সিনজানো, রেড মার্টিনি বা তিও পেপে শেরী। যাদের যৌবন বিগত, অতীতের স্মৃতিকে রোমন্থন করতে যারা আসেন, সেই বৃদ্ধাদের হাতে দেখতে পাবেন ভেরমুত, 'দুই বোনে বা নোয়ালি প্রা'।

শুধু মদের ভান্ডার নিয়ে আপনার কাজ নয়। এবার রান্নাঘরের দিকে নজর দিন। ড্যান্স সুরু হবার আগে সবাই ডিনার খাবে। ভালো মেনু রাখতে হবে। ফ্রেঞ্চ কুইজিন, কিংবা ইতালিয়ান ডিশ আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ওরিয়েন্টাল খাবার। আলা'কার্তে লেখা আছে ফরাসী নাম। আজকের মেনুতে আছে সুপ কনসোমে বা সুপ স্তোয়াইও। তারপর প্লেট সাজিয়ে দিন 'ওর দ্য অভ 'ভেরিয়ে'। এবার দিন আমেরিকান বীফ স্টীক কিংবা পুলে রোতি। মাখনে রোস্ট করবেন আপনার মুর্গী। তার সঙ্গে থাকবে পোম ফ্রিত আর সালাদ। ডেজার কী দিচ্ছেন? পিস্টাশিও আইসক্রীম না ফ্রুটস্। আলা কার্তে হরেক রকমের খাবার ছড়িয়ে আছে। কোনটা ফরাসী বা কোনটা ইতালিয়ান ভাষায় লেখা। সবাই দাম দেখবে। বাজারের সঙ্গে যাচাই করবে। কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, দামী বা সস্তা। বলবে, পাশের রেস্তোরার খাবার অনেক ভালো।

ডিনারের ফ্যাকড়া কোথায় জানেন? খাবার দিলেন তো সেই সঙ্গে ভালো ওয়াইন দিতে হবে। পুলে রোতি দিলেন তো সবাই চাইবে রেড ওয়াইন। বুরগান্ডী বা বর্দো রেড ওয়াইন দিতে পারেন। হরেক রকমের বুরগান্ডী বোজ্জলে, সাভোনাফ দ্য পাপ, নুই সাঁ জর্জ বা পোমার। ওদিকে বর্দোর মধ্যে আছে সাঁ এমিও, ভিওই বর্দো বা মেদোক। পুলে রোতির বদলে খদ্দের মাছ নিয়েছে তো আপনাকে খুলতে হবে হোয়াইট ওয়াইনের বোতল। কী দেবেন বলুন? বুরগান্ডী না বর্দো। একটু মিষ্টি মদ দিতে চান তো দিন সোঁতোরণ বা আনত্রে দ্য মার। বুরগান্ডী চাইলে দেবেন পেতিত সাবিলি। কিন্তু হুঁসিয়ার। হোয়াইট ওয়াইন ঢালবার ঘন্টা দুইয়েক আগে বোতলগুলো ফ্রিজিডিয়ারে রেখে দেবেন। আর একদল আছে যারা ওয়াইন নেবেনা। চাইবে রোজে। মজার জিনিষ এই রোজে। এদিয়ে মাছ-মাংস দুটোরই কাজ চালাতে পারেন তবে একটু ঠান্ডা করে নেবেন। কী রোজে দিচ্ছেন? রোজে দ্য আনজু, না পুঁই ফুসে?

কিন্তু সবই ফরাসী মার্কা হওয়া চাই।

বড়ো পাকাপোক্ত এসব ব্যাপারে আপনাকে হতে হবে। ওয়াইনের নাম আর স্বাদ নখদর্পণে রাখতে হবে। কোনটা মিষ্টি—কোনটা কটা। মেনু দেখে খদ্দের আপনার খাবারের নাম বলে গেলো। এবার আপনার প্রশ্ন করার পালা। জিজ্ঞেস করুন কী ওয়াইন দেবেন। হোয়াইট না রেড ওয়াইন কিংবা ইতালিয়ান কিয়ান্তি। ভুলে যাবেন না। আপনার খদ্দের সব হোমড়া-চোমড়ার দল। মায় হলিউডের ফিল্মস্টার অবধি। দর্শকের প্রথম সারিতে হয়তো বসে আছে গ্রেগরী পেগ, কিম নোভাক বা জেম ম্যানসফিল্ড। হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন ব্রিজিট বারদোটকে। অবাক হবার কথা নয়। শুধু ফিল্মস্টারই নয়, আপনার নাইট ক্লাবে নিত্যি আসছে সিমন দ্য বুভোয়ার ফ্রান্সোয়া সাঁগা, মনতারলা। বিস্মিত হবেন না। বেরুট হলো 'পেতিত পারী'।

এবার অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করুন আপারেতিফ কী দেবেন। বীয়ার, জিন টনিক, হুইস্কী না শেরী। মেয়েরা শেরী নেবে। সান্ডিমান থ্রীস্টার। ছেলেদের রুচি বিভিন্ন কিন্তু আপনার আসল কৃতিত্ব হলো ককতেলে। এই ককতেল বানিয়েই তো আমি নাইট ক্লাবের বাজারে নাম কিনলাম। কী ককতেল বানাচ্ছেন? ফিফটি ফিফটি? একটু মার্টিনি নিন—তারপর জিন। সেই সঙ্গে একটু লিমন আর দুটুকরো বরফের কুচি। তারপর বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিন।

খাবার যেই শেষ হলো অমনি লিকোরের লিস্ট নিয়ে হাজির হলেন। বহুজনার বহুরুচি! ফাস্টোক্লাস মাল আপনাকে ছড়াতে হবে। চেরী ব্রান্ডি, ড্রামবুই বা বেনিডিকটিন। একটু মিষ্টি কমলালেবুর গন্ধওয়ালা লিকোর দিতে চান তো দিন কনত্রো। আর একটু মিষ্টি লিকোর দিতে চান তো দিন কুরাসো। কিন্তু স্যার, আপনাকে একটা সেরা লিকোরের নাম বলছি—ক্রেম দ্য মন্থ ফ্রাপে। সবুজ রং লিকোর তার উপর বরফ কুচি করে দিলেন। পরখ করে দেখুন। একেবারে সেরা চীজ।

যাক্, এবার কাউণ্টারে গিয়ে খোঁজ নিন। চারদিকে লোক গিস্ গিস্ করছে। সুন্দরীদের নিয়ে প্রতি মুহূর্তে লোক আসছে। দোরের সামনে নাইট ক্লাবের বয় গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিচ্ছে। আপনি স্মোকিং আর ব্লাক টাই পরে চারদিক তদারক করছেন। কাকে কোন টেবিল দিতে হবে। প্রতি মুহূর্তেই টেলিফোন আসছে। অমুক লোক আসছে। তার জন্যে একটা ভালো টেবিল চাই। যদি তার রুচি অনুযায়ী টেবিল দিলেন তো অমনি মেয়েদের কাছ থেকে আপত্তি এলো। এই লোকটা নাকি নিত্যি আসে আর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ইঙ্গিত করে। বেলী ড্যান্সার আমিনা তো আপনাকে স্পষ্ট বলেই দিলো যে, ঐ লোকটাকে স্টেজের সামনে বসতে দিলে আমি নাচবো না। আপনি ফ্যাঁকড়ায় পড়লেন। আমিনাকে চটাতে পারেন না। অথচ বড়োলোক খদ্দের। আবদার রাখা চাই। একটা গোঁজামিল দিয়ে সে যাত্রায়

হক্কে পেলেন। এবার প্রস্তাব এলো সাদিয়া জামালের কাছ থেকে। ওর বয়ফ্রেন্ড আসছে। দীর্ঘদিন বাদে ওদের মিলন! বহুদিনের পুঞ্জীভূত প্রেমোচ্ছ্বাসের উদ্গীরণ আজ নাইট ক্লাবে হবে। বয়-ফ্রেন্ডের জন্যে একটা ভালো টেবিল চাই। শুধু কী তাই? দিতে হবে ভালো খাবার, ভালো মদ। আর সাইড-আর্টিস্টদের বয়-ফ্রেন্ডের তো বালাই নেই। নিত্য নতুন বয়-ফ্রেন্ড আসছে যাচ্ছে।

আপনি ভাবছেন বুঝি ওরা পয়সা খরচ করবে, দূর-দূর, ওরা তো আপনার ঘাড় মটকাবে। নাইট ক্লাবে পয়সা ঢালবে কারা? মুখ্যু মুসাফিরের দল, দুদিনের যাত্রী। নগ্ন মেয়ে দেখবার জন্যে যারা পয়সার কার্পণ্য করেন না।

যাক্ নাইট ক্লাবে ঢোকবার জন্যে তো আর পয়সার দরকার নেই। শুধু এক বোতল শ্যাম্পাইন কিনলেই হলো। আপনারা চারজনা। বেশ, কিনুন এক বোতল মোঁয়ে শানদ, ব্রুট ইম্পিরিয়াল। দাম দেড়শো টাকা অথচ বাজারে এই জিনিসটা বিকোচ্ছে কুড়ি টাকায়। ব্যস ঐ বোতলের দাম থেকে টিকিটের দাম উঠে গেলো। এবার শ্যাম্পাইনের বোতল নিয়ে খদ্দেরের কাছে এলেন। ঠাণ্ডা বোতল, চার ঘণ্টা বরফে ঢাকা ছিলো। কী শ্যাম্পাইন দিচ্ছেন? পেরিয়ার জুয়ে। দূর দূর ম'শায়। খদ্দেরের নাক উঁচু। বলে বসলো চাই ভয়েভ ক্লিকে বা ড্রাই মনোপল কিংবা ডম পেরিনো। একবার বোতলের ছিপি খুলেছেন তো বোতলটাই নষ্ট হলো। দিন ডম পেরিনো'।

সন্ধ্যা থেকে আপনার কাজ। মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছেন আর্টিস্টরা সবাই এসেছে কিনা? চুনোপুটীরা ঠিক সময় আসবে। কিন্তু বেলী ড্যান্সার আমিনা বা সাদিয়া জামাল যে কখন আসবে তার ঠিক নেই। প্রতিদিনই শেষ মুহূর্তে বয়-ফ্রেন্ডের গাড়ীতে চেপে এরা আসে। এদের সতর্ক করে দেবেন এমন সাহস আপনার নেই। কারণ এই আমিনা বা সাদিয়া জামালের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নাইট ক্লাবগুলো ওৎ পেতে আছে। আপনার সঙ্গে এদের একটু মন কষাকষি হলো তো বেশী টাকা দিয়ে ওরা আমিনা বা সাদিয়া জামালকে লুফে নিল। আপনি হতভম্ব। করবার কিছু নেই। হাজার হোক মেয়েমানুষের সবচাইতে বড়ো খাঁই হলো টাকা। তাই ওদের সব আব্দার রাখতে হবে।

মাঝে মাঝে কনসার্ট বাজিয়েদের একটু তদারক করছেন। সবদিকেই আপনার তীক্ষ্ণ নজর থাকা দরকার। নইলে নাইট ক্লাবের ম্যানেজারী করা চলবে না। বলে দেবেন কী মিউজিক বাজাবে। একটু এক্সসাইটিং হওয়া চাই। 'নেভার অন সানডে' বা 'কী সেরা কী সেরা' হলে তো কথাই নেই। আজকালকার সবচাইতে বড়ো চাহিদা হলো টুইস্ট। মাঝে মাঝে রাম্বা বা সাম্বা বা হাই লাইফ চালাতে পারেন।

ঠিক রাত্রি বারটার সময় শো সুরু হলো। প্রথমে বারনাড ব্রাদার্সের রসিকতা। বিস্তর টাকা খরচ করে আপনি এঁদের প্যারীর রিগাল থেকে এনেছেন। কুড়ি মিনিটের প্রোগ্রামের জন্য আপনি প্রতিদিন এদের দিচ্ছেন

দু হাজার টাকা। কম কথা নয়। তারপর বারোভূতের নৃত্য সুরু হলো। বারো ভূত মানে পাঁচমিশালী নাচ। শুধু সময় কাটাবার জন্যে। এর পরের প্রোগ্রামে এলো সাদিয়া জামাল। সাদিয়া জামালকে দেখেই দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কী পোষাক পরে স্টেজে নেমেছে বুঝতেই পারেন। প্রভোকেটিং। সাদিয়া জামাল তো রূপসী নয়, একেবারে অপ্সরা। দর্শকদের মধ্যে শুধু তরুণ-তরুণী নয়, বৃদ্ধরাও আছেন। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। এই সর্বপ্রথম বিদেশ যাত্রা। সাদিয়া জামালকে দেখে তারা মুগ্ধ। তরুণীর নগ্ন দেহ বহুদিন তারা দেখেনি। পূর্বপ্রান্তের রূপসীরা সহজেই তাদের চিত্ত জয় করে। অতএব সাদিয়া জামালকে দেখে সবচাইতে অভিনন্দন জানাল। শুনলে অবাক হবেন বিক্রমাদিত্য, মেয়েদের কাছে সবচাইতে বেশী স্লিপ আসে এই বুড়োদের কাছ থেকে।

এবার ইন্টারভেল সুরু হলো। স্টেজে উঠে দর্শকরা নাচ সুরু করল। অধিকাংশই বান্ধবী নিয়ে এসেছে। এটাই রীতি। কিন্তু যাদের ড্যান্স পার্টনার নেই—তারা কী করবে?

হেড ওয়েটার এসে বললে—বেশ পয়সাওয়ালা তিনজন ট্যুরিষ্ট এসেছে কিন্তু এদের নাচবার সঙ্গী নেই।

কী করবেন? খদ্দেরের মন রাখতে হবে। দৌড়ে গেলেন গ্রীনরুমে। অনুরোধ করলেন ফতিমা, যমুনা বা মিস ইভান্সকে। বড়ো খদ্দের, পয়সাওয়ালা লোক। কোম্পানীর ডাইরেক্টর, ব্যবসায়ের ক্লায়েন্টদের নিয়ে এসেছেন নাইট ক্লাবে। অতএব এদের তুষ্ট রাখতে হবে। তিনটি মেয়েকে হেড-ওয়েটারের মারফৎ ওদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্যারীতে এ ঝামেলা নেই। আর্টিস্টদের সঙ্গে ক্লায়েন্টের সম্পর্ক নেই। ক্লায়েন্টের জন্যে ভিন্ন মেয়ে বরাদ্দ থাকে কিন্তু এদেশের কানুন ঠিক উল্টো।

আর একদল দর্শক আছে যারা বারের কাউন্টারে বসে চুকচুক করে মদ গিলছে আর নাচ দেখছে বা বিশ্রী রসিকতা করছে। শ্যাম্পাইনের বোতল খোলা হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। প্রতি টেবিলে স্ন্যাক দিয়ে যাচ্ছেন। জাকুজা, চীনেবাদাম, চীপস। সিগারেটের এবং নার্কোটিকসের ধোয়ায় ঘর ভরে গেছে।

আবার শো সুরু হলো। নাচের মিউজিক বেজে উঠলো। একটা গান—তারপরেই বেলী ড্যান্সার আমিনার নাচ। আমিনার নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মাঝে একটা গুঞ্জরণ উঠলো।

খ্যাতনামা বেলী ড্যান্সার আমিনার নাম শোনেন নি, অথচ আপনি এসেছেন মধ্যপ্রাচ্যে! এ কখনও সম্ভব! কখনই না। আপনাকে আমিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বেলী ড্যান্সার আমিনা, দি হেলেন অব ডোলচা ভিটা নাইট ক্লাব।

* * *

বেলী ডান্সার আমিনা।

দামাস্কাসের আরব বাজারের মেয়ে। সেই আরব বাজার যেখানে লোক গিসগিস করছে। রাস্তার দুপাশে বসে আছে দোকান পসারীর মেলা। কেউ কিনছে, কেউ বেচছে। রুটি মাংসের বা খাবারের দোকান কিংবা তারই পাশে ফুলের আড়ৎ সেখান থেকে ফুলের সুরভি ভেসে আসে। দোকানের আশেপাশের চত্বরে বসে আছে পাড়ার বুড়োরা। হুকো টানছে, গল্প করছে, রাজা উজীর মারছে। কতো মুখরোচক কাহিনী। সবাই মন দিয়ে শুনছে। মেয়ের গল্প, খুনের ইতিহাস আর রাজনৈতিক কাহিনী। দেশে নিত্য শাসনতন্ত্রের অদলবদল হচ্ছে এখানে সবাই হয় একদিনকার বাদশা। উজীর হয়ে এলেন তো কাল পথের ভিখিরী জলের বুদবুদের মতো এরা মিলিয়ে যায়। এই নিয়ে রোজই জটলা হয়। কে এলো কে গেলো।

বাজারের সামনেই একটা লিমোনেডের দোকান। সিগারেট, লিমোনেড, বিয়ার সব কিছু মিলবে। দোকানে ঢুকতেই চোখে পড়ে একটা ছবি। দেব-দেবতার ছবি নয়, আরব দেশের ভাগ্যবিধাতা গামেল আব্দুল নাসরের ছবি। তার পাশে দুই সুন্দরী আরবীয় অভিনেত্রীর ফটো। বিবস্ত্রা, লজ্জা শরমের বালাই নেই। দোকানের ভেতর তীব্র স্বরে রেডিও বাজছে। আরবীর সংগীত। কায়রোর প্রচারিত। কান খাড়া করে সবাই শুনছে। এখানে সবাই রেডিও শোনে। দেশের ভেতর কখন কী ঘটে তো বলা যায় না, রেডিও থাকলে খবর শোনার কোন অসুবিধা নেই।

দোকানের সামনেই ফুটপাথ। একদল ছেলে সেখানে কড়ি খেলছে। রোজই খেলার আসর বসে। জুয়ো খেলা নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আরব বাজারে শান্তি ফিরে আসে। আরব বাজারে শাসন করবার কেউ নেই। সবাই আপন মনে চলে।

লিমোনেডের দোকানের পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা সরু গলি। লোক টই-টম্বুর। ভালো করে হাঁটবার যো নেই। একটু অমনোযোগী হলে অন্য কারু গায়ে হোঁচট খেতে হয়। রাস্তা দিয়ে ঘাঘরা-পরা আরব সুন্দরীরা যাচ্ছে। মুখের উপর বড়ো জালি বা ঘোমটা। চোখ মুখ দেখবার যো নেই। তবু কখনো-কখনো কারু-কারু সুন্দর মুখ বেরিয়ে থাকে।

এই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ডগমগিয়ে হেঁটে চলে যায় উট। এরা দিশেহারা হয়ে ছুটে চলে। কারু প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। আরব দেশের রাজা এরা। যা খুশী তাই করবে, কিন্তু বলবার যো নেই। এদের এড়িয়ে পথ চলতে হয়।

একটু দূরে গিয়ে রাস্তা থেমে যায়। শেষ হয় বাজার, সুরু হলো মহাল্লা। নিস্তব্ধ হলো জন কোলাহল, সুরু হলো শিশুদের কাকলী। বাঁশীর সুরের মতো যেন সঙ্গীত বাজছে।

সামনেই একটা বড়ো মাঠ। ছেলেমেয়ের দল সেখানে হুটোপাটী খাচ্ছে।

বাড়ীর রকে বসে মায়েরা গল্প করছে আর বুনছে জড়ি। এ বাড়ীর ছেলের ভালো লাগে পাশের বাড়ীর মেয়েকে। যৌবনের ঢেউ উঠেছে ওদের প্রাণে। একটু নিরালা, নির্জন প্রান্তে বসে ওরা দেখে রঙীন স্বপ্ন। এরা সুখের পায়রা। এদের কাছে সবই নতুন, রঙীন পৃথিবী সুখের জীবন।

এই মহল্লারই মেয়ে আমিনা। কচি কিন্তু তার দেহ দিয়ে বইছে রূপের উজান। তার রূপের কথা উঠলে পাড়া প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলেন—মেয়ে সুন্দরী হবে না—কার মেয়ে ?

শেষের কথাগুলোর ভেতর একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকে। শৈশবে আমিনা এ বিদ্রূপ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বয়স হবার সংগে সংগে এর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়েছিলো।

বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিনার রূপে খুলতে থাকে। চারদিকের প্রলুব্ধ দৃষ্টি এসে আমিনাকে তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। আগে কোন জিনিস আমিনার ভালো লাগতো না। কিন্তু আজকাল সবই যেন তার ভালো লাগে। আগে পুরুষ দেখলে লজ্জায় এড়িয়ে যেতো। কিন্তু আজকাল পালায় না। পুরুষের সাহচার্য্য চায়। আমিনা ভাবে তার দেহের এই পরিবর্তন, মনের এই হেরফের কেন ? আর একটা কৌতুহলের সমাধান আমিনা আজো করে উঠতে পারেনি। সে হলো তার পরিচয়—তার বাবার অস্তিত্ব। জন্ম থেকে সে তার বাবাকে দেখতে পায়নি। কোথায় তিনি ? আর বাবার কথা উঠলেই সবাই মুখ চাপা দিয়ে যায় কেন ?

মা থাকে আপন মনে। কোন বাড়ীতে ঝির কাজ করে। ঘর সাফায়ের কাজ। নিত্যি নতুন বাড়ীতে। মণিবকে তার ভালো লাগলেও মণিবের গিন্নীকে তার পছন্দ হয় না। বডডো বাঁকা নজর মণিবের গিন্নীর। তাই রোজই চাকুরী খায়।

মা চাকুরী করেন কেন ? বাবা নেই বলে ? তাইতো, বাবা কোথায় ? বড়ো হয়ে একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলো তার বাবার অস্তিত্ব।

আমার বাবা কোথায় ? কৌতুহলী আমিনা তার মাকে প্রশ্ন করে।

আমিনার মা এই প্রশ্ন শুনে হেসেছিলেন। তারপর একটু উদাস কণ্ঠে রাস্তার পানে তাকিয়ে বললেন—ঐখানে।

মার জবাব কিন্তু আমিনার কাছে পরিস্কার হয়নি। বয়স বাড়বার পর এই প্রশ্নের জবাবে মা বললেন একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। কেন জানিনে, একটা লোককে ভারী ভালো লেগে গেলো। বয়স তখন আমার কতোই ব হবে ? পঁচিশ ছাব্বিশ। সব পুরুষকেই আমার ভারী ভালো লাগতো। কিন্ত এ লোকটাকে যেন একটু বেশী ভালো লাগলো। লোকটাও সেদিন আমার পানে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে ছিলো।

দুদিন বাদে আবার ঐ জায়গায় লোকটাকে দেখতে পেলাম। কী চায় তার আকাঙ্ক্ষা আমার অজ্ঞাত নয়। এক নয়নে আমি ওর পানে তাকিয়ে থাকি

রাস্তার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে আমার পানে। তারপর আর একদিন এলো। কিন্তু সেদিন দূরে নয়, সাহস করে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেদিনও আমাদের কথা বিনিময় হয়নি।

এমনি করে বেশ কয়েকটা দিন কাটলো। আলাপ-আলোচনা নেই। শুধু দৃষ্টি বিনিময় এই আর কী? কিন্তু একদিন আমার ইঙ্গিত পেয়ে লোকটার সাহস বেড়ে গেলো। আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ধরা দিলাম। কিন্তু সেদিনও আমাদের ভালোবাসার কোন ভাষা ছিলো না।

লোকটার ইতিবৃত্তান্ত জানবার আগ্রহ আমি প্রকাশ করিনি। পুরুষদের সম্বন্ধে চিরকালই আমার একটা কৌতুহল ছিলো। লোকটাকে কাছে পেয়ে আমার সেই কৌতুহল ভেঙ্গে গেলো।

ঘর বাঁধবার স্বপ্ন আমি কোনদিনই দেখিনি। আমি বেদুইনের মেয়ে, মরুপ্রান্তরের কন্যা। আমার মন যাযাবরের। আমার দৃষ্টি দিগন্তে বিহীন। আমার স্বপ্ন অসীম। আমি ঘুরতে ভালোবাসি। নীড় বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। তাই জীবনের উপর দিয়ে কী এলো গেলো, সে নিয়ে চিন্তা করিনি।

হয়তো ভাবনা করিনি বলেই আমার বিপদ ঘনিয়ে এলো। সমাজের আইন শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে একদিন লোকটার সঙ্গে আমি পথে বেরিয়ে এলাম। কোথায় যাবো জানিনে। অনিশ্চিত জীবন। সেদিন হুজুগের মাথায় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করিনি।

প্রথম কয়েকটা মাস ছিলো পায়রার জীবন। কতো সুখ, কতো শান্তি। তারপর যখন দেহের খিদে মিটে গেলো তখন দেখতে পেলাম, আমরা দুজনে পৃথক সংসারের জীব। প্রথমে ভেবেছিলাম যে তার জীবনের আমিই একমাত্র শয্যাসঙ্গিনী। না, পরে টের পেলাম, আমি হলাম তার বহু প্রেমিকার একজন। কিন্তু তবু মনে কোন দুঃখ ছিল না। এ জীবন তো আমিই বেছে নিয়েছি।

আমার কিন্তু ফেরবার কোন পথ ছিল না। এইটেই হলো মেয়েদের সবচাইতে বড় বিপত্তি। জীবনে একবার কলঙ্কের দাগ পড়লে সে চিহ্ন কখনই মুছে যায় না। কিন্তু পুরুষরা স্বাধীন। তাদের কাছে প্রেম, ভালোবাসা, হলো বিকিকিনির হাটবাজার। ভালো লাগল তো রাখল, নইলে আপদ বিদায় দিল।

তাই একদিন আমাকেও বিদায় নিতে হলো। কিন্তু যাবার আগে জানতে পারলাম অন্তঃসত্ত্বা।

তার পরবর্তী কাহিনী···তুমি আমিনা।

* * *

সেদিন মেয়ের কাছে জীবনের কলঙ্কের কাহিনী বলতে আমিনার মার

কোন লজ্জা হয়নি। আমিনাও তার মা'র জীবনের ইতিহাস শুনে কোন গ্লানি বোধ করেনি। আমিনা সেদিন বুঝতে পারেনি যে, ভালোবাসার জীবনে অনেক জুয়োচুরি হয়, অনেক প্রবঞ্চনা আছে। কিন্তু সেদিন তার মনে জাগেনি যে, জীবনের এই প্রহসনে, প্রবঞ্চনায়, তাকেও একদিন প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

সেদিন মার কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে বাবার প্রতি আমিনার একটা প্রবল ঘৃণা এসেছিলো। কিন্তু জীবনে যাকে দেখতে পায়নি তার কথা চিন্তা করে লাভ কী? ভেবেছিলো আর যাই হোক, নিজের জীবনে মার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবেনা।

কিশোরী আমিনা আরব বাজারের পথেঘাটে হেসেখেলে বেড়ায়। কচি বয়সে সে কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো যে, জীবনে সে একা নয়। অনেকে তার কাছে আসে, কথা বলে। এদের হাবভাব দেখে আমিনার মনে হয়, ওরা যেন কী বলতে চায়। কিন্তু বলেনা। এদের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এমনি করে কতো লোকের সংস্পর্শে এসেছে, তার হিসেব রাখেনি আমিনা। মনে ধরে রাখবার মতো কাউকে সে পায়নি। মার কাছে তো কতো লোক আসে, গল্প করে, কখনও কখনও তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মা কোথায় যান, এ জানবার আকাঙ্ক্ষা আমিনার হয়েছিলো। কিন্তু সাহস করে এ কথাটা মাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

হঠাৎ একদিন একটা লোক আমিনার নজরে পড়ে গেলো। মার কাছে যারা আসতো তাদের মধ্যে অল্পবয়সী একটা বিদেশী ছেলে ছিলো। প্রথমটায় তাকে আমিনার ভালো লাগেনি। কিন্তু প্রায়ই এসে তার কাছে মজার-মজার গল্প করতো। একদিন আমিনা টের পেলো যে, সে ছেলেটিকে ভালোবাসে।

ওদের এই প্রেমে মা কোন বাধা দেননি। বরং পরোক্ষে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমিনাকে সঙ্গে করে যখন সে বেরিয়ে যেতো, তখন মা কোন বাধা দেননি। মার প্রেমাস্পদের কোন অভাব ছিল না। সংখ্যা একজন বাড়া কমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মা বলেন, নারীর জীবনে পুরুষ অপরিহার্য। অতএব কন্যা আমিনা কার সঙ্গে এলো গেলো এই নিয়ে বিচার করে লাভ নেই।

কিন্তু বিচার করে দেখবার প্রয়োজন ছিলো আমিনার। ভালোবাসা নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে চায়না। প্রেমের হাটবাজারে দেহের বিকিকিনি তার পছন্দ নয়। সে চায় একজনাকে, বহুজনায় তার আকাঙ্ক্ষা নেই। একদিন তার মনের কথা উজাড় করে ছেলেটিকে বলেছিলো। ভেবেছিলো তার মনের কথা ছেলেটিকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু করেনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো তার কথা। তার কাছে ভালোবাসা, প্রেম হলো কবিদের

ভাবুকদের কল্পনা। রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ কঠিন নির্দয় সংসারের ভেতর যাদের জীবন কাটাতে হয়, কবির কল্পনা বা ভালোবাসার হিসেব নিকেশ করা তাদের চলেনা।

চুপ করে থাকে আমিনা। কোন জবাব দেয়না। দেবার সামর্থ্য তার ছিলো না। কারণ আজ সমাজের পথ থেকে সে বহুদূরে চলে এসেছে। আজ আর ফেরবার পথ নেই। এই সমস্যার সম্মুখীন একদিন তার মাকেও হতে হয়েছিলো। কিন্তু সেদিন পথে বেরিয়ে আসতে তার মার দ্বিধা হয়নি। আজ আমিনার সংকোচ কেন? এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায়নি আমিনা।

তবু আমিনা ভালোবাসার মীমাংসা একটা করতে চেয়েছিলো, এ মীমাংসার প্রয়োজন ছিলো তার। কারণ আমিনা অন্তঃসত্ত্বা। তার ভবিষ্যৎ সন্তানের একটা পরিচয় চাই। কিন্তু এ পরিচয় দিতে পারেন আমিনা। না পারার চাইতেও বড়ো দুঃখ ছিলো তার যে সে তার সন্তানকে বাঁচাতে পারেনি। আর পারেনি তার প্রেমাস্পদকে আঁকড়ে ধরে রাখতে। নিমেষের মধ্যে এই বিশাল পৃথিবীতে কে যে কোথায় মিলিয়ে গেলো তার হিসেব রাখতে পারেনি আমিনা।

এর পর একটা প্রতিহিংসা নিয়ে আমিনা আবার সমাজে ফিরে এলো। এ প্রতিহিংসা সমাজের উপর, মানুষের উপর, অতএব আজকের আমিনা নিষ্পাপ শিশু বালিকা নয়, আজ সে কঠোর সংসারের রমণী, ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবের বেলীডান্সার আমিনা

* * *

বাজছে ঘুঙুর, বাজছে মৃদঙ্গ আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল ফেলে নাচছে আমিনা। কয়েকদিনের মধ্যেই তার দেহলাবণ্য ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবের দর্শকদের মাঝে সাড়া তুলল। মৌমাছির ঝাঁকের মতো চারদিক থেকে লোভী যৌবনরসে বুভুক্ষু দর্শকরা ছুটে এলো। তার হাসি, তার চটুল কথা কতো শেখ আমিরকে অন্ধ করল হিসেব নেই। এলো উপহার, নিবেদন হলো প্রেম, কিন্তু কেউই আমিনাকে আকর্ষণ করল না।

এই লোভীর দল থেকে একদিন একজনকে বেছে নিল আমিনা। তরুণ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। বিবাহিত, তার সুখের সংসার। কিন্তু সে নাইট ক্লাবের নর্তকী আমিনার প্রেমে পড়লো। আমিনার দেহলাবণ্য, সৌন্দর্য, তার সুখের জীবনকে ভেঙেগ দিল। ঘর গেলো, সুখ গেলো তারপর এলো আর একজন তরুণ। তাকেও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সুখ শান্তি বিসর্জন দিতে হলো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবের দর্শকরা পতঙ্গের মতো ছুটে এসে আমিনার রূপের আগুনে দগ্ধ হলো।

সেদিন আমি ভেবেছিলাম আমিনা কুহকিনী। ভালোবাসা নিয়ে যে বেচা কেনা করে, তাকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনি। একদিন হেসে প্রশ্ন

করেছিলাম—ভালোবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কী আনন্দ ?

জবাবে আমিনা বলেছিলো—মালকানি, সংসারে তো ভালোবাসা নেই, আছে শুধু দেহ বিনিময়ের হিসেব নিকেশ। এই লেনদেনের ভেতর কে কী পেলো, কার জীবন বাঁচল, কে সুখী হল—এই নিয়ে আমি চিন্তা করিনা।

তারপর আর একদিন আমায় বলেছিলো আমিও জীবনে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম মালকানি। নিজেকে নয়, স্বামীকে নয়, নিজের সন্তানকে। যে সন্তান ছিলো আমার দেহের অংশ, আমার প্রাণ। জীবনে তাকেই যখন বিসর্জন দিলাম, তখন ভালোবাসা, প্রেমের বিচার আমি করিনা মালকানি।

কিন্তু এই যে অসংখ্য মানুষ আর তাদের সুখের জীবন তুমি ভেঙ্গে দিচ্ছো, এর জন্যে কী তোমার একটুও দুঃখ নেই আমিনা ?

কিন্তু যে মানুষ আমার জীবনকে ভেঙ্গে দিয়েছে তার কী শাস্তি হবে ?

একজনার জন্যে তুমি সংসারের সবাইকে শাস্তি দেবে ?

মালকানি, তোমরা পুরুষ। জীবনে নারী কী পেলো, কী পেলো না তার হিসেব তোমরা করোনা। ভালোবাসা তোমাদের কাছে ঠুংকো জিনিস। তাই তোমাদের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। তোমরা সবাই এক। ভালো পুরুষ খারাপ পুরুষ কোন পার্থক্য নেই।

আমিনা একটু হাসল।

আমিনার সে হাসি কোনদিন ভুলব না বিক্রমাদিত্য। সে হাসি বিদ্রূপের হাসি, পরিহাসের হাসি, তার অর্থ আমার কাছে অজ্ঞাত নয়। সে হাসি আজো কোন নারীর মুখে দেখলে আমি শিউরে উঠি।

* * *

এ নাটকের একদিন যবনিকা পতন হলো। রূপসী আমিনা, যে ছিলো আমার ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবের প্রধান আকর্ষণ, একদিন সে ক্লাব থেকে চিরতরের জন্যে বিদায় দিল। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম আমিনা আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু তবু আমিনার জীবনের ইতি যে এতো শিগ্‌গির ঘটবে, এ আমি প্রত্যাশা করিনি। ঘটনাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

আমিনার আত্মহত্যার কারণ আমি জানতাম বিক্রমাদিত্য! একটা রাতের কথা আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে। সবেমাত্র নাচের আসর শেষ হয়েছে। এমনি সময় আমিনা আমাকে ডেকে পাঠাল। বলল—মালকানি, বারের কাউণ্টারে দুজন বিদেশী বসে ড্রিংক করছে। ওর মধ্যে লম্বা যে ছেলেটি, তাকে একবার গ্রীনরুমে ডেকে আনতে পারো ?

গ্রীনরুমে ?—আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের সুর।

হ্যাঁ, এইখানে—আমিনা বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই জবাব দেয়।

নতুন শিকার বুঝি?—আমি আবার প্রশ্ন করি। আমার জানবার আগ্রহ অপরিসীম।

না পুরাতন। বহু পুরাতন। কিন্তু সেকথা বলার জন্যে তো তোমায় ডাকিনি। শুধু লোকটাকে ডেকে আনতে বলেছি—আমিনার কণ্ঠে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর ছিলো।

বারের কাউন্টারে গিয়ে লোকটাকে বললাম আমিনা ডাকছে! লোকটা বিদেশী, দেখলে মনে হয় ইংরেজ। আমার কথা শুনে একটুও বিস্ময় প্রকাশ করল না।

গ্রীনরুমে আমিনা প্রতীক্ষা করছিলো। লোকটাকে সঙ্গে করে ওখানে নিয়ে এলাম। আমিনার মেকআপ নেই। অতি সাধারণ চেহারা। আমিনাকে দেখে লোকটি একটুও সঙ্কোচ বোধ করল না।

আমিনা প্রশ্ন করে—আমাকে চিনতে পারো?

তুমি আমিনা—বেশ সহজ কণ্ঠেই লোকটা জবাব দেয়।

হ্যাঁ জন, আমিই আমিনা। ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবের বেলীডান্সার আমিনা নই, দামাস্কাসের আরব বাজারের কন্যা আমিনা, যার কাছে এসে একদিন তুমি ধর্ণা দিয়েছিলে।

আমি—আমার কথা বলছো?

প্রশ্ন এলো জনের কাছ থেকে। আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি, আমিনা ভুল করেনি। লোকটির নাম সত্যিই জন।

না, তোমায় চিনতে আমি ভুল করিনি জন। জীবনে অনেক ভুল করেছি। অনেক পুরুষ মানুষকে চিনতে পারিনি কিংবা চিনবার চেষ্টা করিনি, কিন্তু তোমায় চিনতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। মনে নেই জন, যেদিন তুমি দামাস্কাস ছেড়ে চলে গেলে, সেদিন আমি ছিলাম তোমার সন্তানের জননী? সেদিন তোমার কাছে আমার সন্তান বা আমি বড়ো ছিলাম না। বড়ো ছিলো তোমার সমাজ, তোমার খ্যাতি, যশ। সেদিনকার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলে অর্থ দিয়ে। কিন্তু আমি তোমার সে প্রস্তাবে রাজী হইনি।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো জন। জবাব দিল না। তারপর মৃদুকণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভাঙল। বলল অতীতের স্মৃতিকে রোমন্থন করে লাভ নেই। কী হয়ে গেছে সে নিয়ে আমি চিন্তা করিনা। আমি ভবিষ্যতের প্রত্যাশী।

এই বলে জন গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এলো। নিস্তব্ধ, হতবাক আমিনা তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

বারের কাউন্টারে জনের বন্ধু প্রতীক্ষা করছিলো। জনকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? একেবারে গ্রীনরুমে তলব হয়েছিলো? কিন্তু এখানে একবার গেলে অতো শিগগির তো কেউ ফিরে আসে না।

আমিনা, বেলীড্যান্সার আমিনা তলব করেছিলো।

ইউ মীন আমিনা! হোয়াট এ লাকী ম্যান ইউ আর! কিন্তু কী জন্যে?

বলো, আমি নাকি ওর স্বামী?

বিগ সারপ্রাইজ জন। রিয়েলি বিগ সারপ্রাইজ! তুমি, দি হাজব্যান্ড অব আমিনা—এযে একেবারে আরব্য উপন্যাস বলেই মনে হচ্ছে!

ইউ আর ম্যাড মাইডিয়ার। আমি হবো আমিনার স্বামী! সারপ্রাইজিং! —জন বন্ধুর মুখের উপর জবাব দেয়।

কিন্তু জন তুমি তো বহুদিন ধরেই এ অঞ্চলে বসবাস করছো। দামাস্কাসেও ছিলে। নাইটক্লাবের বহুজনার সঙ্গে তোমার পরিচয়। ডু উ মীন টু সে ইউ ডু নট নো আমিনা?

এবার জনের হাসবার পালা। একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করে বলল মঁশের, আমি জীবনে বহু মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারি কিন্তু বিয়ে করতে পারি একজনাকে।

হোয়াট এ ব্রুট ইউ আর! তোমার মনের ভেতর যে এ চিন্তাধারা আছে এ আমি এখনও কল্পনা করিনি—বন্ধু জবাব দেয়।

মাইডিয়ার, আমরা ইয়োরপীয়ান। আমরা হলাম দি চিলড্রেন অব হেলাস—অর্থাৎ গ্রীক সভ্যতার প্রতীক। হাজার হোক আমাদের একটা সম্মান আছে, প্রতিপত্তি আছে। একটা বাজারের মেয়েকে ঘরে তুলে তো আর মান সম্মান ঘুচাতে পারি না। ওদের নিয়ে বারের কাউন্টারে বসা যায় কিন্তু নিজের গৃহের ডাইনিং টেবিলে এনে ওদের বসানো ইমপসিবল। কাম অন, এ নিয়ে অনর্থক চিন্তা করে লাভ নেই। লেট আস হ্যাভ এ্যানাদার ড্রিংক এ্যান্ড ফরগেট অল এ্যাবাউট ইট।

কাউন্টারের আড়াল থেকে দুই বন্ধুর আলোচনা আমি শুনছিলাম। ওদের আলাপ আলোচনা শুনে মনে হলো, মানুষ চিনতে আমিনা ভুল করেনি।

* * *

আমিনার আত্মহত্যার কী কারণ হয়তো এর পরে আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।

মালকানি তার কাহিনী শেষ করল।

* * *

আমার গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক জীবন গোল্ড-স্মাগলিং আর সুখদুঃখের কাহিনী নিয়ে আমার গল্প সুরু করেছিলাম। কিন্তু নাইটক্লাবের বিচিত্র কাহিনী আর বেলীড্যান্সার আমিনার রোমান্সের ভেতর আমার গল্পের সূত্র হারিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আপনাদের মিশরের নেতা গামাল আব্দুল নাসরের কথা বলবো কিংবা শোনাবো রাজনৈতিক নেতা মিশেল আফ্লাকের জীবনী। বাগদাদের অন্তর্বিপ্লবের কিংবা জর্দনের রাজনৈতিক ঘনঘটা

নিয়ে এই উপন্যাস রচনা করতে পারতাম। কিন্তু সে কথা আপনাদের বলা হলো কৈ? সৌদী আরবিয়ার হারেমের কাহিনী কিংবা মেয়ে বিকিকিনির গল্প হয়তো উত্তেজনা আছে কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য নেই। তাই আমার এই গল্পের গতি ঘোরাতে হবে। কিন্তু অন্য কাহিনীর অবতারণা করার আগে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন। দীর্ঘ কাহিনী বলে আপনাদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনা। অতি সংক্ষেপেই আমার এই কথা শেষ করবো।

সমালোচকরা হয়তো প্রশ্ন করবেন—রোমান্সের সঙ্গে ইতিহাসের কী সংযোগ? যোগাযোগ কিছুটা আছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের ভেতরই রোমান্সের গল্প পাওয়া যাবে। তাই কোন কাহিনী বলার আগে ঐতিহাসিক কাহিনী অবতারণা করতে হবে আর সেই ইতিহাসের কাঠামোর উপর সৃষ্টি করতে হবে রোমান্স। অতএব লায়লাকে নিয়ে আমার সেই ইতিহাস রচনা করবো।

আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অসংখ্য তরুণ-তরুণী আছেন যারা আমার লায়লার এ কাহিনী পড়ে তাদের সহানুভূতি জানাবেন। হয়তো তারা আমার মনের কথা বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন যে, একটা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলের জীবনে যদি কোন সুন্দরী রমণী এসে দাঁড়ায় তখন সে তার জীবনের গতি হারিয়ে ফেলে। বয়স্কদের কাছে রমণীর সৌন্দর্য হলো দর্শন, কিন্তু তরুণদের কাছে নারীর সৌন্দর্য হলো কাব্য। একটা দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। লায়লাকে সঙ্গে নিয়ে বালবেকের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মালকানি ছিলো সেইখানে। সে বলল—ঐ যে জুপিটারের মন্দির দেখছেন বিক্রমাদিত্য, অতীতে ঐটে ছিলো পুজোর বেদী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে সবাই ঐখানে আসতো। এখানে পুজো দিয়ে সবাই যেতো বাকুর মন্দিরে। সুরার দেবতা বাকু। এইখানে এসে সবাই মদ্যপান করতো। একটু দূরে পাবেন ভিনাসের মন্দির। প্রেমের দেবতা, ভালবাসার প্রতীক। গ্রীকরা বলতো আফ্রোদিতের মন্দির। এই মন্দিরের কাছে এসে নারী ধরা দিতো পুরুষের কাছে।

লায়লার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে আমি যেন ভিনাসের মন্দিরে এসেছি। কিন্তু কই আমি তো জুপিটারের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিইনি বা বাকুর মন্দিরে গিয়ে সুরা পান করিনি। তবে আমি কী করে ভিনাসের মন্দিরে এসে লায়লার সৌন্দর্য সুধা পান করলাম?

বালবেকের ভ্রমণের পর আমি যেন লায়লাকে আরো নিকটে পেয়েছি কীসের আকর্ষণে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম জানিনা। আমার মনে আছে, আমি যখন বালবেকে গিয়েছিলাম তখন আমার মনের ভেতর একটা সম্পূর্ণতা ছিলো। সেদিন ব্যাবিলন, আসিরিয়ান, হিতাইত বা সুমেরিয়ানের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ

আমার মনের ভেতর কোন রেখাপাত করেনি। কিন্তু তারপর একদিন লায়লাকে সঙ্গে নিয়ে সিডনে গিয়েছিলাম। সমুদ্র ধরে একমুখী রাস্তা গিয়েছে। গভীর স্রোতের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। এককালে সিডন ছিলো জেলেদের বন্দর। সবাই এখানে এসে মাছ ধরতো। আজও সবাই তাই করে। জাল নিয়ে সবাই সমুদ্র ঘুরে বেড়ায়। বন্দরের একপ্রান্তে ক্রুসেডার ক্যাসেল অতীতের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সিডনের প্রাচীন ঐতিহাসিক জঞ্জাল আজ বেরুতের মিউজিয়ামে স্তুপীকৃত হয়ে আছে। কিন্তু তবু এই ঐশ্বর্য্যবিহীন সিডন আমার চোখে ভালো লেগেছিলো। সিডনকে আমি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছিলাম।

সিডনের একটু দূরে ইসরাইলের প্রান্ত। আমার মনে আছে সিডনের বুকে দাঁড়িয়ে লায়লা আমাকে বলেছিলো: জানো বিক্রমাদিত্য, সামনে ইসরাইল। কতোটুকুই বা দূরত্ব, কিন্তু এই দুই বন্দরের অধিবাসীদের মনের আদানপ্রদানের ব্যবধান অনেকটা। এই প্রান্তে যেমনি সূর্য ওঠে, তেমনি আলোয় ঝলমল করে ইসরাইল। এ প্রান্তের বাতাস বয়ে যায় ও প্রান্তে। কিন্তু জীবনের কী বিচিত্র পরিহাস! এই দুই নগরীর মধ্যে রয়েছে ভালোবাসার দুর্ভিক্ষ, মনের আদান-প্রদান নেই। কিন্তু কে এর জন্যে দায়ী? মধ্যপ্রাচ্যের যেখানেই যাওনা কেন, শুনতে পাবে এই ঝগড়া বিবাদের কথা। ঐ ইসরাইল, এককালে এই জায়গা ছিলো আরবদের বসতবাটী। তারপর একদিন তাদের জীবন বানচাল হয়ে গেলো। নিজের পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে হাজার হাজার লোক এলো এই আরব প্রান্তে। এই নিয়ে ঝগড়ার অন্ত নেই। আজ অবধি এই সমস্যার সমাধান হয়নি। ঘর হারিয়েছে যারা, আজো তারা পরবাসী হয়ে আছে।

সেদিন আমি লায়লার কথার কোন জবাব দিতে পারিনি। জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পাইনি। শরণার্থীদের দুঃখের কথা আমি জানি। শুধু আমি নই, আপনারা যারা আমার এই কাহিনী পড়ছেন, তাদের কাছেও নিজের ভিটে-মাটি ছেড়ে আসার বেদনা কী করুণ, তার পুনরুক্তি করার প্রয়োজন নেই।

লায়লা আমাকে প্রশ্ন করেছিলো—এই ঝগড়া, বিবাদ, কলহ কেন বলতে পারো? সংক্ষিপ্ত জীবনের কয়েকটা বছর কী আমরা সুখে কাটাতে পারিনে? এই মধ্যপ্রাচ্য ছিলো সুখের রাজ্য, হারুণ অল-রশীদের ইন্দ্রপুরী কিন্তু আজ?

কিন্তু আজ...। লায়লার এই দুটো কথা আজো আমার মনে গেঁথে আছে। জীবনে বহুবার ভেবেছি আজ কী হয়েছে এই মধ্যপ্রাচ্যের। কিন্তু এই প্রান্তের কাহিনী তো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নয়, যে আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো বলে গল্পের ইতি টানবো। এই কাহিনীর আভাষ দিতে হলে আপনাদের কাছে বিগত দিনের রাজা-রাজড়াদের কাসুন্দী ঘাটতে হবে।

আমি নাচার। এই ইতিহাসের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের দিতেই হবে। নইলে আরব বেদুইনের গল্প আমার শেষ হবে না।

শুনুন, আমার সেই কাহিনী।

* * *

মরুভূমির রাজ্য মধ্যপ্রাচ্য

দূর-দিগন্তব্যাপী. যতোদূরে দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি। বালির দেশ কিন্তু তবু এ হলো সোনার মরুভূমি। আর এই মরুভূমি নিয়েই হানাহানি। কারণ এই বালির নীচে আছে তেল।

ইসলাম ধর্মের জয়ধ্বজা যেদিন এই মরুভূমিতে উড়লো সেদিন পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে গেলো। হজরত মুহম্মদ মারা গেলেন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র রাজ্য হলো বিশাল। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি উঠলো ইসলামের জয়গান। নতুন নতুন খলিফা সিংহাসনে বসলেন। তাদের প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

শত বছর কেটে গেলো। হারুণ-অল-রশীদের ইন্দ্রপুরীর প্রভাব দিন দিন কমতে লাগলো। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই প্রান্তের শাসক হলেন তুর্ক দেশের সম্রাট।

কিন্তু তাদের প্রভাবও বেশীদিন কায়েমী রইলো না। লোভী ইংরেজ, ফরাসী, জার্মানরা তাদের প্রভাব বিস্তার করার জন্যে এই মরুভূমি প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোটা সুদে সবাইকে টাকা ধার দিচ্ছে আর মৌকা পেলেই হরেক রকমের সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে।

সবার দৃষ্টি মধ্যপ্রাচ্যের উপর। তাই লোভীর দল সদা সর্বদাই ভাবছে কী করে এই অঞ্চলে কায়েমী হয়ে বসা যায়। ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, সবাই চড়া সুদে তুর্ক দেশের শাসন কর্তাদের টাকা ধার দিল। দিন যায় ধারের অঙ্ক বাড়ে। আসল টাকা শোধ করাতো দূরের কথা, সুদ শোধ করতে গিয়ে তুর্ক সরকার হিমসিম খায়। তাই বিদেশী কর্তারা সুদের পরিবর্তে চাইলেন ব্যবসায়ের সুবিধে। সবাই মিলে এই সুবিধে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেন। লাভের বেশী অংশই গেলো ইংরেজের হাতে। বাকী অংশীদার জার্মান আর ফরাসী।

এমন সময় খবর পাওয়া গেলো যে, মধ্যপ্রাচ্য শুধু মরুভূমির রাজ্য নয়, এ হলো তেলের সমুদ্র।

আর বিংশ শতাব্দীতে এই তেল হলো মানুষের জীবন। তেল ছাড়া আজকাল কিছুই করবার যো নেই।

প্রথমে এই তেলের সন্ধানে এলেন জার্মান। তারপর ইংরেজ ফরাসী। নিজেদের মধ্যে একটা রফা হলো। ঠিক হলো কার ভাগ কতোটা হবে।

কিন্তু এই হিসেব নিকেশের মধ্যে একটা ত্রুটী রয়ে গেলো। ইয়োরোপে

তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সানাই বাজছে। ইংরেজ আর জার্মান হাতিয়ার নিয়ে হানাহানি করছে। তাই তেলের ভাগ বাঁটোয়ারা থেকে জার্মান সরকারকে বিদায় নিতে হলো। তাদের ভাগ মিললো ফরাসী সরকারের। লড়াই বাদে এই ভাগ-বাঁটোয়ারার ভাগীদার হয়ে এলেন মার্কিন দেশের ব্যবসায়ীরা।

কিন্তু লড়াই শেষে এ অঞ্চলের প্রাধান্যের অদলবদল হলো। এবার এ মহল্লায় নতুন মনিব হয়ে এলেন মার্কিন সরকার। এদের শুধু টাকার গর্ব নয়, সামরিক দাপটও আছে। মার্কিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ সরকারও তৎপর হয়ে আছেন। সুবিধে পেলেই ওরা এ অঞ্চলে তাদের কদম ফেলবেন।

ভাগ বাঁটোয়ারা প্রথমটা হলো তেল নিয়ে। ঐশ্বর্যের কিছুটা হিস্যা এবার আমেরিকানদের দিতে হলো। হৈ-চৈ করে তেলের বাবসা করতে এলেন স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী, টেক্সাস অয়েল কর্পোরেশন আর গালফ অয়েল কোম্পানী।

ঐদিকে সৌদী আরবিয়ার বিশাল তেলের সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে বসলেন আরমাকো কোম্পানী।

কিন্তু তেলের ব্যবসায়ে কায়েমী হয়ে বসতে হলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং প্রসারের প্রয়োজন। এই সব কাজে সাহায্য করতে এবার পাদ্রীদের আমদানী করা হলো। ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তেলের মুনাফা বাড়ল।

জীবনের গতি চিরকালই এক ছন্দে বয়ে যায় না। বিদেশী প্রভাব যখন মধ্যপ্রাচ্যে বাড়তে লাগলো তখন থেকেই দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। তারা বুঝতে পারল দেশের সম্পদ কোথায় যাচ্ছে। তাই একদল বিদ্রোহী তাদের প্রতিবাদ জানাল। এই সংগ্রামের, এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হলেন নাসিফ ইয়াজি আর তার বন্ধু বুস্তানি। আরবদের জাগরণের সংগে সংগে আর এক শক্তির অভ্যুদয় হলো। তারা হলো ইহুদী। প্যালেস্টাইন তাদের আবাস। ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে আছে। এবার তারা প্যালেস্টাইনে ফিরে আসতে লাগলো।

এদিকে বিদেশী ব্যক্তিরা কিন্তু চুপ করে বসে নেই। ফিকিরে আছে কী করে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে কায়েমী হয়ে বসা যায়। ক্ষমতা প্রসারের নেতা হলেন টি ই লরেন্স আর গ্লাব পাশা।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ইংরেজ আর তুরস্কের মধ্যে মিতালি নেই। এই শত্রুতার সুযোগ নিল মক্কার নেতা আমীর আবদুল্লা তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল আমীর আবদুল্লা। ইংরেজের সাহায্য চাওয়া হলো। চতুর ইংরেজ সরকার ইতঃস্তত প্রকাশ করল। কিন্তু লড়াইয়ের দিন যতোই কাটতে লাগলো, ইংরেজ তুরস্ক সরকারের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করল। তুরস্ক সরকারও বসে নেই। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। এই

ধর্মযুদ্ধের সমর্থন চাওয়া হলো মক্কার শেরিফের কাছে।

তুরস্ক সরকারের মনোভাব ইংরেজকে বিচলিত করল। তাদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্যে তারা উঠে পড়ে লাগল। ইতিমধ্যে আরব জাতীয়তাবাদীরা আরো সংঘবদ্ধ হল। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ ফরাসীদের ক্ষমতা আরো বেড়েছে। সিরিয়ার বেশ খানিকটা অংশ ফরাসীদের অধীনে চলে এসেছে, ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনও ইংরেজদের অধীনে চলে এল।

১৯১৮ নভেম্বর মাস। বৈঠক বসেছে তুরস্কের উপনিবেশগুলোর ভবিষ্যত নিয়ে বিচার করার জন্যে। কিন্তু ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে মতানৈক্যের জন্যে কোন প্রস্তাবই কার্যকরী হয়নি। সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এবার নিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন। তাঁর দুই প্রতিনিধি কিং এবং ক্রেন মধ্যপ্রাচ্যে এলেন। কিন্তু কিং এবং ক্রেনের প্রস্তাবও ইংরেজ ও ফরাসী সরকার মেনে নিতে পারেননি। আপত্তির প্রধান কারণ কিং এবং ক্রেন প্যালেস্টাইনের এবং সিরিয়ার শাসনভার তাদের হাতে তুলে দিতে রাজী হননি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার গণ্যমান্য বাসিন্দাদের এক বৈঠক বসলো। এই বৈঠকে ঠিক হলো সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের শাসনভার রাজা ফৈসালাকে দেওয়া হোক। এ প্রস্তাবের বিরোধিতা এলো ইংরেজ এবং ফরাসীদের কাছ থেকে। লাঁরেমোর এক বৈঠকে ইংরেজ এবং ফরাসী, এই দুই দেশের শাসনতন্ত্র ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেন।

তারপর দু'বছর বাদে জুলাই মাসে লীগ অব নেশান্সের বৈঠক বসেছে। ওই বৈঠকের প্রধান আলোচনার বিষয় হলো সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন। লাঁরেমোর কনফারেন্সে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো, এবার সেইটেকে আরো কায়েমী করা হলো। পাকাপোক্তভাবে সিরিয়া আর প্যালেস্টাইনের শাসনভার ফরাসী আর ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। আরো ঠিক হলো যে, প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কী করা হবে সেইটে বিচার করবে ইংরেজ সরকার। শুধু তাই নয়, প্যালেস্টাইন হলো ইহুদীদের দেশ। অবশ্য বলা হলো যে, ঐ প্রান্তে আরবদের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। ট্রান্সজর্ডন নিয়ে এক নতুন দেশ গঠন করা হলো।

তুর্কদেশে ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে। রাজত্ব হারিয়েছেন খলিফা। শাসনতন্ত্রের নতুন মনিব মুস্তাফা কামাল পাশা। দেশের কাঠামোর বহু অদলবদল করা হলো। শুধু তুর্কদেশে নয়, মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হলো। পারস্যের সম্রাট রিজাশাহ। তিনিও মুস্তাফা কামাল পাশার অনুকরণ করলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার জন্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তেহরাণে তুর্ক, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থানের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তিতে বলা হলো, বৈদেশিক ব্যাপারে একে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করবে, একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে না, সীমান্ত লঙ্ঘন

করবেনা। এই চুক্তির মেয়াদ হলো পাঁচ বছর।

এই চুক্তির প্রারম্ভে তুর্ক এবং পারস্য দেশের সীমান্ত রেখা সমাধান নিয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এর আগে তুর্ক দেশ বিভিন্ন বল্কান শক্তি গ্রীস, রুমানিয়া এবং যুগশ্লোভিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলো।

এইসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন আরব দেশের ভেতর কোন মিতালি ছিলোনা। তার কারণ রাজায় রাজায় মতভেদ। সৌদী আরবিয়ার সম্রাট ইবন সৌদ। তিনি হলেন জর্ডন সম্রাটের ঘোরতর শত্রু। তাই লীগ অব নেশান্সের নির্দেশানুযায়ী আরব দেশ ভাগাভাগির পর আরব জাতীয়তবাদী নেতারা প্যান আরব কংগ্রেস বৈঠকে একত্রিত হলেন। এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বিভিন্ন আরব দেশের নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং আরব দেশকে একত্র করা। প্যালেস্টাইনের সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে এবং সমস্ত জাতীয়তাবাদী আরব নেতারা ইহুদীদের আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তাদের নেতৃত্বে ১৯৩৬ প্যালেস্টাইনের আরবরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু আরব সম্রাটের দরুণ চিরস্থায়ী হয়নি। ১৯৩৭ জেরুজালেমের মুফতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে লেবাননে আস্তানা গাড়লেন এবং প্যালেস্টাইনের আরব-আন্দোলন পরিচালনা করলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের এক বৈঠকে আরব দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যে সিরিয়ায় ফরাসী শাসন এবং মিশরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হলো। তারপর এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঢেউ। মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির লড়াইর প্রধান ঘাঁটি হলো কায়রো। জাতীয়তাবাদী নেতারা তাদের সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তুললেন। আরব একতা সংগ্রাম শক্তিশালী হলো।

রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দেখে ইংরেজ এবং স্বাধীন ফরাসী সরকার ঘোষণা করলেন যে, সিরিয়া এবং লেবাননের স্বাধীনতা শিগ্‌গীরই দেওয়া হবে। কিন্তু তবুও বিভিন্ন আরব দেশের মধ্যে মিতালির কোন সম্ভাবনা দেখা গেলনা। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরী পাশা সৈয়দ, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডনকে নিয়ে এক নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব করলেন। বলা হলো যে, নুরী পাশা সৈয়দের প্রস্তাব কার্যকরী হলে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হবে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন এবং সৌদী আরবিয়া এবং ইরাক সরকারের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হলো।

এই বৈঠকে সর্বপ্রথম আরব লীগের প্রতিষ্ঠা হলো।

*　　　　*　　　　*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও সুরু হয়নি। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, দূরপ্রাচ্যে, ভারতবর্ষে, সর্বত্রই ইংরেজের জয়জয়কার। এই মরুভূমির বুক কেটে তৈরী হয়েছে সুয়েজ ক্যানেল। এই ক্যানেলের ভিতর দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যায়

ইংরেজের নৌবহর। আর শুধু কী তাই। বালির দেশ মধ্যপ্রাচ্য। বেদুইন তার নাগরিক। এই অঞ্চলের সবচাইতে বড়ো সম্পদ হলো তেল।

মধ্যপ্রাচ্যে তেলের রঙ্গীন ইতিহাস হল এক রূপকথা—সহস্র রজনীর কাহিনীর চাইতে চিত্তাকর্ষক গল্প। এই রূপকথার সব কিছু আজ বলা সম্ভব নয়, তবু দু একটা কথা বলা আবশ্যক। এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক তেলের বাদশার জীবনী; নাম মিস্টার ফাইভ পার্সেন্ট। আজকের ব্যবসার দুনিয়ায় মিস্টার ফাইভ পার্সেন্টের নাম করলেই দেখিয়ে দেবে ধূর্ত এক শয়তানকে যার আসল নাম হল কালুস্ট গুলবেনিয়ান, জাতে আর্মেনিয়ান। বলা যায় মধ্যপ্রাচ্য তেলের ইতিহাস তিনিই রচনা করেছেন এই মিস্টার ফাইভ পার্সেন্ট।

কেন তার এই নাম হল?

বিচিত্র তার চরিত্র, আকর্ষণীয় রঙ্গীন জীবন। ছাত্রজীবনে তিনি তার বন্ধুদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না। তার শৈশব জীবন অন্য ধাঁচে তৈরি হয়েছিল।

বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবার পরিবর্তে তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ের লেনদেনের হিসেবের গল্প শুনতেন। বাজারে এই ব্যবসার গল্প; ডিল ছিল প্রথম জীবনের শখ, স্বপ্ন এবং পেশা।

অতি অল্প বয়েসে তিনি 'রাশিয়ান তেল' নিয়ে প্রবন্ধ লিখে বেশ নাম কিনে-ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র একুশ। লোকের কাছে তিনি হলেন তেলের এক্সপার্ট। তুর্কীর সুলতান তাকে মেসোপটেমিয়া বর্তমান ইরাকে তেলের অনুসন্ধান করতে বললেন। তিনি এ কাজ করবার জন্যে মেসোপটেমিয়ায় গেলেন না। ঐ সময়ে জর্মানদের তদারকে মেসোপটেমিয়ায় রেলোয়ে লাইন বসান হচ্ছিল। তিনি ঐ রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, এবং কিছু প্রবন্ধ পড়ে এই রিপোর্ট লিখলেন। বললেন মেসোপটেমিয়ায় তেল পাবার সম্ভাবনা আছে। তুর্কীর সরকারি কর্মচারিরা তার এই রিপোর্ট বিশ্বাস করলেন। সেই, থেকে কালুস্ট গুলবেনিয়ান হলেন মেসোপটেমিয়া তেলের এক্সপার্ট।

তেলের বিচিত্র ব্যবসা, কায়দাকানুনের সব কলা কৌশলই তিনি ভাল করে শিখেছিলেন। তিনি জানতেন কী করে তেলের ব্যবসা করতে হয়, ডিল করতে হয়। তারপর ঐ কাজ করবার সময় জাল, ষড়যন্ত্র করা, বখশিষ দে'য়া, কী করে খবর সংগ্রহ করে কাজে ব্যবহার করা সবকিছুই তিনি শিখেছিলেন। আলাপ আলোচনার আর্টও তার ভাল করে জানা ছিল। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন, দূরদর্শী ছিলেন। যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে ধীর স্থির শান্ত থাকা ছিল তার চরিত্রের এক বিশেষত্ব। তার চরিত্র সম্বন্ধে একটি আরব প্রবাদ ব্যবহার করা হত। "কোন সুন্দরী রূপসীর জীবন যদি ধ্বংস করতে চাও, তাহলে তাকে চুমু খাও।" গুলবেনিয়ান জানতেন বন্ধুত্ব করে শত্রুর গলায় কী করে ছুরি বসাতে হয়।

গুলবেনিয়ান জীবনে কাউকে বিশ্বাস করেননি। নিজের পিতামহের জন্যে তিনি দুজন চিকিৎসক নিয়োগ করেছিলেন। এক চিকিৎসক অন্য চিকিৎসকের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখত। কাউকে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে তিনি তার পেছনে স্পাই লাগাতেন।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড ফ্রান্সের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যর দেশগুলি নিয়ে ভাগাভাগি শুরু হল। এই সময়ে উভয় দেশের প্রধান চিন্তা ছিল তেল রাজনীতি। উভয় দেশ শুনেছিল যে মেসোপটেমিয়ায় তেল পাবার সম্ভাবনা আছে।

যুদ্ধের পর তুর্কী সাম্রাজ্যকে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড ভাগবাটোয়ারা ক'রে নিল। ইংল্যান্ড পেল মেসোপটেমিয়া এবং ফ্রান্সের হিস্যায় পড়ল মুসল শহর।

একদিন এই দেশ ভাগ নিয়ে কথাবার্তা বলতে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্স ইংল্যান্ডে এলেন। ক্লেমেন্স লয়েড জর্জকে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কী চান?

আপনি মুসল শহর ছেড়ে দিন। এর পরিবর্তে আমি সিরিয়ার উপর কোন দাবি করব না।

আমি রাজি, তবে মুসল শহরের তেলের উৎপাদনের একটা অংশ আমাদের দিতে হবে।

লয়েড জর্জ রাজি হলেন।

দুই প্রধানমন্ত্রীর এই আলাপ আলোচনার কথা আর কাউকে বলা হলনা।

যুদ্ধের আগে তেল নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে লড়াই বিবাদ শুরু হয়েছিল। কারণ বাজারে খবর ছিল মেসোপটেমিয়ায় তেল আছে। এদিকে তুর্কীর সুলতানের অর্থের ভান্ডার ছিল শূন্য। ঐ সময়ে জর্মানীর দয়েচে ব্যাঙ্ক টাকা দিয়ে সুলতানের কাছ থেকে মেসোপটেমিয়ায় তেলের কনসেশন কিনে নিয়েছিল। কারণ জর্মানী মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছিল। দয়েচে ব্যাঙ্কের বিরোধী শেয়ার হোল্ডার ছিল এ্যাংলো পারশিয়ান অয়েল কোম্পানী। এই কোম্পানীর পেছনে ছিল বৃটিশ সরকার।

১৯১২ সালে দয়েচে ব্যাঙ্ক এই তেলের কনসেশন টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর হাতে তুলে দিল।

টার্কিশ অয়েল কোম্পানীতে দয়েচে ব্যাঙ্ক এবং রয়াল ডাচ কোম্পানীর পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ার ছিল। আর কোম্পানীর বড় শেয়ার হোল্ডার ছিল টার্কিশ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এই টার্কিশ ন্যাশনাল কোম্পানী ছিল এক বৃটিশ কোম্পানীর অধীনে। কিন্তু এই দাবা খেলায় আর একজন খেলোয়ার ছিলেন যার নাম ছিল কালুস্ট গুলবেনিয়ান। জানা গেল গুলবেনিয়ানের চেষ্টায় টার্কিশ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক টার্কিশ অয়েল কোম্পানীর মেজরিটি শেয়ার কিনে নিয়েছিল। কারণ টার্কিশ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গুলবেনিয়ানের ত্রিশ পার্সেন্ট শেয়ার

ছিল। গুলবেনকিয়ানের টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীতে শেয়ারের অংশ ছিল ত্রিশ পার্সেন্ট। যুদ্ধের পর গুলবেনকিয়ান টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী কিনে নিয়েছিলেন।

১৯১২ সাল থেকে, টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী কাজ শুরু করল। বৃটিশ সরকার এবার চেষ্টা করল টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী এবং এ্যাংলো পারসিয়ান সিন্ডিকেটের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলবার দুটো কোম্পানীকে এক করবার চেষ্টা করা হল। অনেক আলোচনার পর প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বৃটিশ এবং জার্মান সরকার দুটো কোম্পানীকে এক করল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নতুন কোম্পানীতে এ্যাংলো পারসিয়ান অয়েল কোম্পানীর শেয়ার হল পঞ্চাশ পার্সেন্ট। 'দয়েচে ব্যাঙ্ক' এবং ডাচ শেয়ার কোম্পানীর শেয়ার হল, প্রত্যেকে পঁচিশপার্সেন্ট। এবার প্রশ্ন হল গুলবেনকিয়ানের শেয়ার কত হবে। এ্যাংলো পারসিয়ান এবং রয়াল ডাচ শেল, তাদের শেয়ার থেকে আড়াই পার্সেন্ট শেয়ার গুলবেনিয়ানকে দিল। অর্থাৎ তার মোট শেয়ার হল ফাইভ পার্সেন্ট'। এই ফাইভ 'পার্সেন্ট' শেয়ার থেকে গুলবেনকিয়ানের নতুন নাম হল 'মিস্টার ফাইভ পার্সেন্ট'।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করল লড়াই করবার জন্যে কয়লার মতো তেল ও আবশ্যকীয়। অতএব মেসোপটেমিয়ার তেল উৎপাদনের কথা নিয়ে আবার চিন্তা ভাবনা শুরু হল। কারণ মিত্র শক্তির মধ্যপ্রাচ্যের তেলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বৃটিশ বিদেশ সচিব বালফুর স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় বললেন : মেসোপটেমিয়ার তেল আমাদের চাই-ই, চাই।

ইতিমধ্যে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মেসোপটেমিয়া দখল করে নিয়েছিল। লড়াইর সময় ফরাসি সরকারও তেলের প্রয়োজনীয়তা এবং আবশ্যকীয়তা উপলব্ধি করেছিল। ঐ সময়ে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্স ফ্রান্সের জন্যে তেল আবশ্যক বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বলেছিলেন ফ্রান্সের তেলের দরকার হলে তেল 'মুদিখানা' থেকে কিনবে।' 'মুদিখানা' বলতে ক্লেমেন্স বৃটিশ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

ঠিক হল লয়েড জর্জ এবং ক্লেমেন্সের মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স শুধু সিরিয়া শাসনের অধিকার পাবে না, মসুলের তেলেরও কিছুটা অংশ ফ্রান্স পাবে। কিন্তু পরে উভয় নেতাই অস্বীকার করলেন তারা মসুল—সিরিয়া নিয়ে কোন মৌখিক চুক্তি করেছেন।

অনেক তর্ক বিতর্ক আলোচনার পর মসুলের তেলের শেয়ার নিয়ে একটা চুক্তি হল। এই চুক্তি সাঁরেমোর চুক্তি নামে পরিচিত। স্থির হল ফ্রান্স মেসোপটেমিয়া থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট তেল পাবে। অর্থাৎ 'দয়েচে ব্যাঙ্কের' টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর শেয়ার ফ্রান্সকে দেওয়া হল। অবশ্য, ইংল্যান্ডের এবং ডাচ শেলের শেয়ারের অংশের কোন পরিবর্তন করা হল না। কিন্তু

সবার মনে একটা প্রশ্ন জাগল আদৌ মেসোপটেমিয়াতে কোন তেল আছে কিনা ?

*　　　　*　　　　*

মধ্যপ্রাচ্যর তেল নিয়ে যখন ইংল্যান্ড ফ্রান্সের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছিল তখন আমেরিকা এই ব্যাপারে সজাগ হল। মধ্যপ্রাচ্যর তেলের প্রয়োজন তাদেরও ছিল। বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ার তেল। কারণ আমেরিকার সরকার তাদের দেশের তেলের ভান্ডার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত ছিল। একদিন আমেরিকার স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর দুই জিওলজিস্ট বাগদাদে পেঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার তাদের পুলিশের হাতে তুলে দিল।

সাঁরেমোর চুক্তি আমেরিকার সাংবাদিক মহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। বলা হল সাঁরেমার চুক্তি হল সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন। এব্যাপারে আমেরিকার রাগবার কারণ ছিল। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের চুক্তির একটি শর্ত ছিল ভাগ বাটোয়ারা তিন শরীকের মধ্যে সমান অংশে করা হবে। আমেরিকার বক্তব্য ছিল ইংরেজ ফ্রান্স সাঁরেমোর চুক্তি করে আমেরিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

যখন মসুলের তেল নিয়ে ইংরেজ আমেরিকার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেশ দানা পাকিয়ে উঠছিল তখন হঠাৎ একদিন বৃটিশ সরকার গলার সুর নরম করল। কারণ তারা খতিয়ে দেখতে পেল যে টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীতে তাদের দাবি সত্ত্ব খুব শক্ত, পাকা নয়। কারণ ১৯১৪সালে তাদের অর্থাৎ টার্কিশ পেট্রোলিয়ামকে মসুলের তেল উৎপাদনের অধিকার আগেই লিখিতভাবে দেওয়া হয়নি শুধু অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অধিকার দেওয়া এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য ছিল। এছাড়া আমেরিকায় ইংরেজ বিদ্বেষী প্রচার প্রোপাগান্ডাকে বন্ধ করা আবশ্যক ছিল। বৃটিশ সরকার বুঝতে পারল মেসোপটেমিয়ায় তেল উৎপাদনের কাজে আমেরিকার সাহায্য না নিলে ভবিষ্যৎ বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে। মেসোপটেমিয়া তেল উৎপাদনে যে খরচপত্র হচ্ছে সেই ব্যয়কে কমাবার জন্যে আমেরিকার সাহায্য নেবার দরকার ছিল।

বৃটিশ সরকার এবং ডাচ শেল কোম্পানী গুলবেনিয়ানকে চিঠি লিখে অনুরোধ করল আমাদের নতুন কোম্পানীতে আমেরিকানদের সাহায্য চাই। আপনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এবার আমেরিকানদের প্রশ্ন হল তারা কোন আমেরিকান অয়েল কোম্পানীকে মেসোপটেমিয়ায় তেল উৎপাদনের কাজে সাহায্য এবং সমর্থন করবে। কারণ আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি ছিল বণিকদের হাতে। বিভিন্ন তেল কোম্পানী তেল উৎপাদনের কাজ করছিল। সরকারি কোন তেল কোম্পানী ছিল না। স্থির হল বিভিন্ন আমেরিকান তেল কোম্পানী একটি যৌথ সিন্ডিকেট স্থাপন করবে। এই আমেরিকান সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি ছিলেন ওয়াল্টার তিয়েগেল। তিনি পলিটিসিয়ান কিংবা ডিপ্লোম্যাট ছিলেন না। তিনি ছিলেন পাকা ব্যবসায়ী, বলা যায় মিস্টার গুলবেনিয়ানের সমকক্ষ, জুড়িদার।

প্রথমে তিয়েগেল বুঝতে পারেননি এই আলাপ আলোচনা হবে দীর্ঘকালের, কঠিন দেওয়া নেওয়ার বোঝাপড়া।

তিয়েগেল তেলের ব্যবসা বুঝতেন। তার পারিবারিক ব্যবসা ছিল তেল। তিনি তেলের ব্যবসা করে বাজারের কায়দা কানুনকে রপ্ত করেছিলেন। তিনি পরে চুয়াল্লিশ বছরে নিউজার্সির স্ট্যান্ডার্ড পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

এমনি সময় তিনি লন্ডনে টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গে আমেরিকান তেল কোম্পানী গুলির ভূমিকা কী হবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন।

টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর কাছে এবার আরো একটি 'নতুন' সমস্যা দেখা দিল।

এই সমস্যাগুলি খুলে বলা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীর বিরুদ্ধে হুসেন, দি শেরিফ অব মক্কা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তার এই বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন লরেন্স অব আরবিয়া। তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার পুরস্কার স্বরূপ, বৃটিশ সরকার হুসেনের ছেলেদের মধ্যে কয়েকটি আরব দেশ ভাগ বাটোয়ারা করে দিল। প্রথমে বৃটিশ সরকার হুসেনের তৃতীয় ছেলে ফৈসালকে সিরিয়ার শাসনভার দিল। কিন্তু এই আয়োজন ছিল সাময়িক। কারণ ফ্রান্স সিরিয়ার কর্তৃত্ব নেবার পর ফৈসালকে দামাস্কাস থেকে বের করে দেওয়া হল। ফৈসাল প্যালেস্টাইনের রেলোয়ে স্টেশনে গিয়ে তার লাগেজের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এবার প্রশ্ন হল ঃ ফৈসালকে নিয়ে কী করা যায় ?

বৃটিশ সরকারের মধ্য প্রাচ্যে তিনটি রাজত্বের জন্যে তিনজন রাজার দরকার ছিল। কারণ তুর্কীকে ভাগ করে ইরাক—প্রাক্তন মেসোপটেমিয়া তৈরি করেছিল। স্থির হল এই নতুন ইরাকের জন্যে তাদের একজন 'পুতুল' রাজা চাই অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লাগাম ইংরেজদের হাতে থাকবে, শুধু গদিতে একজন শিখন্ডী বসাতে হবে। এই শিখন্ডী হলেন ফৈসাল। বৃটিশ সরকার নিজে শাসন করতে চায়নি। তাহলে তাদের যে প্রচুর খরচ হত।

এই এলাকা বৃটিশদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিবিধ কারণে।

এক ঃ মেসোপটেমিয়ার তেল বৃটেনের বিশেষ দরকার ছিল। দুই ঃ গালফ এলাকা, পারশিয়ান গালফ, ভারতবর্ষ, সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়ার উপর পুলিশি শাসন করবার জন্যে ইরাকে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করা দরকার এই সরকার হবে একটি আরব সরকার। এছাড়া ইরাককে লীগ অব নেশনসের ইচ্ছায় অর্থাৎ পরদেশ শাসনের অধিকার যাকে বলা হয় Mandate হিসেবে গঠন করা হলে বৃটিশ সরকারের খরচ আরো কম হবে।

প্রথমে স্থির হয়েছিল ফৈসালের ভাই আবদাল্লা হবেন ইরাকের রাজা। পরে

আবদাল্লা হলেন জর্ডনের সম্রাট, ফৈসাল ইরাকের।

ঐ সময়ে ইরাক শাসন করা সহজ কাজ ছিলনা। কারণ ইরাকে শুধু একটি জাতি, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল না। ইরাকে বহু ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল—সুন্নী, শিয়া, ইহুদি কুর্দস, ইয়াজিদ্স। এখানে সংখ্যালঘু সুন্নী মুসলিমদের হাতে দেশ চালাবার ক্ষমতা ছিল। শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

ফৈসাল দেশ শাসনভারের জন্যে বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভর করতেন। এদিকে বৃটিশদের ইচ্ছা ছিল তেলের খনি আবিষ্কার করা। একবার এ দেশে তেল পাওয়া গেলে দেশ শাসনের ব্যয় কমে যাবে!

* * *

এই পরিস্থিতিতে এই নাটকে আলোচনাচক্রে যোগ দিলেন এক নতুন অভিনেতা এ্যালান ডালেস। পরে এ্যালান ডালেস সি. আই. এর বড়কর্তা হয়েছিলেন।

'এবার এ্যালান ডালেসের পরামর্শে তিয়েগেল' বললেন টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী মসুলে তেল উৎপাদনের কনসেশনের যে দাবি করছে সেই দাবি অযৌক্তিকর এবং ভুয়ো। ইরাকি সরকারি কর্মচারিরা কনসেশন নিয়ে কোন নতুন চুক্তি সই করতে চাইলেন না। এই কারনে টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী এবং ইরাকী সরকারের আলাপ আলোচনা চলল অতি মন্থর গতিতে। বলা যায় পিঁপড়ের গতিতে। পরে ১৪ই মার্চ ১৯২৫ নতুন চুক্তি সাক্ষরিত হল।

সব কি সমস্যার সমাধান হল। 'সমাধান হল না। এই আলোচনাকালীন গুলবেনকিয়ান পর্দার আড়ালে ছিলেন. তিনি কোন সভা সমিতিতে প্রকাশ্যে যোগ দেননি কিন্তু যে সব কাগজপত্র স্মারক লিপি, মেমোরন্ডাম কমিটির মিটিং-এ পেশ করা হচ্ছিল সবকিছু সম্পাদনা কিংবা বলা যায় গুলবেনকিয়ানের সাহায্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল। কারণ গুলবেনকিয়ান বলতেন তেল ব্যবসায়ে কোন বন্ধু নেই। আছে সাময়িককালের পরিচিত কিছু লোক। এর প্রমান হল গুলবেনকিয়ান এবং ডাচ শেলের কর্তা, হেনরী উইলিয়াম ডেটেরডিং ছিলেন কোন এক সময়ের বন্ধু। কিন্তু পরে লিভিয়া পাভলোভাকে নিয়ে তাদের ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। লিভিয়া পাভলোভা ছিলেন একজন জেনারেলের স্ত্রী। কিন্তু পরে দুজনেই, ডেটেরডিং এবং গুলবেনকিয়ান লিভিয়ার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডিটেরডিং লিভিয়া পাভলোভাকে বিয়ে করবার পর দুজনের বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গিয়েছিল।

এই আলোচনার সময় তিয়েগেল গুলবেনকিয়ানের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

দুজনে লন্ডনের কর্লটন হোটেলে লাঞ্চে দেখা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিয়েগেল বেশ সহানুভূতির সুরে বললেন. মিস্টার গুলবেনকিয়ান আপনি তেলের সওদাগর। আপনাকে যে তেলের পাঁচ পার্সেন্ট অংশ দেয়া হয়েছে একী

যথেষ্ট নয়।'

'তেলের সওদাগর' গুলবেনকিয়ান রেগে উঠলেন। আপনি একী বলছেন? আমি তেলের সওদাগর নই, একথা আপনি জেনে রাখবেন।

গুলবেনকিয়ানের আকস্মিক ক্রোধ দেখে তিয়েগেল হকচকিয়ে গেলেন। তিনি ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন তাহলে বলুন আমি আপনাকে কী বলে ডাকব। আমি দুঃখিত আপনার মনে যদি কোন দুঃখ দিয়ে থাকি।

'মাই ডিয়ার আমি তেলের সওদাগর নই। আমি হলাম তেল ব্যবসার নির্মানকারী। আমি কল্পনা করি, তেলের কোম্পানীর সৌধ তৈরি করব। বলতে পারেন আমি হলাম স্থপতি অর্থাৎ আমার কাজ হল স্বপ্নকে রূপ দেয়া। আমি এই টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী গড়েছিলাম। ঐ কোম্পানীতে আমি ডেটেরডিংকে স্থান দিয়েছিলাম, আমি ফরাসিদের ঐ কোম্পানীতে জায়গা করে দিয়েছিলাম আজ আপনাকে মানে আমেরিকানদের ডেকে এনেছি। এখন আপনারা সবাই আমাকে এই কোম্পানী থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

* * *

কিন্তু তখন ইরাকে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে তেল পাবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেলনা। পরে ১৯২৫ সালে আমেরিকা, এ্যাংলো পারসিয়ান কোম্পানী এবং রয়াল ডাচ এক যৌথ জিওলজিক্যাল সার্ভে শুরু করল। জিওলজিস্টরা তেল পাবার সম্ভাবনায় উৎসাহিত হলেন।

গুলবেনকিয়ান হার স্বীকার করবার পাত্র ছিলেন না। কারণ ইরাকে তেল পাওয়া যাবে, এ ছিল তার দীর্ঘকালের স্বপ্ন-সাধনা। তিনি ভাঙ্গা টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনি কোম্পানীকে চালিয়ে যাবার জন্যে নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করেছেন। যদি ইরাকে তেল পাওয়া যায় তাহলে তার স্বপ্ন-সাধনা সার্থক হবে।

১৯২. সালে তেলের কুয়ো খনন আরম্ভ হল কিরকুক থেকে ছয় মাইল দূরে বাবা গুরগুরে' প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেল। ঐ গ্যাসের আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বলতে লাগল 'এই আগুনেই নেবুকাডনেজার ইহুদিদের পুড়িয়ে মেরেছিলেন।'

তারপর তুমুল আর্তনাদ করে 'বাবা গুরগুর' থেকে প্রাকৃতিক তেল ঝর্ণার মতো বেড়িয়ে এল।

গুলবেনকিয়ানের আশা, স্বপ্ন সফল হল।

প্রধান প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল ইরাকে তেল আছে।

এবার তেলের ভাগ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। তেল আবিষ্কারের নয় মাস পরে এ্যাংলো পারসিয়ান, রয়াল ডাচ শেল, ফরাসি এবং আমেরিকানদের মধ্যে এক চুক্তি সাক্ষরিত হল। প্রত্যেকের ভাগে পড়ল ২৩.৭৫ পার্সেন্ট। এবং গুলবেনকিয়ানের অংশে পড়ল ফাইভ পার্সেন্ট। আরো ঠিক হল এই ফাইভ

পার্সেন্ট তেল গুলবেনকিয়ান ফরাসিদের কাছে ক্যাস টাকায় বাজার দরে বিক্রী করবেন।

কিন্তু আর একটা সমস্যা রয়ে গেল।

ইরাকে আরো তেলের কুয়ো আছে। এই চারটি কোম্পানী যদি একসঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেন তাহলে সবাই ভাল মুনাফা করবে। কেউ একা ইরাকে কোন তেল উৎপাদন করার চেষ্টা করবেন না।

এক সভায় এ নিয়ে এক চুক্তি সাক্ষরিত হল।

ঐ সভায় গুলবেনকিয়ানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের একটি পুরান ম্যাপ নিয়ে পুরান তুরস্ক সাম্রাজ্যের সীমান্তকে লাল কালি দিয়ে দুই ভাগ করলেন। তিনি বললেন এ হল অতীতের অটোমান সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যকে আমি ভাল চিনতাম। আমার ঐ সাম্রাজ্যে জন্ম হয়েছিল, বড় হয়েছি এবং ওখানে ব্যবসা করেছি।

লাল কালি দিয়ে সীমান্তের দাগ কেটে বললেন, এই লাল কালির ভেতর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সব তেল কোম্পানি, একমাত্র কুয়েট এবং ইরান ছাড়া। এই লাল কালির ভেতর সবাই এক সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। 'আলাদা আলাদা নয়।'

এই হল মধ্য প্রাচ্যের "রেড লাইন এগ্রিমেন্ট।"

এই রেড লাইন এগ্রিমেন্ট গুলবেনকিয়ানের সাফল্য, জয় হল।

এই হল মধ্যপ্রাচ্যের তেলের রূপকথার প্রথম কাহিনী।

* * *

শুধু তেল নয়, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন সরকার গবেষণা শুরু করলেন। আর এই গবেষণা আলোচনার পরিণাম হলো 'বাগদাদ চুক্তি'।

মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই চুক্তি করা হল। কী করে দীর্ঘকাল এই এলাকার বুকে কায়েমী হয়ে বসে থাকা যায়—তার খসড়া তৈরী হল বাগদাদ চুক্তিতে। এই চুক্তিতে প্রথমে সই করল তুর্ক এবং ইরাক সরকার। তারপর যোগ দিল ইংরেজ এবং মার্কিন রাষ্ট্র। পরে এই দলে পাকিস্থান আর ইরানকেও টানা হলো।

কিন্তু বাগদাদ চুক্তির মেয়াদ বেশীদিন রইলো না। কারণ ইতিমধ্যে বাগদাদে নতুন সামরিক নেতা কাসেমের অভ্যুদয় হয়েছে। কাসেম ইংরেজ এবং আমেরিকার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাই বাগদাদ চুক্তি থেকে ইরাক খসে পড়লো। অতএব বাকী সবাইকে নিয়ে নতুন সামরিক চুক্তি করা হলো। এর নামকরণ হলো 'সেনটো' বা 'সেনট্রাল ট্রিটী অর্গানিজেশন'।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সরকারের আগমনের প্রধান কারণ ছিল ইহুদী সম্প্রদায় দ্বারা নতুন রাষ্ট্র ইসরাইল গঠন এবং তেল। আরবদের বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিল আমেরিকান সরকার।

*　　　*　　　*

আবার আমার গল্পে ফিরে আসা যাক। এই কাহিনী বলতে গিয়ে আরব ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছে, তার একটা নেপথ্য কারণ আছে। কারণ ইতিহাস নিয়ে মানুষের জীবন। আজ এই মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুতলয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে। আর সেই পরিবর্তন মানুষের জীবনে আনছে বিচিত্র রং। এই কাহিনী হয়তো আবার আমাকে ফেনাতে হবে গল্পের জন্যে।

আজকের এই বিলাসিতার নগরী বেরুটে বসে আপনি অতীতের মধ্যপ্রাচ্যের কল্পনা করতে পারবেন না। পুরোনো ইতিহাসের সঙ্গে আপনার গল্প মিলিয়ে দেখছেন কোনটি সত্যি কোনটি মিথ্যে? ভাবছেন বিবলসের কথা—বালবেকের গল্প। কিন্তু লেবানন—আর অতীতের ফিনিসিয়ানদের দেশ নয়। বালবেকের স্মৃতি আজ শুধু ট্যুরিস্টদের দর্শনের জন্যে। এখানকার সমুদ্রতটে বা কাফের চত্বরে বসে জনসমুদ্রের পানে তাকিয়ে আপনার ক্ষণিকের জন্যেও মনে হবেনা যে, আপনি মধ্যপ্রাচ্যের বুকে বসে আছেন। আজ লেবাননে আরব সংস্কৃতি ম্লান হয়ে আসছে। আজ এখানে যে সভ্যতার সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে সে হলো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা।

কিন্তু আপনি কৌতূহলী। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আপনার পরিচয় মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের মারফৎ। আপনি ইসলাম ধর্মকে আরো ভালো করে জানতে চান। বই-পুঁথির মারফতে নয়—আপনি দেখতে চান ইসলামের গৌরব, তার প্রভাব। তবে আপনাকে লেবাননের পর্বতমালা অতিক্রম করে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন নগরী দামাস্কাসে আসতে হবে। কিন্তু শুধু জীবনকে উপভোগ করা, সুন্দরীর রূপসুধা পান করাই যদি আপনার বাসনা হয়, তবে বেরুটেই আপনার জীবন কাটাতে হবে।

আমি সাংবাদিক, পরচর্চা আমার পেশা, তাই বেরুট নগরীতে কায়েমী হয়ে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম নাইটক্লাব, ক্যাবারের ভেতর দিয়ে নির্বিবাদে জীবন কেটে যাবে। কিন্তু কাটলো কই? লায়লা—মালকানি এবং মাধবন নায়ারের আবর্তে পড়ে আমার জীবন অদলবদল হয়ে গেলো। কেন, একটু ব্যাখ্যা করে এই কাহিনী বলা দরকার।

*　　　*　　　*

আমার বলতে দ্বিধা বা লজ্জা নেই যে, আমি লায়লার প্রেমে পড়েছিলাম। লায়লার প্রতি আমার প্রেম নিবেদন হয়তো বাংলা দেশে হ্যাংলামো মনে হতে পারে। কিন্তু এ অঞ্চলে, যেখানে বাতাসে প্রেমের ঢেউ বইছে, এখানে আমার প্রেম ভালোবাসা কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাদের প্রেমের অভিজ্ঞতা আছে তারা হয়তো টিপ্পনি কাটবেন। জানি, আপনারা কী বলবেন, আমি আলেয়ার মতো মেয়েদের পেছনে ঘুরছি। কিন্তু

আপনাদের মন্তব্যর প্রতিবাদ আমাকে করতে হবে। আমাকে প্রমাণ করতে হবে এই আলেয়ার পেছনে ঘোরার উদ্দেশ্য কিংবা সার্থকতা আছে। কারণ এই যে আরব বেদুইন নিয়ে আমার গল্প, সে কাহিনীর প্রধান প্রধান চরিত্রে আপনি দেখা পাবেন আলেয়ার নারীদের। আর তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই আমার এই কাহিনী।

একটা দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মনে থাকার কারণ ছিলো। এই গল্পের আরম্ভ যদি সেই দিনের ঘটনাকে নিয়ে করতাম, তাহলেও আপনি অসোয়াস্তি অনুভব করতেন না। কারণ সেইদিনই আমার লায়লার সংগে শেষ সাক্ষাৎ। কিন্তু সে কাহিনী বলতে গেলে আমাদের দামাস্কাসে যেতে হবে। একা নয়—লায়লাকে সংগে করে।

*　　　*　　　*

খুব সকালে লায়লা আমাকে টেলিফোন করল। বলল—দামাস্কাসে যাবে বিক্রম? আমার একটা বিশেষ কাজ আছে। পথের একজন সংগী চাই। তাই তোমাকে যেতে অনুরোধ করছি।

লায়লার সংগ পেতে আমি সর্বদাই উৎসুক। তাই সেদিন লায়লার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করিনি। যাবার আর একটা কারণ ছিলো। বহুদিন থেকে দামাস্কাস নগরী দেখবার লোভ ছিলো। তাই বিনা প্রতিবাদে লায়লাকে নিয়ে আমি দামাস্কাসের দিকে রওনা হলাম। যাবার পথে হঠাৎ লায়লা আমাকে বলল—আজ সন্ধ্যায় মালকানি বোম্বাই যাচ্ছে। তাই সন্ধ্যার আগে বেরুট ফিরে আসতে হবে।

বোম্বাই! আমার কণ্ঠে শুধু বিস্ময় নয়, উত্তেজনাও ছিলো। এইতো দুদিন আগে মালিকানিকে সংগে করে আমি রসের রেঁস্তোরায় বসে গল্প করেছি। কিন্তু মালকানি তো আমায় ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে বোম্বাই যাবে। আজ হঠাৎ তবে এ যাত্রা কেন?

আমাকে খানিকক্ষণ সময় চুপ করে থাকতে দেখে লায়লা হয়তো আমার মনের কৌতূহল বুঝতে পারে। তাই তার কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলে—ব্যবসায়ের কাজে দামাস্কাসের যে লোকটার কাছে যাচ্ছি, সে হলো মালকানির বিজনেস পার্টনার। দুজনে মিলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগে একটা ব্যবসা সুরু করেছে। সেই কাজের জন্যে বোম্বাইতে যাত্রা।

এর পর এ ব্যাপার নিয়ে আমি কোন প্রশ্ন করিনি। ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ জানবার ঔৎসুক্য, আমার নেই। থাকলে আজকে আমার এই গল্প হতো না।

*　　　*　　　*

চলুন, আমার সংগে দামাস্কাসে।

আমার পথের সংগী হয়ে নয়—আমার এই বিবরণীর পাঠক হয়ে।

প্রাচীন দামাস্কাস নগরী, তিনসহস্র বছর যার ইতিহাস, তার কাহিনী কী আর সংক্ষেপে বলা যায়। শুধু এর কিছুটা আভাষ আজ দেবো। বাকীটা বারান্তরে।

* * *

লেবাননের পর্বতমালা ভেদ করে হামদুন, আলে এবং সাতুরা শহর পার হয়ে আপনি যখন দামাস্কাসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন, তখন আপনার মনে হলো যে আপনি মরুভূমির রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু হঠাৎ কানে সঙ্গীতের মতো নদীর কুলকুল শব্দ ভেসে এলো — না, এতো মরুভূমি নয়—এযে মরুদ্যান।

শহরে ঢুকবার মুখেই ছোট নদী। এই নদীই দামাস্কাসের জীবন। নইলে প্রাচীন নগরী দামাস্কাস হতো ধ্বংসস্তূপ। এই নদীর নাম হলো 'বারদা'।

নদী পার হয়ে এলেন শহরে। আপনার পশ্চাতে লেবাননের পর্বতমালা বরফে আচ্ছন্ন। তারই হিমেল বাতাস এসে বয়ে যায় দামাস্কাস নগরীতে।

নিঝুম পুরী দামাস্কাস। শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি শূন্য রাস্তা পড়ে আছে। লোক নেই, কোলাহল নেই, শুধু অতীত যুগের স্মৃতিকে বহন করে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীনকালের অট্টালিকা।

আপনি দামাস্কাস নগরীর মুসাফির। ভাবছেন এ শহরের ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে মুখস্ত করবেন। ভুল করবেন। বইয়ের পাতা থেকে নয়, দামাস্কাসকে জানবার সবচাইতে ভালো উপায় হলো তার মিউজিয়াম। অতীতকে যদি আরো একটু ভালো করে জানতে চান তবে দামাস্কাস নগরী অতিক্রম করে চলে আসুন পালমিরা বা আলেপ্পো।

শৈশবে ইতিহাসের পাতায় পালমিরা, আলেপ্পোর পরিচয় আপনি নিশ্চয় পেয়েছেন। রোম সাম্রাজ্যের যখন জয়-জয়কার, আশেপাশের রাজা রাজরারা যখন রোমান সম্রাটের কাছে মাথা নত করেছে তখন এই পালমিরা আলেপ্পো ছিলো শুধু ব্যবসার ঘাঁটি নয়, সংস্কৃতির কেন্দ্র।

দামাস্কাসের অতীত ইতিহাস হয়তো আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করবে। সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মকে ভালো করে জানবার জন্যে দামাস্কাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা দরকার।

কিন্তু ইতিহাসের ধারা চিরকাল একই সুরে, একই ছন্দে বয় না। তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারা বদলে যায়। এই যে দামাস্কাস নগরী, আজ যেখানে প্রতি সকাল সন্ধ্যায় রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটছে, তারও পরিবর্তন ঘটলো দ্রুতবেগে। মুহম্মদের মৃত্যুর পর এ দেশের মনিব হলেন উমাইদ সম্রাটরা। বহুদূর অবধি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো দামাস্কাস, হোমস্, উদর্ন, প্যালেস্টাইন অবধি। কোরাণ হলো শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোরাণের ভাষা হলো রাষ্ট্রভাষা। উমাইদের পরে এলেন আলীর বংশধরেরা— আব্বাসাইদরা। নতুন রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হলো। দামাস্কাসের

খ্যাতি ম্লান হলো।

তারপর এলো ফতেমাইদ সম্রাটদের যুগ। কিন্তু অতীতের দামাস্কাস, আসেরিয়ান বাইজানটান যুগের দামাস্কাসের খ্যাতি আর ফিরে এলো না। ভাঙ্গা সাম্রাজ্য জোড়া লাগলো না।

কয়েক শতাব্দী পরে মিশরের সম্রাটের অধীনে এলো দামাস্কাস, আলেপ্পো। কিন্তু মিশরীয় সম্রাটদের শাসন বেশীদিন টেকেনি। তাদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিলেন তৈমুর লং। এরপর এলো আতোমান তুর্কের যুগ। সেই চির পুরাতন কাহিনী। ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ। মিশরের সম্রাট তখন মুহম্মদ আলী। চতুর্দিকে তার খ্যাতি। তারই ছেলে ইব্রাহিম পাশা ভাঙ্গা সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাজা যা ভাবেন প্রজারা ভাবে ঠিক তার বিপরীত। মাথা উঁচু করে দাড়াল প্রজাব দল। বিদ্রোহ সুরু হলো। বাধ্য হয়ে দামাস্কাসের লোভ মুহম্মদ আলীকে ত্যাগ করতে হলো।

*　　　*　　　*

আজ দামাস্কাস নীরব নিস্তব্ধ। দামাস্কাসের এই রূপ আমাকে বিস্মিত করেনি। মধ্যপ্রাচ্যের নগরীর এই বিশেষত্ব। হঠাৎ নীরবতা ভেদ করে 'খামশিন ঝড়ের' মতো এদেশের শহরে বিপ্লবের ঢেউ বয়ে যায়।

বেরুটের জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তার নাইটক্লাবে কিন্তু দামাস্কাসের রূপ দেখতে হলে যেতে হবে তার হাটবাজারে। আপনারা যাকে বলেন বাজার, আরবী ভাষায় একে বলা হয় 'সুক'।

এই বাজারের কিছুটা আভাষ আপনাদের আগেই দিয়েছি, কিন্তু সব কথা বলার অবকাশ পাইনি। চলুন এবার আপনাদের পৃথিবী বিখ্যাত দামাস্কাসের 'হামদিয়া সুকে' নিয়ে যাই।

হামদিয়ার সুক শুধু বিকিকিনির বাজার নয়। এ হলো রাজনীতি চর্চার বাজার, সাহিত্যের বৈঠক, শিল্পের আসর আর মেয়েমানুষ নিয়ে জলসার কেন্দ্র। পাশ্চাত্য জীবনের ঢেউ দামাস্কাসের বুকে লেগেছে সত্যি, কিন্তু হামদিয়ার সুক আজো অতীতকে আঁকড়ে ধরে আছে। সুকের চারদিকে রোমান সম্রাটদের তৈরী দেওয়াল—আরব বেদুইনের দোকান-পসার আপনাকে অতীত দিনের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

*　　　*　　　*

হামদিয়ার সুক :

এতো আজকের সুক নয়, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন যুগের সুক! ঐ যে দোকান দেখছেন, সুগন্ধি তামাকের দোকান কিংবা তারই পাশে যে মসজিদ অতীতের ঐশ্বর্যকে বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, ওকী আজকের জিনিস। ও হলো হিতাইীত আমলের দোকান, মুহম্মদের যুগের মসজিদ। কিন্তু ঐ দোকান দেখে আপনি হামদিয়া সুকের বয়স যাচাই করতে পারবেন না। আজ

যুগ পাল্টেছে—সময়ের হয়েছে হের-ফের। আজ ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্যে আসিরিয়ান সম্রাটের ছবির প্রয়োজন নেই। আজকের দরকার সুন্দরী ললনার, অর্ধনগ্ন ফটো আর রেডিওর শ্রুতিমধুর সঙ্গীত।

হামদিয়ার সুকে লোকজন গিস্‌গিস করছে। আপনি বিদেশী, ক্যামেরা ঝুলিয়ে, রঙ্গীন চশমা পড়ে হামদিয়ার সুকের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ আপনার পথ রুখে দাঁড়ালো এক বেদুইন। আতঙ্কিত হয়ে আপনি থমকে দাঁড়ালেন। আপনি ভাষা জানেন না, এখানকার হালচাল আপনার রপ্ত নয়। তাই বিদেশী দেখলে আপনি শঙ্কিত হন।

আলা ওয়াসালান? বেদুইন আপনাকে প্রশ্ন করে। কিন্তু সেই প্রশ্নের অর্থ না বুঝে আপনি জবাব দেন—গুড মর্নিং।

ইংলিশ?—আবার প্রশ্ন হয়।

ইন্ডিয়ান।—আপনি জবাব দেন।

ইউ ওয়ান্ট টু নো ইউর ফরচুন?—প্রশ্ন হলো।

এবার আপনার বিস্ময়ের পালা। ভেবেছিলেন যে আপনার দেশই জ্যোতিষীদের একমাত্র আস্তানা। হামদিয়ার সুকে আরবীয় জ্যোতিষীর সঙ্গে যে আপনার মোলাকাৎ হবে এ কখনও কল্পনা করেন নি। এড়িয়ে গেলেন হয়তো লোকটাকে

জানা নেই, শোনা নেই, কার খপ্পরে গিয়ে পড়বো—এই আপনার ভাবনা। ভবিষ্যৎ জানতে আপনি চান কিন্তু বিদেশী লোকটাকে দেখে হয়তো আপনার সঙ্কোচ, দ্বিধা বাড়ে।

এর পর যার খপ্পরে আপনি পড়লেন সে হলো সরবৎওয়ালা। মিষ্টি সরবৎ। নানান্ রংয়ের মস্তোবড়ো টেবিল, তার চারপাশে রয়েছে সরবৎ-এর বোতল আর বাতাবি লেবু। দুধ, সিরাপ আর জল মিশিয়ে তৈরী হচ্ছে সরবৎ। একটু রং মিশিয়ে লাল, সবুজ কিবা গোলাপী। সিরাপের সরবৎ ভালো না লাগে, নিন কমলালেবু বা তরমুজের সরবৎ।

হামদিয়ার সুক—রাজনীতির হাটবাজার। মধ্যপ্রাচ্যের কোন অঞ্চলে কী ঘটছে তার বিবরণী পাবেন এই বাজারে। কোন দেশে বিপ্লব হলো, কোন রাষ্ট্রপতি কোতল হলো, সেই সব টাটকা খবর ঘুরছে দোকান পসারীর মুখে মুখে।

আপনি ভারতীয়, কিন্তু তবু কৌতূহলী দোকানী আপনাকে প্রশ্ন করল—মিন আল পাকিস্থান?

লা, লা—আনা মিন অল হিন্দ।

তায়েব তায়েব—সু সার কাশ্মীর? [কাশ্মীরের খবর কী?]

এবার আপনি একটু হকচকিয়ে গেলেন। এদের মুখে কাশ্মীরের কথা শুনতে পাবেন এ কিন্তু কল্পনা করেন নি। কিন্তু আপনার মুখের জবাব বেরুতে

না বেরুতে লোকটা আপনাকে কাশ্মীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে গেলো। আপনি তাজ্জব বনে গেলেন।

এবার চলুন আমার সঙ্গে হামদিয়ার সুকের 'মাতাহামের' [রেস্তোরা] ভেতরে। এ হলো কফির সরাইখানা। দোকান ভর্তি লোক, কেউ বা কফির পেয়ালা নিয়ে বসে আছে কেউ বা গোল হয়ে গল্প করছে। ঘরের একপ্রান্তে দাবা পাশা খেলা চলছে। তাস ও পিটছে কেউ কেউ। 'সাতিনি সায়, আর আতিনি কাওয়ের' চীৎকারে 'মাতাহাম' মুখরিত। রেডিও চলছে।

হঠাৎ সঙ্গীত থেমে গিয়ে খবর শুরু হয়ে হয়। ভয়েস্ অব দি আরবের সংবাদ। মুহূর্তের মধ্যে 'মাতাহাম' নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এইটে মাতাহামের সব-চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। হাসি ঠাট্টা নেই।

সবাই শুনছে আজকের টাটকা সংবাদ। গামেল অব্দেল নাসরের বক্তৃতা, ইরাকের বিপ্লব বা ইয়েমেনের যুদ্ধ। খবর শুনতে শুনতে উত্তেজনা বাড়ে। সংবাদ শেষে আলোচনা শুরু হয়।

প্রতিটি মুহূর্তে মাতাহামের ভেতর নতুন লোক ঢুকছে। সবার মুখে থাকে টাটকা খবর। শহরের আনাচে কানাচে কী ঘটছে। আলেপ্পোতে ছাত্র ধর্মঘট কিংবা হোম শহরের মজদুরদের প্রসেশান। খুবই মুখরোচক কাহিনী।

হকার এসে দুপুরের সংবাদপত্র দিয়ে যায়। এখানকার কাগজ নয়, বেরুটের। ও কাগজে সব উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ থাকে। ইসরাইল সরকার কী করছে। মধ্যপ্রাচ্যে এইটে সব চাইতে আকর্ষণীয় সংবাদ। লাল হরফের ব্যানার হেড লাইন। মিশাল-আফলাক-সালা বিতারের বিবৃতি।

*　　　*　　　*

হামদিয়ার সুকে বাজার করেছেন কখনও। করেন নি।

করলে মনে কষ্ট পাবেন, না করলে মনে আপশোষ হবে। কারণ এ বাজারে সওদা করা মানে টাকা গচ্চা দেওয়া। আর যদি বাজার না করেন তবে মনে দুঃখ হবে যে, মধ্যপ্রাচ্যের সবচাইতে বড়ো হাটে আপনি কেনাকাটা করেন নি।

হামদিয়ার সুক বহু এবং বিচিত্র মানুষের কোলাহলে গমগম্ করছে। দোকান পশারীর ঝগড়া বিবাদে কোন কিছু শোনবার যো নেই। এই বাজারে কেনাকাটা করা সহজ কথা নয়। দরদস্তুর করতে আপনি জিতলেন কী হারলেন, সে নির্ভর করছে আপনার উপর।

আপনি শৌখিন ক্রেতা. শুধু কেনার বাই নয় রুচিও আছে। সওদা করে আনন্দ পান। সাহেবী দোকান থেকে বেশ চড়া দামে জিনিস কেনেন। কিন্তু সেই সাহেবী দোকানের জিনিস আপনি আধা দামে পাবেন এই হামদিয়ার সুকে। কিন্তু তবু আপনার মনে আপশোষ থেকে যাবে যে আপনি ঠকে গেছেন। হোটেলে এসে স্ত্রীর কাছে তো আপশোষ করতে পারেন না। হাজার হোক

পুরুষের গর্ব তো আপনার আছে।

আপনি যদি বাঙালি মেয়ে হন, তবে আপনার বিপদ আরো বেশী। কল্পনা করুন আপনি বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন। সমস্ত ইউরোপে, রোম, বন, প্যারী, শহরে ঘুরে দুদিনের জন্যে এসেছেন এই মধ্যপ্রাচ্যে। হামদিয়ার সুকের নাম শুনেছেন। তাই কেনার লোভে এলেন এই হাটে।

আপনার চোখে রঙ্গীন চশমা। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। হাতের নোখ এবং ঠোঁট লাল। আপনার ভাষা ইংরেজী। দার্জিলিং মিশনারী স্কুলের উচ্চারণ। উচ্চারণের কিছুটা বলেন, কিছুটা বলেন না। আপনি ভাবেন আপনি দেখেছেন বিস্তর। কিন্তু আপনি ঠকে গেলেন। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা হামদিয়ার সুকে অচল।

আপনার মুখ দিয়ে ইংরেজী ভাষা বেরুলো তো জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে গেলো। যদি ফরাসী ভাষা বলেন তবু কিছুটা রক্ষে। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে ইংরেজ মেমসাহেব বলতে চান তবে আপনাকে অর্থদণ্ড দিতেই হবে।

বাজারে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বিক্রেতারা এসে আপনাকে পাকড়াও করল। এ অভিজ্ঞতা আপনার নতুন। আপনি লণ্ডনের পিকাডিলি সার্কাস দিয়ে ঘুরেছেন, কলোনের হোহো স্ট্রাসের দোকান-পাট আপনার কণ্ঠস্থ পারীর সাঁ জেলিসিলা দিয়ে কতোবার আনাগোনা করেছেন, কিন্তু কৈ, আপনাকে ঘিরে তো কোন দোকানদার হল্লা করেনি।

এবার আপনাকে প্রশ্নবান সুরু হলো।

পাকিস্তান?

ভারতীয়।

হিন্দ-হিন্দ? তায়েব তায়েব চাম্মি কাপুর, সায়রা বানু?

আপনার পেছন থেকে গান সুরু হয়ে গেল। সুকু সুকু সুকু।

আপনি ভেবেছিলেন এরা আপনার কাছে গান্ধীজী বা নেহেরুর কথা বলবে না, এদের কাছে পরিচিত হলো আপনার দেশের চিত্রাভিনেত্রী! দেশের ফিল্ম-স্টারদের নাম শুনে আপনি খুসী। ভাবলেন ভারতীয় বলে আপনাকে সস্তায় জিনিস দেবে। কিন্তু আপনি জানেন না যে অলক্ষে এরা আপনার জবাই'র জন্যে ছুরিতে শান দিচ্ছে!

দোকানে ঢুকলেন। জিনিস দেখে পছন্দ হলো। হরেক রকমের মাল। জিনিস পছন্দ না হয়ে উপায় কী। আপনি ইংরেজীতে শুধালেন—হাউ মাচ? হোয়াট্ প্রাইস্? দোকানী হতভম্ব। ভাবটা এমন করল যে আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারেনি। আর একটা আরবী লোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলো। দোকানীকে আপনার প্রশ্ন তর্জমা করে দিল। বলল—আদেশ? দোকানী এবার আপনার প্রশ্নকে বুঝতে পারে। আগেই বুঝতে পেরেছিলো কিন্তু না বোঝার ভান করেছিলো। তাই এবার আরবী ভাষায় জবাব দিল—খামশ লিরা উনুষ

জিনিসটার আসল দাম দুই পাউন্ড। কিন্তু আপনি বিদেশী। ইংরাজী জবাব এবং সেক্সপীয়েরের অর্থারিটি বলে জিনিসটাকে হামদিয়া সুক থেকে তিন লিরা দন্ড দিয়ে কিনলেন।

এবার আপনার বিস্ময়ের পালা। 'খামশ লিরা উনুষ' এটা যে কতো আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। দোভাষী এসে জিনিসটার দাম বলে দিল। আপনি যা দরদস্তুর করেন, দোকানী তা বোঝে না। অথচ জিনিসটা আপনার ভারী পছন্দ। এতোটা পথ এসে তো আর শুধু হাতে ফিরতে পারেন না। তাই দোকানীর কাছে আপনি পরাজয় স্বীকার করলেন। কারণ দরদস্তুর করার মতো ধৈর্য আপনার নেই।

বাঙ্গালী স্ত্রী। নিজের হাতে যতো বেশী দাম দিয়েই জিনিস কেনেন না কেন আপনি তুষ্ট। কিন্তু আপনার স্বামী হামদিয়ার সুক থেকে আধা দামে জিনিস কিনে আনুক, আপনি কখনই তা বরদাস্ত করবেন না। আপনি ভাববেন আপনার স্বামী ঠকে গেছে।

*　　　*　　　*

দামাস্কাস আজোও পূর্বপ্রান্তের দ্বার।

পশ্চিমের সভ্যতা এখানকার নাগরিকদের বিচলিত করেনি। তাই হামদিয়া সুকের মসজিদ কিংবা ওমাদিয়া মসজিদের ভেতর থেকে আজানের কণ্ঠস্বর আপনাকে কখনই বিচলিত করবে না। কারণ আপনি জানেন যে দামাস্কাস শুধু বেদুইনের দেশ নয় — ইসলামের দেশ।

হামদিয়ার সুক।

'অনেকে বলেন এই হামদিয়ার সুক থেকে উৎপত্তি হয়েছিল আরব্য রজনীর সহস্র কাহিনী। গালা, যিনি এই আরব্য রজনীর কাহিনী য়ুরোপের পাঠকদের কাছে প্রথম নিবেদন করেছিলেন তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন সুক অর্থাৎ বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। ঐখানে তিনি এই সহস্র রজনীর কাহিনী শুনেছিলেন। এর পরে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে। একদল বলেন আরব্য রজনীর কাহিনী হল আরবীক। আবার অনেকে বলেন এই কাহিনী পারশ্য থেকে এসেছিল। তৃতীয় মত হল এ কাহিনীর অনেক গল্প হল ভারতীয়। ভারত থেকে অনেক গল্প কাহিনী পারশ্যে যায়। কারণ ঐ সময়ে ভারত এবং দূর প্রাচ্যের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গালা বলেছিলেন আরব্য রজনী হল পারশিয়ান কাহিনী হাজার আফসানার হল তার আরবীক অনুবাদ।

একটি মত হল যে আলি আবু আল হাসান দরবারে ৯৪৪ খৃষ্টাব্দেআন মাসুদ নামে এক লেখক একটি বই রচনা করেছিলেন যার নাম ছিল 'মুরুজ' আল দাহার ওয়া মাদিন আল জোহর ("Meads of Gold and

mines of Gems")

ঐ সময়ে রাজাদের দরবারে এই ধরনের গল্প কাহিনী বলা হত। আল মাসুদি ঐ কাহিনী সংকলন করেছিলেন। ঐ কাহিনী ফার্সি, হিন্দী এবং রোমান কাহিনী থেকে সংকলন করা হয়েছিল। পরে এই কাহিনী 'কিতা আলফ লায়লা ওয়া লায়লা অর্থাৎ সহস্র রজনীর কাহিনী নামে প্রকাশিত হল। কাহিনীর মূল নায়ক ছিলেন রাজা, তার মন্ত্রী, তার কন্যা, শিরজাদি এবং ক্রীতদাসী দুনিয়া জাদিকে নিয়ে রচিত।

দ্বিতীয় কথা হল এই কাহিনী কবে রচনা করা হয়েছিল? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী রাজদরবারে শোনা যেতো। অতএব বলা যায় সহস্র রজনীর মূল গ্রন্থ হল পারশ্য কাহিনী ভারতীয় কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে। যার নাম ছিল 'হাজার আফসানা'। দুই, এই সহস্র রজনীর কাহিনীর মধ্যে সবচাইতে পুরানো কাহিনী হল সিন্দবাদের কাহিনী। রচনার সময়কাল খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টের মৃত্যুর আটশো বছর পরে। পরে হিসেব করে আনুমানিক রচনার সময় তেরোশো খৃষ্টাব্দ করা হয়েছে বলা যায়। লেখক কে? অজানা।

য়ুরোপের প্রথম আরব্য রজনী নিবেদন করেছিলেন 'আনতোয়ান গাঁলা'। তিনি ছিলেন ফরাসি ডিপ্লোম্যাট। তিনি হামিদিয়ার বাজার কফিহাউসে বসে কফি খেতেন এবং এই সব গল্প কাহিনী শুনে পরে পারীতে ফিরে গিয়ে প্রথম আরব্য রজনীর কাহিনী প্রকাশ করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ হন! বাংলায় যে সব আরব্য রজনী প্রকাশিত হয়েছে—দুর্বল, অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ।

দামাস্কাসের ইতিহাস হয়তো বারান্তরে বলতে হবে। কারণ ওমায়িদয়া মসজিদ বা আজম প্রাসাদের কাহিনীর অবতারণা করতে হলে লায়লাকে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যার আগে বেরুটে ফিরতে পারতাম না। তাই ইতিহাসকে ছেড়ে আবার উপন্যাসে ফিরে আসা যাক।

কিন্তু উপন্যাসে ফিরে আসতে হলে আপনাকে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে আবার বেরুট নগরীতে ফিরে আসতে হবে। সেই বেরুট নগরী, আলোয় ঝলমল করছে। প্রতি মুহূর্তে প্লেন উঠছে নামছে।

এইটেই বেরুট নগরীর বিশেষত্ব।

শহর আর বিমান বন্দরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

দূর হাজমিয়া গ্রাম থেকে বেরুট বিমানবন্দরের নিশানা আপনার চোখে পড়ে। অন্ধকার ভেদ করে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে, লাল আলোর সংকেত। বিমানবন্দরের চতুর্দিকে ঘেরা পাহাড়। সতর্ক বৈমানিকের নিপুণ পরিচালনায় আপনার প্লেন যখন এসে বিমানবন্দরে পৌঁছল, তখন উপলব্ধি করলেন যে আপনি পূর্বদিগন্তের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন।

লন্ডন বা অরলির বিমানবন্দরে শীতের হিমেল হাওয়ায় আপনি সঙ্কুচিত হয়েছিলেন কিন্তু বেরুটে বিমানবন্দরে এসে আপনার সমস্ত জড়তা কেটে গেল।

*　　　*　　　*

আকর্ষণীয় বিমানবন্দরের ভেতরে ঢোকা যাক।

যাত্রী হিসেবে নয় দর্শক হিসেবে। বেরুট বিমানবন্দরের খ্যাতি শুধু মধ্যপ্রাচ্যের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এর নাম ছড়িয়ে আছে।

আপনি ইচ্ছে মতো এই বিমান বন্দরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে পারেন। বাঁধা দেবার বা নিষেধ করবার কেউ নেই। (যাত্র থি) ক্লান্ত হলে রেঁস্তোরায় গিয়ে বসতে পারেন। আর যদি ভাগ্যবান ডিপ্লোমাটিক সার্ভিসের কেউ হন—কিংবা লণ্ডন কলকাতার মুসাফির হন তাহলে বেরুট বিমানবন্দরের দোকান-পাট আপনার জন্যে অহোরাত্র খোলা থাকবে।

সস্তায় জিনিস কিনে নিতে পারেন এবং সেই জিনিসের জন্যে কলকাতার কাস্টমসে বেশ মোটা টাকা জরিমানা দিতে পারেন।

বেরুটের বিমানবন্দর—বিচিত্র নগরী, বিভিন্ন ভাষাভাষীর কোলাহলে মুখরিত। লণ্ডন, ন্যুইয়র্ক যাবার পথে বেরুট বিমান বন্দরের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়নি একথাটা অবিশ্বাস্য। আফ্রিকা বা মধ্য প্রাচ্যের অন্য কোন নগরীতে যাবার আগে বেরুটে কয়েকটা দিন আপনাকে কাটাতেই হবে। জীবন যদি উপভোগ করতে চান, তবে দুদিনের জন্যে বেরুটে পদার্পণ করুন, ট্যাক্সী নিয়ে সোজা চলে আসুন কার্লটন, সঁ্যা জর্জ বা ফিনিসিয়া হোটেলে।

আপনার মনে হবে আপনি অন্য জগতের মানুষ। বেরুট বিমান বন্দরের সে অসংখ্য যাত্রী ওঠা-নামা করছে এদের অধিকাংশই বেরুটে তাদের দেহের ক্লান্তি মেটাতে আসে।

*　　　*　　　*

লায়লাকে নিয়ে বিমানবন্দরের জনতা ভেদ করে আমরা যখন বিমান কোম্পানীর কাউণ্টারে পৌঁছলাম তখন মালকানির প্লেন গর্জন করছে। খবরটা লায়লার কাছে নৈরাশ্যজনক। মালকানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার একান্ত প্রয়োজন। দামাস্কাস থেকে সে একটা ছোট প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তার কোম্পানীর কাগজপত্র এটা মালকানির হাতে তুলে দেওয়া চাই। কিন্তু কাস্টমস পার হয়ে যাবার কোন উপায়ই নেই।

নিরুপায় হয়ে লায়লা আমার দিকে তাকাল।

বলল··আমায় একটু সাহায্য করবে বিক্রমাদিত্য?

লায়লাকে সাহায্য করতে আমি কোনদিনই সংকোচ বোধ করিনি। আজোও করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম -কাজটা কী শুনি?

এই যে ছোট প্যাকেটটা দেখছো, এটা মালকানিকে দিতে হবে। কাস্টমস্ আর সিকিউরিটি পুলিশকে এড়িয়ে যাবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তুমি সাংবাদিক। তোমার গতিবিধি সর্বত্র তাই তোমাকে এ কাজটা করার জন্যে অনুরোধ করছি।

কর্তৃপক্ষের বেড়াজাল অতিক্রম করে অন্যকে সাহায্য আমি কখনই করিনি। অন্ততঃ করবার মৌকা কোনদিন হয়নি।

লায়লার অনুরোধ আমি আজ এড়াতে পারলাম না।

আমি সাংবাদিক। এইটে আমার সব চাইতে বড়ো পরিচয়। সাংবাদিকের পরিচয়পত্র দেখিয়ে আমি অতি সহজেই বিমানবন্দরে ঢুকে গেলাম।

প্লেনের সিঁড়ির কাছে মালকানি দাঁড়িয়েছিলো। আমাকে বিমানবন্দরের ভেতরে দেখতে পাবে এ আশা কখনই করেনি। তাই একটু ব্যস্ত হয়ে শুধোল —আপনি এখানে?

আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এই যে ছোট প্যাকেটটা দেখছেন, লায়লা এইটে আপনাকে দিয়েছে। আপনার কোম্পানীর জরুরী কাগজপত্র।

খুসীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল মালকানি। ছোট প্যাকেটটি হাতে নিয়ে বলল—বিক্রমাদিত্য, আপনি কী যে উপকার করলেন বলবার নয়। আপনার দয়ার কথা চিরকাল মনে থাকবে। কাগজগুলো না পেলে বোম্বাইতে যাওয়াই আমার ব্যর্থ হয়ে যেতো।

মালকানির বিনীত কণ্ঠ আমাকে অভিভূত করল। তাই একটু লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিই—এমন আর কী করেছি। সামান্য একটা ছোট প্যাকেট আপনার হাতে তুলে দিলাম। এ জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে লজ্জা দেবেন না।

এ প্যাকেট আপনার কাছে ছোট কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য বহু, বলতে গেলে এইটে আমার কাছে জীবন।

প্লেনের গর্জন এবার আরো তীব্র হলো। যাত্রীরা নিজের সীটে গিয়ে বসল। মালকানি আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। যাবার আগে আমার হাত ধরে বলল—আমার অবর্তমানে লায়লার উপর একটু নজর রাখবেন বিক্রমাদিত্য। বন্ধু মানুষ, আপনাকে এ অনুরোধ না করে পারছিনে।

হেসে জবাব দিলাম—চিন্তা করবেন না।

প্লেন ছেড়ে দিল। তারই তীব্র গর্জন সমস্ত বিমান বন্দরকে মুখরিত করে তুলল।

*   *   *

আপনি ভাবছেন আমার গল্প কোথায়? আছে, এইবার সেই গল্পের অবতারণা করছি।

মালকানির প্লেন ছেড়ে দেবার পর আমি কাস্টমস, সিকিউরিটি পুলিশকে অতিক্রম করে বিমানবন্দরের হলঘরে ফিরে এলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি মাধবন নায়ার।

মাধবন নায়ারকে আপনারা নিশ্চয় ভুলে যাননি। সেই মাধবন নায়ার, ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ভারতবর্ষে গোল্ডস্মাগলিং বন্ধ করার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যে এসেছেন।

বেরুট বিমান বন্দরে সেদিন মাধবন নায়ারকে দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নায়ার! তুমি এখানে?

কেন আমি কী আর বিমানবন্দরে আসতে পারিনে? নায়ারের কন্ঠে অনুনয়ের সুর ছিলো। আমি একটু লজ্জা পেলাম। তাই অপ্রতিভ হয়ে বললাম: না, সে কথা বলছিনে। কিন্তু দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ তোমায় যে বিমানবন্দরে দেখতে পাবো এ কিন্তু আমি আশা করিনি।

হ্যাঁ, দীর্ঘদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তুমি আমার খোঁজ করোনি বটে কিন্তু আমি তোমার খবর রেখেছি। যাক্ আজ অতীতের কথা বলে লাভ নেই। আজ তোমায় শুধু ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ কিসের জন্যে? আমার কন্ঠে ছিল বিস্ময়ের সুর।

হ্যাঁ বিক্রমাদিত্য, গোল্ডস্মাগলিং-এর রহস্য সুরাহা করতে তুমি আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছ। তোমার সাহায্য না পেলে আমি কখনই এই গোল্ড-স্মাগলারদের ধরতে পারতাম না।

কার কথা বলছো নায়ার? আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

মালকানি। গোল্ডস্মাগলার মালকানি। বহুদিন থেকে ওর উপর আমাদের নজর ছিলো। আজ ওকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ পেলাম।

গ্রেপ্তার! মালকানি তো এইমাত্র প্লেনে করে বোম্বাই চলে গেলো। আমি জবাব দিই।

তাইতো আমি চেয়েছিলাম বিক্রমাদিত্য। এই প্লেন গিয়ে কোথায় থামবে জানো? সোজা বোম্বাইতে। আর ঐ যে প্যাকেটটি তুমি মালকানির হাতে তুলে দিলে ওর ভেতর কী আছে জানো? কোকেন। তোমার বান্ধবী আর তুমি গিয়ে দামাস্কাসের বাজার থেকে নিয়ে এসেছ। আর ওর সুটকেসে আছে ফরেইন কারেন্সী এবং সোনা। এবার কল্পনা করো বোম্বাই-এর কাস্টমস এই সমস্ত খবর প্লেন পৌঁছবার আগে জানতে পারবে। হয়তো তার পরবর্তী কাহিনী আর বিস্তৃত করে বলতে হবে না। তুমি অনুমান করতে পারো—

আমি স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইলাম। কী করে মনের কথা প্রকাশ করবো বুঝতে পারিনি। হয়ত আমার মনের কথা নায়ার বুঝতে পারল। বলল আজ দীর্ঘদিন ধরে এই বেরুট নগরীতে গোল্ডস্মাগলিং চলছে। এই স্মাগলিং-এর আর কতোটা ধরা পড়ে। কাস্টমসের নজর এড়িয়ে কতো সোনা দেশের ভেতর আমদানী হয় তার হিসেব নিকেশ নেই। কিছুটা ধরা পড়ে। কী করে ধরা পড়ে তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ তুমি পেলে। থাক্ এ ব্যাপারে শুধু মালকানিকে ধরলে চলবে না। ওর অন্যান্য সহকর্মীদেরও ধরা চাই।

আমি প্রশ্ন করি—তুমি কী বলতে চাও এই বেআইনি সোনা আমদানীর ভেতর আরো অনেক ভারতীয় জড়িত আছে!

নিশ্চয় বিক্রম। এ ব্যাপারে শুধু বিদেশীরা নয়, ভারতীয়রাও বিশেষ ভাবে

সংশ্লিষ্ট। বিদেশীরা দেশের ভেতর সোনা নেয়, ভারতীয়রা এইসব মাল বিক্রী করে। এইসব কাজের পুরো হিসেব নির্দেশ দিতে গেলে আমার আজকের কাহিনী শেষ হবে না। শুধু সংক্ষেপে বলতে পারি এ কাজ একজনার নয়, বহুজনার। এর পেছনে আছে মস্তো বড়ো গ্যাংগ। যাক, এবার চলো সেই গ্যাংগের সন্ধান নিতে মালকানির বান্ধবীর কাছে।

বান্ধবী নয় স্ত্রী—আমি সংশোধন করে বলি।

তুমি যাকে স্ত্রী বলে জানো আমাদের খাতায় তার পরিচয় শুধু বান্ধবী বলে। বিয়ে ওদের কখনই হয়নি, এবং হবার কোন সম্ভাবনা ছিলোও না। গোল্ডস্মাগলিং কাজের জন্যে সুন্দরী মেয়ের প্রয়োজন। কারণ কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিতে হয়। সুন্দরী ললনা ছাড়া এসব কাজ কখনই হয়না।

লায়লার জীবনে বিয়েটাই সবচাইতে বড়ো নয়। স্মাগলিং-এর কাজের জন্যে মালকানির লায়লাকে প্রয়োজন ছিলো। তাই ওদের বন্ধুত্ব। যাক্ কী করে বন্ধুত্ব হয়েছিল সেইটে লায়লার মুখ থেকে শোনা যাবে। চলো—। নায়ার যাবার উপক্রম করল।

নায়ারের কথাগুলো আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। মালকানি বা লায়লার সঙ্গে মিশবার আগে কখনই ভাবিনি যে এদের জীবনের পশ্চাতে এতো রহস্য লুকিয়ে আছে।

উপরের হলঘরে লায়লা আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। আমাকে দেখে একটু ব্যস্ত হয়ে বলল—কী খবর? মালকানির দেখা পেলে? দিয়েছ প্যাকেটটা? অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলল।

আমি জবাব দেবার আগেই মাধবন নায়ার বলল—খবর বিশেষ সুবিধের নয় মিস—

মিস লায়লা—আমি নায়ারকে লায়লার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

লায়লার মুখ শুধু গম্ভীর নয়, শুকিয়ে গেলো।

আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে মিস লায়লা। আপনার বন্ধু আর কয়েক ঘন্টা বাদেই বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হবে। যদি তাকে সাহায্য করতে চান তবে আমাকে সব কথা খুলে বলুন।

গ্রেপ্তার? লায়লার প্রশ্নে ছিলো উত্তেজনার সুর।

গ্রেপ্তার এখনও করা হয়নি কিন্তু বোম্বাইতে পৌঁছা মাত্র গ্রেপ্তার করা হবে। এখান থেকে বোম্বাই সাড়ে পাঁচ ঘন্টার সফর। মালকানির যাত্রার খবর আমি এক্ষুনি তার করে দিচ্ছি। প্লেন পৌঁছবার আগেই বোম্বাইর কাস্টমস আমাদের তার পেয়ে যাবে। কল্পনা করে দেখুন। মাল সমেত মালকানি প্লেনে বসে আছে। এখন ওর আর পালাবার পথ নেই।

মালকানির কথায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। লায়লাও ভয় পেয়েছিলো কিন্তু আমার মনে হলো লায়লার ভয় বা বিস্ময় ক্ষণিকের। নিজেকে সে সামলে

নিয়েছে। তাই এবার একটু ম্লান হেসে বলল—এবার শুনি আপনার জন্যে কী করতে হবে?

কথাগুলো মাধবন নায়ারকে উদ্দেশ্য করে বলা।

বেশী কিছু জানতে চাইনে। শুধু বলুন, আপনার দলের সঙ্গী সাথী কারা?

প্রশ্নটা যতো সহজে করলেন, অতো সহজে জবাব দিতে পারবোনা। আর ধরুন যদি আপনার কথার কোন জবাব না দিই? তাহলে কী হবে?

জবাব দিলে ভালো করবেন। হয়তো বন্ধুকে জেলের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। কারণ আমরা দলের নেতার সন্ধানে আছি। সামান্য চুণোপুঁটীর দরকার নেই। প্রয়োজন হলে আমরা মালকানিকে সরকারের সাক্ষী করে রেহাই দিতে পারি।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো লায়লা। তারপর আস্তে আস্তে বলল—কিন্তু আমার সব কথাতো বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যায়না। চলুন কোথাও গিয়ে বসি।

ঘড়ির পানে তাকায় নায়ার। প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করল। বলল—বোম্বাইর কাণ্টমসে আমাকে খবর দিতে হবে।

কিন্তু আমি নায়ারের কথায় বাধা দিই। বলি—লেট আস গো টু এ রেস্তোরাঁ। আর টেলিগ্রাম করার যথেষ্ট সময় পাবে নায়ার। প্লেন বোম্বাইতে পৌঁছুবার এখনও বহু দেরী। আর আমাদের বৈঠক হবে ঘন্টাখানেকের জন্যে। ডু নট প্রটেষ্ট।

এরপর মাধবন নায়ার আর আপত্তি করতে পারলনা। আমরা গিয়ে 'রৌসের' সিন্দবাদ রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম।

* * *

রাত প্রায় নটা।

জনতার কোলাহলে 'রসে' গিস্ গিস্ করছে। এই নগরীর এই জীবন। দিনের আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কাফে জনতার কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠছে।

এই যে সিন্দবাদ রেস্তেরাঁয় আপনাদের নিয়ে এসেছি এইখানে বসে আপন মধ্যপ্রাচ্যর রাজনৈতিক সামাজিক এবং প্রেমের সমস্ত কাহিনী শুনতে পারবেন। পারীর অনুকরণে মধ্যপ্রাচ্যেও কাফে নিয়ে জীবন গড়ে উঠছে।

আপনি সাংবাদিক। টাটকা তাজা খবর আপনার চাই। মিশেল আফ্লাক বা প্রিন্স তালাল কিংবা নায়ারের সঙ্গে আপনার দেখা করতে হবে। এক্সক্লুজিভ ইন্টারভিউ চাই। সিন্দবাদ রেস্তোরাঁয় বসে আপনি ইন্টারভিউর বন্দোবস্ত করতে পারবেন। একটু ধৈর্য ধরে যদি বসে থাকেন তবে মিশেল আফ্লাক বা প্রিন্স তালালের সঙ্গে দেখাও করতে পারেন।

আপনি স্পাই অর্থাৎ গোয়েন্দা। মধ্যপ্রাচ্যের কোথায় কী ঘটছে সেকথা জানার জন্যে আপনার সরকার আপনাকে টাকা দিচ্ছে। আপনি জানেন এ কাজের জন্যে বেরুট সর্বোৎকৃষ্ট। তাই লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আপনি বীমার দালাল কিংবা ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ পরিচয় দিয়ে খবর সংগ্রহ করছেন। এই সিন্দাবাদ রেস্তোরাঁয় আপনি দু'ঘন্টা কাটালেই আপনার সব খবর মিলে যাবে।

কী করে তার একটু আভাষ দিই।

প্রতিদিনই আপনি সিন্দাবাদ রেস্তোরাঁর চত্বরে বসে কফি পান করছেন। আপনি সতর্ক গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য উৎসুক। আপনি জানেন যে এই রেস্তোরাঁয় কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসছে। তাদের সঙ্গে আপনি আলাপ করতে চান। আপনি জানতে চান বাগদাদ বিপ্লবের কাহিনী কিংবা জর্ডনের আভ্যন্তরীণ ঘটনা। রেস্তোরাঁর বয়কে ডাকুন। জিজ্ঞেস করুন মোনা ফেরজিলি কিংবা এলিয়াস সোলের কথা। ব্যস, এই দুজনের সঙ্গে যদি আপনি আলাপ করতে পারলেন তবে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়ে গেলো।

এবার তাদের টেবিলে গিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসুন। টার্কিস কফির পেয়ালা নিয়ে তাদের গল্প শুনুন। শুনতে পাবেন বাথ পার্টি কী করে নাসেরের সঙ্গে লড়াই করছে, ইরাকের তেল কোম্পানীকেও কিভাবে হটানো যায় কিংবা সৌদি আরবিয়ার ভেতর কী করে বিপ্লব সুরু করা হবে, ইয়েমেনকে হাতিয়ার যোগান দিচ্ছে পাকিস্থান। সেই হাতিয়ার আসছে বিদেশ থেকে। এ খবরটা আপনার কাছে বিশেষ আবশ্যকীয়। তাই আপনি হুসেন মাসজুবের প্রতীক্ষা করলেন। আরব ন্যাশনালিস্ট দলের সদস্য নাসেরের সাগরেদ এই হুসেন মাসজুব। ঐ অঞ্চলে কী ঘটছে সবই তার নখদর্পনে। অতএব সমস্ত খবর আপনার জানা হয়ে গেলো।

* * *

মিশেল আফ্লাক বা প্রিন্স তালালের সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়েছিলো। শুধু পরিচয় নয়, হৃদ্যতাও হয়েছিলো। কিন্তু সে কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণী দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। বারান্তরে বলা যাবে। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে নেয়া দরকার যে সিন্দবাদ রেস্তোরাঁয় এলে আপনি আরব রাজনীতি বা আরব নেতাদের এড়াতে পারবেন না।

'রসে' সমুদ্রতটে সিন্দবাদ রেস্তোরাঁ। সমস্ত এলাকা আলোয় উদ্ভাসিত, লোকজন আর গাড়ীর ভেঁপুতে এ অঞ্চল মুখরিত।

ক্লান্ত দেহমন নিয়ে আমরা সিন্দবাদ রেস্তোরাঁয় গিয়ে পৌছলাম। দেহের ক্লান্তি দূর করার জন্যে হুইস্কীর হুকুম দেওয়া হলো। মনের তৃষ্ণা মেটাবার

জন্যে লায়লা এবং মাধবন নায়ার তাদের আলাপ আলোচনা সুরু করল।

সেদিনকার আলাপ আলোচনার সঠিক বিবরণী আমি আপনাদের দিতে পারব না। শধু যেটুকু স্মরণ আছে তার কিছু আভাষ দিতে পারি।

আত্মপরিচয় দিয়ে মাধবন নায়ার বলল—আমার পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত। আমি ভারতসরকারের সামান্য কর্মচারী। লোকের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং বেআইনী কাজকে বাধা দেওয়া আমার কাজ। বলতে পারেন যে আমি গোল্ডস্মাগলারের দুশমন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কিন্তু এই কাজের জন্যে আপনার অস্তিত্ব আমার অজানা ছিলোনা।

নায়ারের কথার কোন জবাব প্রথমটায় লায়লা দিলনা। মৃদু হাসল। হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে নাড়াচাড়া করল। তারপর নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল। বলল—অর্থাৎ মানুষের জীবনকে অসুখী করাই আপনার কাজ।

লায়লার কথার কোন প্রতিবাদ করল না নায়ার। কিংবা রাগ প্রকাশ করল না। বরং সহজ কণ্ঠে বলল—না, ভুল বললেন। মানুষের জীবন যাতে সহজ সরল হয় সেইটে আমার কাজ। কিন্তু যাক, এবার বলুন আপনার কাহিনী।

কোন কাহিনী? লায়লার প্রশ্নে কোন দ্বিধা বা জড়তা ছিলোনা।

এই গোল্ডস্মাগলিং আর স্লেভ-ট্রেডিং-এর বিচিত্র কাহিনী। শুনেছি এ অঞ্চলে মেয়ে বেচাকেনা দৈনন্দিন হয়ে থাকে। আর এইসব মেয়েদের দিয়ে সোনা আমদানী-রপ্তানী করা হয়।

তার প্রমাণ হলাম আমি—জবাব দিল লায়লা। এ জবাবে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনি। তাই দুজনেই একটু হতবাক হয়ে লায়লার মুখের দিকে তাকালাম। লায়লা হেসে জবাব দিল, বিশ্বাস হচ্ছে না? হ্যাঁ, আমি হলাম স্লেভ-গার্ল, যার কথা আপনারা বইতে পড়েন, সিনেমাতে দেখেন। আজ এই সিন্দবাদ রেস্তোরাঁয় বসে এই মুখরোচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আনন্দ অনুভব করবেন কিন্তু যাদের জীবন নিয়ে এই ব্যবসা চলে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে দেখেছেন কী? না, ভাবেন নি। ভাবতে পারেন না। কারণ তাদের জীবনের যেটুকু আপনাদের আনন্দ দেয় সে হলো তাদের দেহের লেন-দেনের ব্যাপার। তাদের হৃদয়ের দুঃখ আপনাদের নাড়া দেয় না। আপনারা ভাগ্যবান। স্লেভ গার্লের জীবনের সম্মুখীন তো কখনই হননি।—লায়লা এবার একটু চুপ করে। কিন্তু এ নিস্তব্ধতা স্বল্প কালের। আবার তার কাহিনী সুরু হলো। বাইরের জনতার কোলাহল, মোটরের তীব্র গর্জন আমাদের আলোচানায় কোন বাধা দেয়নি। আমরা রেস্তোরাঁর একপ্রান্তে বসেছিলাম। রেস্তোরাঁর ভেতর কে এলো কে গেলো তার নজর রাখিনি।

লায়লা বলতে লাগল—আমি লায়লা, ডোলচা ভিটার নাইট ক্লাবের নর্তকী সৌদী আরবিয়া সাম্রাজ্যের এক শেখের ক্রীতদাসী। বিশ্বাস করতে একটু সঙ্কোচ লাগবে। কিন্তু আপনারা যদি আমার সঙ্গে সৌদী আরবিয়া সাম্রাজ্যে আসে,

তবে বুঝতে পারবেন যে আমার এই কাহিনীর কতোটুকু সত্যি, কতোটুকু মিথ্যে।

লায়লার কথায় বাধা দিল নায়ার। বলল—কিন্তু আমি শুনতে চাই গোল্ড স্মাগলিং-এর কথা।

নায়ারের কথা শুনে লায়লা বলল—প্রথমে কামিনী তারপর কাঞ্চন একটু ধৈর্য ধরুণ নায়ার সাহেব। সবই শুনতে পাবেন…

* * *

বালির দেশ, হজরত মুহম্মদের জন্মভূমি সৌদী আরবিয়ায় গিয়েছেন কখনও? যাননি? আসুন না আমার সঙ্গে। আপনাকে আমি সৌদি আরবিয়ার রাজধানী রিয়াদে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু মক্কা-মদিনার দ্বার আপনার জন্যে বন্ধ। কারণ আপনি মুসলমান নন। যারা ধর্ম করতে যায় একমাত্র তাদেরই ওখানে যাবার অনুমতি মিলবে। লুকিয়ে যাবার কোন পথই নেই। ধরা পড়লে সে কথা চিন্তা করবার সুযোগ পাবেন না। কেন, তার কারণ আমার এই কাহিনীর আখেরেই পাবেন। মক্কা-মদিনা, আর জম-জমার জল কিংবা কাবা হলো এ দেশের জীবনের একটা স্তর।

আপনি রিয়াদের রাস্তায় মুসাফির। হালে বিদেশ থেকে ঐ অঞ্চলে গিয়েছেন। সবই আপনার কাছে নতুন লাগবে। ভেবেছিলেন পাশ্চাত্য নগরীর জাঁকজমক দেখতে পাবেন। সিনেমা, নাইট ক্লাব, পিসকিন, ভুল করেছেন। মনে রাখবেন যেদিন আপনি সৌদি আরবিয়ার বুকে পা দিয়েছেন সেদিন থেকেই আপনি এক শতাব্দী পেছনে চলে গেছেন। অর্থাৎ আপনার যুগ বিংশ শতাব্দী নয় আপনি ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক।

ইসলাম ধর্মের সব চাইতে রক্ষণশীল সম্প্রদায় হলো ওহাবী সম্প্রদায়। সৌদি আরবিয়া হলো ওহাবীদের রাজ্য। এ দেশে জীবন বয়ে যায় পবিত্র কোরাণের নির্দেশে। ওহাবীদের যদি ভালো করে জানতে চান সৌদী আরবিয়ার অভ্যন্তরে আপনাকে আসতে হবে।

আপনি জানেন ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? আবদুল ওয়াহেব। চিরকালই ধর্মের ভেতর দল গঠন করতে হলেই বেগ পেতে হয়। আবদুল ওয়াহেবকে তার কাজ করতে কম বেগ পেতে হয়নি।

আবদুল ওয়াহেবের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন সৌদী আরবিয়ার সম্রাট। সম্রাটের দৌলতে ওহাবীদের প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তেলের রাজ্য সৌদী-আরবিয়া। এ-রাজ্যের আসল মালিক হলো আমেরিকান তেল কোম্পানী—আরামকো। এ দেশ চলে তেলের টাকায়।

* * *

জানতে চাইবেন এই তেল যাকে নিয়ে এতো লড়াই যুদ্ধ, জিনিষটি কী এবং কোথা থেকে আসে।

প্রথমতঃ আমরা তেলের কাজকে তিন অংশে ভাগ করব। কাজের প্রথম অংশ হল Upstream অর্থাৎ তেলের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার করা। কাজের দ্বিতীয় অংশ হল Midstream অর্থাৎ অশোধিত তেল ট্যাঙ্কার পাইপলাইনের সাহায্য নিয়ে রিফাইনারীতে নিয়ে যাওয়া। কাজের তৃতীয় অংশ হল Down-stream অর্থাৎ তেলকে শোধনাগারে বিভিন্ন টেম্পারেচারে গরম করে জ্বাল দেওয়া এবং শোধন করা, বাজারে পাঠানো। এমন কী রাস্তার পাম্পগুলিতে তেল পাঠান হল তৃতীয় ধাপের কাজ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই যে তেল জিনিষটি কী?

তেল জৈব অশোধিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পৃথিবীর বহু পরিত্যক্ত জিনিস প্রাণী, গাছ, পাথর হাজার হাজার বছর ধরে ভূগর্ভে পড়ে আছে। সাধারণতঃ এই সব জৈব পদার্থ সমুদ্র গর্ভে, সমুদ্রতটে কিংবা লেকের কাছে মাটির নিচে পড়ে আছে। ঐসব জৈব পদার্থকে অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন হিসাবে পাওয়া যায়। মাটির চাপ, ভূগর্ভের উত্তাপে এই জৈব পদার্থগুলি রন্ধন হয়। এই রান্না থেকে পাওয়া যায় হাইড্রোকার্বন এবং প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস। প্রাকৃতিক তেল বিন্দু বিন্দু কণিকা হিসাবে জলীয় পদার্থের মতো ভাসতে থাকে। পরে এরা মাছের মত এক সঙ্গে এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতে থাকে। এই সব জলীয় পদার্থ মাটির কোন একটা স্তরে আটকা পড়ে। মাটির এই স্তরের একদিকে থাকে পাথর অপর দিকে নোনা জল। এই নোনা জল নিচ থেকে এক চাপ সৃষ্টি করে এবং অশোধিত তেল ধাক্কা দিয়ে ঝর্ণাধারার মত মাটির উপরে চলে আসে। পরে এই অশোধিত তেল বিভিন্ন টেম্পারেচারে জ্বাল দিয়ে শোধন করা হয়।

বিচিত্র দেশ এই সৌদি আরবিয়া, কিন্তু আরো বিচিত্র এ দেশের নাগরিকের জীবন। তেল আছে, তাই আছে অঢেল টাকা। আপনি ভাবছেন দেশের সবাই বুঝি মার্সেডিজ, ক্যাডিলাক গাড়ী হাঁকাচ্ছে। কিন্তু ভুল করলেন। মুষ্টিমেয় লোক এ তেলের টাকা পাচ্ছে। বাকী যাদের দেখছেন তারা গরীব।

সৌদী আরবিয়ায় আসবেন তো হাওয়াই জাহাজ করে রিয়াদে আসতে পারেন কিংবা জাহাজ করে মুকালা বা জেদ্দা বন্দরে। এই যে মুকালা বন্দরের নাম করলাম, জাহাজঘাটা বলে যার পরিচয় দিলাম, তার আকৃতি দেখলে বিশ্বাস করবেন না যে এ কোন বন্দর। কিন্তু এ বন্দরের নামডাক আছে। প্রতি দেশ থেকেই মুকালায় এসে জাহাজ থামে। ডিঙ্গি করে মাল নামানো হয়। আর এ বন্দরের আর একটা খ্যাতির কারণ হলো মাছের জন্যে।

বড়ো বন্দর জেদ্দায় পা দেবার আগে সতর্ক হবেন। কী জিনিস নিয়ে নামছেন তার উপর নজর রাখুন। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে হাঙ্গামায় পড়তে হবে। সৌদী আরবিয়ায় ফটো তোলা নিষেধ। ছবি তুলবার আগে সরকারের হুকুম নিতে হবে। বিনা হুকুমে ফটো তুলে ধরা পড়লে তার কঠোর সাজা।

ভাবছেন, কি সাজা ? বেশ এবার তার কিছুটা নমুনা দিই।

শুক্রবার, জুম্মাবার, নামাজের পরে আপনি জেদ্দা সহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন শহরের মাধাখানে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। কী হবে গো ? কাউকে হয়তো শুধালেন। চোরের শাস্তি হবে। অপরাধীর শাস্তি দিনে-দুপুরে, প্রকাশ্য দিবালোকে হয়। কথাটা আপনি বিশ্বাস করেন নি। আপনি নিরুপায় নিজের চোখে যা দেখছেন সে কথাতো আর অবিশ্বাস করা যায় না। শুনতে পেলেন অপরাধীকে বেত মারা হয়। প্রতি শুক্রবার এ নাটক হয়ে থাকে। এখানে কাজীর বিচার নেই। দোষ করেছেন তো বেত মারা সুরু হয়ে গেলো। চুরি করেছেন তো হাতকাটা হয়ে গেলো। অবশ্য অপরাধীর যদি টাকা থাকে কিংবা পরিচিত কেউ থাকে তবে বেত মারা হবে বটে কিন্তু গায়ে লাগবে না।

যদি মনে করেন এ বেত মারা নিয়ে হৈ-হল্লা হবে, এজিটেশন হবে, কিংবা প্রসেশন। না, এ জিনিসটা সৌদী আরবিয়ার সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। কোরাণের নির্দেশে জিনিস চুরি করলে চোরের ডান হাত কাটা হয়। আপনি ভাবছেন এ বুঝি নিছক উপন্যাস। না কোরাণের এই নির্দেশ সৌদি আরবিয়ায় অক্ষরে অক্ষরে মানা হয়। একটুখানি ধৈর্য ধরে এই জনতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখতে পাবেন চোরকে নিয়ে আসা হলো। তারপর তীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্যে তার ডান হাত কাটা হলো আর সবাইকে সতর্ক করা হলো চুরি করার সাজা কী? অবশ্য যার হাত কাটা হলো তাকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। এ রেওয়াজ শুধু জেদ্দায় প্রচলিত আছে। দেশের অন্য কোন অঞ্চলে যদি কারও হাত কাটা হলো তার ভাগ্যে আর হাসপাতাল দেখা হবে না।

গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করলেন। হয়তো লোকটা মরে গেলো। আপনার সাজা প্রাণদণ্ড। রেহাই পেতে হলে ঢালুন পনের হাজার রিয়াল। তাই সৌদী আরবিয়ায় কিংবদন্তী আছে যে, গাড়ীর লাইসেন্স নেবার আগে কিংবা কোথাও সফরে যাবার আগে পকেটে পনের হাজার রিয়াল রাখবেন। নতুবা বেঘোরে প্রাণটা যাবে। আর টাকা যদি না দিতে পারেন তবে গর্দান দিন।

সৌদী আরবিয়ায় বারবনিতার চিহ্ন পাবেন না। আইনের নিষেধ। আপনার মেয়েমানুষের প্রয়োজন কোন মেয়েকে কিনে হারেমে পুষুন। একটা নয়, দুটো নয়, এনতার মেয়ে পুষতে পারেন। কিন্তু বারবনিতা অসম্ভব !

এবার আসুন আমার সঙ্গে সৌদী আরবিয়ার হাটবাজারের যেখানে মেয়েছেলে বিক্রী হয়। শাকসব্জী কিংবা মাছ কেনার গল্প আপনি শুনেছেন কিন্তু মেয়েমানুষ নিয়ে দরদস্তুর করা এ কখনও আগে শোনেন নি। তাই আপনি ভাবছেন এ কী করে সম্ভব !

এইবার জানতে চাইবেন যে সব মেয়ে বিক্রী করা হয় এদের আনা হয়

কোত্থেকে ? ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলা দরকার। তাই চলুন আপনাকে এক সর্দার বরং বলতে পারেন এক স্লেভ-ট্রেডার-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

*　　　*　　　*

সর্দারের আসল পরিচয় নাই বা দিলাম। তাই নাম ভাঁড়িয়ে বললাম সালেম বিন উমর।

সৌদী আরবিয়ার মস্তো বড়ো সর্দার সালেম বিন উমর। সালেম বিন উমরের সঙ্গে আলাপ করুন। অতি সাদাসিধে সজ্জন, অমায়িক ব্যক্তি। দয়া দাক্ষিণ্য আছে। তাকে দেখে কখনই কল্পনা করতে পারবেন না যে এর আয় লক্ষ লক্ষ ডলার কিংবা এর চারটে গাড়ী আছে আর পাঁচটা বাড়ী। আর তার মেয়েমানুষের হিসেবটা নাই বা দিলাম।

সালেব বিন উমর যে মেয়েমানুষের ব্যবসা করে এ কিন্তু কখনই হলপ করে বলতে পারবেন না। আপনার সামনে উমর চাল বিক্রী করছে চিনি কিনছে। কিংবা ফাটকা খেলছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই ভেতরের কাহিনী শুনবার লোভ যদি হয় তবে চলুন সালেম বিন উমরের বাড়ীতে।

*　　　*　　　*

জেদ্দা শহরের একপ্রান্তে সালেম বিন উমরের বাড়ী। এইটে আদি বাড়ী। সালেম বিন উমরের অনেক বড়ো চক্ মিলানো বাড়ী আছে কিন্তু বিদেশী কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে বিন উমর এইখানে মোলাকাৎ করে। এইখানে বসে সে তার অতীতের স্মৃতিকে রোমন্থন করে।

আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে সালেম বিন উমর বিকেল থেকে বসে আছেন। অতি সাধারণ পোষাক। দেখলে কখনই মনে হবে না যে লোকটা কোটীপতি। আপনি তো ভাববেন পথের ভিখিরী। পরণে একটা জীর্ণ ফতুয়া, আর মাথায় একটা ফেজ।

বিন উমর তার গদীতে বসে হুঁকো টানছে। চারদিকে সাগরেদরা বসে তার কথাবার্তায় তালিম দিচ্ছে। আপনার দেশের মতোই সৌদি আরবিয়ায় হুঁকো চলে। এ অঞ্চলে প্রাচীন পন্থীরা সিগারেট না খেয়ে হুঁকো টানে। বিন উমরের গদির সামনে দুটো স্প্যানিয়েল কুকুর। ভারী আদর যত্ন এদের করা হয়। জার্মানি থেকে আমদানি। এদের পেছনে বিস্তর পয়সা ঢালা হয়।

*　　　*　　　*

সালেম আপনাকে দেখে অভ্যর্থনা করল। বলল, মরহবা কিফক ?

আপনি হেসে জবাব দেন : মবসুদ। কুল্লু কোয়ায়েস।

আপনি এবার নিজের চেয়ারটা টেনে জাঁকিয়ে বসলেন। সালেম বিন উমর প্রশ্ন করল : বিদাক আওয়ে ?

শুরুন, আনা বিদ্দি সেভন আপ। 'আপনার তেষ্টা পেয়েছে।' তাই আপান সেভন আপ বা কোকাকোলা নিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের এইটেই রীতি, কিছু পান

করতেই হবে। চা বলুন বা সরবৎই বলুন। সৌদী আরবিয়ায় আপনি সবকিছুই পাবেন কিন্তু মদ অসম্ভব।

হঠাৎ আপনাদের আলাপ আলোচনায় বাধা পড়লো। সালাম বিন উমরের সেক্রেটারী মনিবের কাছে টেলিগ্রাম নিয়ে এলো। একটা তার নুইয়র্ক যাচ্ছে, একটা লন্ডনে, একটা জার্মানীতে। এই প্রচন্ড গরমে কুকুরগুলোর শরীর ভালো যাচ্ছে না। তাদের জন্য ডাক্তারের কাছে টেলিগ্রাম করে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ এলে ব্যবসায়ের কথা হচ্ছে। একটু উঁচু গলায় যেসব কথা বলছে সে ব্যবসায়ের মধ্যে কোন খাদ নেই। কিন্তু কণ্ঠস্বর যেমনি নীচে নেমে গেলো অমনি বুঝতে পারবেন যে ভালো একটা মেয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। তারই দরদস্তুর হচ্ছে। আর এইসব মেয়ে কোথায় চালান হচ্ছে জানতে চান? কেউবা যাবে বড়ো শেখের হারেমে, কেউবা কোন ছোট শেখের বাড়ীতে কিংবা বিদেশের নাইটক্লাবে। লিডো, পিগালে যান সালেম বিন উমরের মেয়েদের দেখা পাবেন।

ভাবছেন সালেম বিন উমর কোন দেশের লোক? আরব দেশের। এই ভুল করলেন। সালেম বিন উমর বিদেশী। অল্প বয়সে এই প্রান্তে এসেছিলো ভাগ্যের অন্বেষণে। বিধাতা প্রসন্ন ছিলেন। কমলালেবুর ব্যবসায়ী বিন উমর অল্পদিনের মধ্যেই একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বলে গণ্য হলেন। বিবিধ ব্যবসা, ফল বিক্রী, লোহা-লক্কর চিনি চাল · তারপর আস্তে আস্তে মেয়ে যোগান দেবার ব্যবসা ধরলেন। শুধু কী তাই? সৌদী আরবিয়ার কোন প্রান্তে কী ঘটেছে তার পুরো খবর যদি জানতে চান তবে বিন উমরের সঙ্গে মিতালি রাখুন। ঐ যে অসংখ্য লোক, গরীব আর ধনী, পথিক আর ভিখিরী এসে সালেম বিন উমরের কাছে ধর্না দিচ্ছে তারাই এসে খবর দিচ্ছে কোথায় কী ঘটছে।

মেয়ে বেচাকেনার ব্যাপার নিয়ে সালেম বিন উমরের সঙ্গে আলাপ করুন। মৃদু হাসবে সর্দার। নিরুপায় হয়ে আপনি ওঠার ভান করুন। সালেম বিন উমর আপনাকে বাধা দেবে। তারপর তার কাহিনী সুরু করবে। হেসে বলবে: মেয়ে বেচা-কেনার ব্যবসা সহজ কাজ নয়। এ-কাজের জন্যে কী কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। সুন্দরী মেয়ে পেলেন তো তাকে ভালো দামে বাজারে ছাড়াও বেশ শক্ত কাজ। আর এই মেয়ের সন্ধানে পৃথিবীর সর্বত্রই আমার এজেন্টরা তৎপর হয়ে আছে। কোথাও একটু ভালো মেয়ের গন্ধ পেলেই তাদের পাকড়াও করার চেষ্টা করি। প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়। তারপর আর একদল আছে যাদের চুরি করে আনতে হয়। কেউ বা স্ব-ইচ্ছায় সুখের জীবনের আশায় আমার কাছে আসে।

মক্কায় হজ করতে প্রতি বছর কতো হাজার হাজার যাত্রী আসে। এইসব যাত্রীদের ভেতর সুন্দরী মেয়েও থাকে। এদের উপর একটু নজর রাখুন।

বিদেশে বিভুঁয়ে কী হচ্ছে এরা জানেনা। আপনি এদের গাইড। ব্যস, এইবার আপনার খাঁচায় পুরে ফেলুন। আর কথা নেই।

কাতার দেশ থেকে বিস্তর মেয়ে আমদানী করি। বুইরামির কাছে আল দোয়ামির বলে একটা শহর আছে। সেইখানে এনে মেয়েদের হাজির করা হয়। তারপর সেখান থেকে ওদের চালান দিই আল হাসা শহরে। যদি ভালো দাম পান তবে ছেড়ে দিন এই সব মেয়েদের। নইলে নিয়ে আসুন এদের রিয়াদের গুপ্ত বাজারে। সেইখানে নিলামে চড়ান এইসব মেয়েদের। সুন্দরী মেয়ে যদি হয় তবে পাবেন পাঁচ হাজার রিয়াল। নাবালিকা সুন্দরী তিন হাজার আর বৃদ্ধা কর্মঠ দুহাজার। পুরুষের দাম অবশ্য তিন হাজার।

আপনি ক্রেতা। যে-কোন সময় এইসব মেয়েদের যাচাই করে দেখতে পারেন। ভালো লাগলো তো রাখলেন। নইলে ফেরৎ দিন।

* * *

গল্প করতে করতে সালেন বিন উমর একটু থামবে। বিস্তর লোক তার কাছে আনাগোনা করছে। সবার সঙ্গেই দু'দণ্ড কথাবার্তা বলতে হয়। দেশের চারপ্রান্ত থেকে টাটকা খবর আসছে। কী করতে হবে তার আদেশ দিতে হবে উমরকে।

খানিকক্ষণ বাদে ভীড় একটু কমে গেলে সালেম বিন উমর আবার তার মুখ খুলবে। বলতে শুরু করবে তার কাহিনী। ইতিমধ্যে সৌদী আরবিয়ার এই বিচিত্র কাহিনী আপনাকে বিস্মিত করেছে। আপনি হতবাক. বিংশ শতাব্দীতে এই মেয়ে বেচাকেনা কী করে সম্ভব ভেবেই পাচ্ছেন না। কিন্তু আপনার মনের সংশয় দূর করবে সালেম বিন উমর।

সালেম বিন উমর হয়তো আপনার মনের কথা বুঝতে পারে। বলে, আপনি ভাবছেন এই স্লেভ-ট্রেড কী করে সম্ভব? জানেন এই অঞ্চলে সবই সম্ভব। তবে হালে নতুন সম্রাট ফৈশাল দেশে বহু পরিবর্তন করেছেন। আইনের কড়াকড়ি হচ্ছে, ব্যবসা আর চলছে না বললেই চলে। আপনি ভাবছেন এইসব মেয়েরা শুধু মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের মেয়ে। না মশায় এই সৌদী আরবিয়ার হারেমে আপনি বিস্তর ইয়োরোপীয় মেয়েও পাবেন। শুনুন তারই এক কাহিনী।

আমার বন্ধু মুহম্মদ মস্তো এক ধনী শেখের ছেলে। পড়াশুনার নাম করে পারীতে দিন কাটাচ্ছিলো। হঠাৎ সঁরবো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুইডিশ মেয়ের সঙ্গে দেখা। পরিচয় থেকেই প্রেম।

ধরে নিন মেয়েটির নাম ইসাবেলা। আসল নাম আপনাকে বলতে পারছিনে। আজও একটু খোঁজ করলে রিয়াদে এই সুইডিশ মেয়েটির দেখা পাবেন।

যাক, শেখের সঙ্গে ইসাবেলার বন্ধুত্ব নিয়ে সঁরবোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ

গুঞ্জরণ উঠলো। সুইডিশ এয়ার কোম্পানীর এক পাইলট, ইসাবেলাকে ভালো বাসতো। তার কানে এই কথদুত্বের কথা গিয়ে পৌঁছল। পাইলট এসে ইসা- বেলাকে সতর্ক করল। বলল—সৌদী আরবিয়ার শেখ। এদের হারেম ভাঁত মেয়েমানুষ। যদি নিজের জীবনকে ধ্বংস করতে না চাও তবে এই শেখের আশা ত্যাগ করো।

ইসাবেলা নাছোড়বান্দা। বলে, এই শেখকে বিয়ে করবোই করবো। নইলে প্রাণ রাখবো না।

পাইলটের কোন অনুনয়-বিনয় ইসাবেলা শুনল না। শেখকে একদিন ইসলামের রীতি অনুযায়ী বিয়ে করল।

দীর্ঘ সাত বছর বাদে একদিন বেরুট বিমানবন্দরে পাইলট তার প্লেন নিয়ে এসেছিলো পারী যাবার পথে। এই সময়ে এয়ার পোর্টের বুকস্টলে গিয়ে বই নাড়া-চাড়া করছিলো। এমনি সময় কে যেন পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকলো। বিস্মিত হয়ে পাইলট দেখে বোরখা-পরা একটি সৌদি আরবিয়ান মেয়ে তাকে ডাকছে। অতি ভয়ে-ভয়ে পাইলট গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। পরপুরুষের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলা সৌদী আরবিয়ার সমাজে বারণ। এর শাস্তি কঠোর।

মেয়েটি এবার তার বোরখার গুণ্ঠন খুলে দিল। পাইলট বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখে ইসাবেলা। সে স্তম্ভিত হতবাক। বেশ খানিকক্ষণ সময় কোন কথা বলতে পারল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল—ইসাবেলা তুমি!

হ্যাঁ আমি। আমাকে এভাবে দেখবে কখনই কল্পনা করোনি।

না, পাইলট মৃদুস্বরে জবাব দেয়।

আমিও ভাবিনি যে আমার জীবনের ধারা এইভাবে পাল্টে যাবে। জানো আমি কে? আই এ্যাম এ স্লেভ-গার্ল।

স্লেভ-গার্ল!—কোন প্রকারে পাইলট এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করল। ইসাবেলার কথা কোনমতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

হ্যাঁ। শেখের হারেমে আমি থাকি। আমার স্বামীর আরো স্ত্রী আছে। শুনেছি এবৎসরও নাকি তিনি আর একটা বিয়ে করবেন।

তুমি চলে এসো ইসাবেলা—পাইলটের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ছিলো।

না, এ সম্ভব নয়। ভুলে যেও না আমার একটি সন্তান আছে। আরব সমাজে জ্যেষ্ঠ সন্তানের দাবী সর্বাগ্রে। দু'দিন বাদেই আমার ছেলে আমার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। আমি সেদিনেরই আশায় বুক বেঁধে আছি।

পাইলট কোন জবাব দিতে পারল না।

* * *

নিস্তব্ধ হয়ে আপনি সালেম বিন উমরের কাহিনী শুনছেন। বিস্মিত হবেন

জানি, কিন্তু মনে রাখবেন এই ধরনের ঘটনা রিয়াদ-জেদ্দায় প্রতিদিনই ঘটছে—এই বলে লায়লা আবার খানিকক্ষণ চুপ করল।

আমি এবার প্রশ্ন করি: কিন্তু কৈ তোমার জীবনের কোন কিছুতো বললে না ?

বলছি বিক্রমাদিত্য। হয়তো ভাবছেন ডোলচা ভিটার নর্তকী লায়লা বানুর সঙ্গে এই কাহিনীর কী সম্পর্ক।—আগেই তো বলেছি আই এ্যাম এ স্লেভ-গার্ল।

ঐ যে মুকালা বন্দরের কথা আপনাকে বলেছি, ঐ বন্দরেই আমার জন্ম। বাল্যকাল আর শৈশব ঐখানেই কাটলো। আমার বাবা মা ছিলো না। এক বোন আর আমি। আমার কাকার কাছে মানুষ হয়েছি আমি।

একদিন আমাদের নিয়ে কাকা কায়রোতে চলে এলেন। কায়রোতে আমাদের নতুন আস্তানা হলো। সেখানকার স্কুলেই আমরা ভর্তি হলাম।

কল্পনা করতে পারেন আমার মতো মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছে। তাই স্কুলের জীবন আমার কাছে বিচিত্র লাগতো। এই স্কুলের মারফৎ অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমরা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

আমার বয়স যখন ষোলো তখন একদিন কানাঘুষোয় শুনতে পেলাম যে, আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কার সঙ্গে জানিনে। একদিন কাকা বললেন, আমার ভবিষ্যৎ স্বামী একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী।

শৈশব থেকেই আমি ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখেছি। জানেন তো, আমার মতো কিশোরী মেয়েরা ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আকাশকুসুম রচনা করে। তাই কাকার প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিনি। আর আপত্তি করলেই বা কী হতো ? আমাদের কথার কী মূল্য আছে ?

পাঁচ হাজার টাকায় আমার স্বামী আমাকে কাকার কাছ থেকে কিনে নিলেন।

বিয়ের মাস তিনেক বাদে আমি বুঝতে পারলাম যে, যাকে আমি বিয়ে করেছি তিনি আমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার জন্যে বিয়ে করেননি। আমাকে বিয়ে করার মুখ্য উদ্দেশ্য রিয়াদের বাজারে চড়া দামে বিক্রী করা।

বিস্মিত হবেন আমার এই কথা শুনে। কিন্তু এ অঞ্চলে এ কাহিনীতে বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব নেই। এই তো সেদিনকার এক ঘটনা। এক ভদ্রলোক তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পারী থেকে ফিরে আসছিলেন। প্লেনে এক সৌদী আরবিয়ার শেখের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভদ্রলোকের বউকে শেখের ভারী ভালো লাগলো। জিজ্ঞেস করল—তোমার বউকে বিক্রী করবে ?

আপনি ভাববেন যে ভদ্রলোক লজ্জিত বা রেগে গেছেন। না, এ অঞ্চলে ওসব লজ্জার বালাই নেই। স্ত্রীকে বিক্রী করতে ভদ্রলোকের দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তাই জবাব দিলেন: করবো। কিন্তু এর জন্যে কুড়ি হাজার ডলার

চাই। ভেবে দেখুন টাকার অঙ্ক। কিন্তু শেখের এ টাকা দিতে কোন আপত্তি নেই। তাই চেক বই বের করে কুড়ি হাজার ডলারের চেক লিখতে বসলেন। হঠাৎ কী জানি ভাবলেন। সম্প্রতি সৌদি আরবিয়ার রাজা শেখদের টাকার ভাগ কমিয়ে দিয়েছেন। তাই অতোগুলো টাকা দিতে একটু ইতস্ততঃ করলেন শেখ। একটু ভেবে বললেন—বেশ তিনমাসের জন্যে তোমার বউকে ভাড়া দেবে?

আরব ভদ্রলোক পাকা ব্যবসায়ী। বউকে ভাড়া খাটিয়ে এতগুলো টাকা রোজগারের লোভ সামলাতে পারলেন না। বললেন, দেবো। কিন্তু এর জন্যে দশ হাজার ডলার চাই।

শেখ এবার কোন আপত্তি করলেন না। দশ হাজার ডলারের চেক লিখে দিলেন।

* * *

আমার গল্প শুনে লজ্জা পাচ্ছেন বিক্রমাদিত্য? কিন্তু আপনাকে এ গল্প বললাম কারণ এ অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতি, জীবনপ্রবাহের নমুনা দেবার জন্যে। কিন্তু এবার আমার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। বিয়ের মাস তিনেক বাদে শুনতে পেলাম যে, আমাকে আমার স্বামী ত্রিশ হাজার রিয়ালে এক শেখের কাছে বিক্রী করেছেন। ভেবেছেন, আপত্তি করিনি? করেছি। কিন্তু আমার এই প্রতিবাদ কে শোনে? আমার স্বামী কী জবাব দিলেন জানেন? বললেন—তোমাকে বিক্রী করাই আমার জীবনের সর্বপ্রথম কাজ নয়। আমার প্রথম দুই স্ত্রীকে বেশ চড়া দামে বিক্রী করেছি। তুমি গেলে পর আবার বিয়ে করবো। সেই বউর বাবদ মোটা টাকা মিলবে। ভয় পেয়ো না, তোমাকে যার কাছে বিক্রী করেছি তার বিস্তর টাকা। বাড়ী গাড়ী সবই তার আমার চাইতে বেশী।

ভেবেছেন নতুন মণিবের কাছে এসে আমার হারেমে স্থান হলো? না বিক্রমাদিত্য, নাইটক্লাবে কাজ করার জন্যে আমাকে বেরুটে নিয়ে আসা হলো। থাকা খাওয়া পোষাকের অভাব নেই। শেখ আমাকে পছন্দ করতেন তার কারণ তার নাইটক্লাবের প্রধান আকর্ষণ ছিলাম আমি।

ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবে আমার মালকানির সঙ্গে পরিচয় হল। কী করে আমাদের পরিচয় হলো তার আভাষ আপনাকে আগেই দিয়েছি। মালকানির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শেখ আমাকে কোন বাধা দেননি। তার একটা কারণ ছিলো।

শেখ নাইটক্লাবের ব্যবসা করতেন বটে কিন্তু তার আসল ব্যবসা ছিলো গোল্ড-স্মাগলিং এবং বেআইনী মাদক দ্রব্য চালান দেওয়া। তিনি ছিলেন সালিম বিন উমরের এজেন্ট। এই বেরুট নগরী থেকে বিভিন্ন প্রকারের মাদক দ্রব্য অন্যত্র চালান দেওয়া হতো।

ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবের মারফৎ শেখ তার খদ্দের পাকড়াও করতেন। এই

সব খদ্দেরের কাছে মাদক দ্রব্য বিক্রী করা হতো কিংবা এদের সাহায্যেই সোনা পাচার করা হতো।

ডোলচা ভিটা নাইটক্লাবে বিভিন্ন হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং জাহাজের নাবিকেরা আনাগোনা করতো। শেখ তাদের সঙ্গেই খাতির জমিয়ে নিয়েছিলো। এদের মারফতে সব বেআইনী মাল চালান দেওয়া হতো। আমার কাজ ছিলো এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো।

মালকানিকে আমাদের প্রয়োজন ছিলো। কারণ বোম্বাই ও কলকাতায় সোনা বিক্রীর জন্যে এজেন্ট দরকার। মালকানি এই সব এজেন্ট যোগাড় করতো। মালকানির সঙ্গে কী আমি প্রেমে পড়েছিলাম? না। বিক্রমাদিত্য, আমার মত স্লেভগার্লের প্রেম করার অধিকার নেই। আর আমাদের এ জীবনে কি প্রেম করা চলে? সবার সঙ্গে খাতির রাখতে হয়। লাভ ইজ এ ফরগটন ওয়ার্ড। কিন্তু তবু অস্বীকার করবো না যে, মালকানিকে আমার ভালো লেগেছিলো। তাই মালকানির সঙ্গে একত্রে থাকতে আমি কোন আপত্তি করিনি।

গোল্ড স্মাগলিং-এর কাজে মালকানি পটু ছিলো। জানিনে কী করে আপনারা ওর হদিস পেলেন। আমার কিন্তু এখনও দৃঢ় বিশ্বাস মালকানি পুলিশের হাতে কখনই ধরা দেবে না।

দিল্লীর কোন এক দূতাবাসের সঙ্গে মালকানি মিতালি রাখতো। বহু দূতাবাসের কর্মচারীরা এই স্মাগলিং-এ জড়িত, এই খবর আপনি নিশ্চয় জানেন। এরা এই কাজ করে দিল্লীতে জাঁকিয়ে বসে আছে।

কয়েকটি মেয়ে বন্ধুর মারফৎ মালকানি এদের সঙ্গে খাতির জমাত। তারপর এদের নামেই মাল দিল্লীতে নিয়ে যেতো। এদের মাল পরীক্ষা করার অধিকার সরকারের নেই। তাই এদের মাল কাস্টমসে কখনই আটক হতো না।

আগেই বলেছি, মালকানি একাজে বিশেষ দক্ষ ছিলো। ডোলচা ভিটা নাইটক্লাব উঠে যাবার পর টুরিস্ট গাইডের কাজ নিল মালকানি। সেই সূত্রেও বহুজনার সঙ্গে তার পরিচয় হলো।

শেখেরও প্রয়োজন ছিলো মালকানিকে। ভারতে গোল্ডস্মাগলিং-এর ব্যবসাটা মালকানিই দেখাশোনা করতো।

* * *

স্তম্ভিত হয়ে আমি আর নায়ার লায়লার গল্প শুনছিলাম। এ কাহিনী আমাদের কাছে আরব্য উপন্যাসের মতো মনে হলো। সৌদী আরবিয়ার বিচিত্র জীবন আর মেয়ে বেচাকেনার কাহিনী আর গোল্ড-স্মাগলিং-এর গল্প আমাকে অভিভূত করেছিলো। তাই এক মনে লায়লার কথাগুলো গিলেছি। প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি, ঘড়ির সময়ও দেখতে পাইনি।

লায়লা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে বহু প্রশ্ন জাগলো। কিন্তু আমি প্রশ্ন করার আগেই লায়লা বলল—অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার উঠি, চলুন।

লায়লার কথা শুনে নায়ার প্রায় চীৎকার করে ওঠে। বলে—সর্বনাশ, এখন যে অনেক রাত। বোম্বাই কাস্টমসকে আমার এখনও তার পাঠানো হয়নি। কোকেন আর সোনা নিয়ে মালকানি যাচ্ছে। না, এক্ষুনি আমাকে তার অফিসে যেতে হবে।

লায়লার মুখে বিদ্রুপের হাসি খেলে গেলো। ধীরে ধীরে বলল—যেয়ে লাভ নেই নায়ারসাহেব। ঘড়িতে দেড়টা বেজেছে। বোম্বাইয়ের সময় সাড়ে চারটা। আর আধঘণ্টা বাদে প্লেন বোম্বাইতে পৌঁছবে। আপনার তার পৌঁছতে আর চারঘণ্টা – টু লেট। এবার আর মালকানিকে গ্রেপ্তার করা হলো না।

একটা করুণ আর্তনাদ করে উঠলো নায়ার। বলল—কিন্তু মালকানিকে আমরা গ্রেপ্তার করবই। সে কাস্টমসের বাইরেই হোক বা শহরেই হোক।

এ কখনই সম্ভব হবে না নায়ারসাহেব। আমরা বেরুটে যাকে মালকানি বলে জানি বোম্বাইতে তার নাম ভিন্ন। এছাড়া দুটো পাশপোর্ট আছে মালকানির। আপনি কাকে ধরবেন?

এ কথার কোন জবাব দেওয়া চলেনা। তাই আমরা চুপ করে রইলাম। আমাদের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল লায়লা। বলল—আই এম এ স্লেভগার্ল। পুরুষ কী চায় আমি জানি বিক্রমাদিত্য। ইচ্ছে করেই আমি আপনাদের গল্পে জমিয়ে রেখেছি যাতে নায়ারসাহেব বোম্বাইতে টেলিগ্রাম করতে না পারেন। দুঃখের বিষয় বোম্বাইয়ের কাস্টমস জানতে পারল না যে, মালকানি সোনা নিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন লায়লার বুদ্ধির তারিফ না করে পারিনি। লায়লার কাছে আমাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। মেয়েমানুষের কাছে পুরুষের পরাজয়, ভাবতেও লজ্জা লাগে।

এবার যাবার জন্যে লায়লা প্রস্তুত হলো। দরজার কাছে গিয়ে বলল—বিক্রমাদিত্য, আমরা মেয়েমানুষ, ইমোশনাল, তাই বাস্তব জীবনে অনেক ভুল করি। আপনারা পুরুষ তাই আপনাদের দম্ভ। তবু আপনারা স্ত্রীবুদ্ধির কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। ধন্যবাদ, জীবনে আর কখনও দেখা হবে কিনা জানিনে। বাট ডু নট ফরগেট দ্যাট এ স্লেভগার্ল হ্যাজ এ ব্রেণ।

লায়লা চলে গেলো। আমরা সত্যিই বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

*　　　*　　　*

তারপর হঠাৎ একদিন বেরুটের এক ককটেল-পার্টিতে কল্যাণী সেনের সঙ্গে আমার দেখা হলো।

কল্যাণী সেন হল আমার পুরাতন বান্ধবী, প্যারীতে আমাদের পরিচয়,

হয়েছিলো। দীর্ঘকালের বিচ্ছেদে আমরা একে অন্যকে ভুলে গিয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি যে বেরুট নগরীতে আবার আমাদের দেখা হবে।

কল্যাণী সেনের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই কিন্তু আপনার যদি মধ্যপ্রাচ্যের ডিপ্লোমেটিক সোসাইটিতে আনাগোনা থাকে তবে কল্যাণী সেনকে চিনতেই হবে। বেরুট নগরীর সম্ভ্রান্ত সমাজে আপনার ঢুকবার একমাত্র পরিচয় পত্র কল্যাণী সেনের বন্ধুত্ব। কিন্তু কল্যাণী সেনের কাহিনী বলবার আগে ডিপ্লোমাটিক সার্ভিসের কিছুটা আভাষ আপনাদের দিয়ে নিই। কল্যাণী সেন এক ডিপ্লোমাটের স্ত্রী, তাকে চিনতে হলে তার জীবনের কিছুটা জানা একান্ত আবশ্যক।

আমি জানি আপনি বৈঠকী গল্প ভালোবাসেন। তাই হয়তো ডিপ্লোমেটিক জীবনের গল্প শুনে নড়ে-চড়ে বসবেন। কিন্তু আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন যে, আরব বেদুইন শুধু মাত্র ডিপ্লোমাটের জীবনী নিয়ে রচনা নয়, গোল্ড-স্মাগলিং এবং নাইট-ক্লাবের বিস্তৃত বিবরণীও নয়, এ হলো ঐ অঞ্চলের রাজনীতির রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আর একটা কথা, ডিপ্লোমাটিক সার্ভিস না বলে আপনাকে যদি বলতাম যে গুপ্তচর বিভাগের কারু সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তাহলেও আমার এই উক্তির একটুও অত্যুক্তি হতো না। কারণ বাংলা ভাষায় আপনারা যাকে বলেন গুপ্তচর, আন্তর্জাতীয় ভাষায় তাদের বলা হয় ডিপ্লোমাট।

এবার ডিপ্লোমাটের জীবন কল্পনা করুন। ভাবছেন সুখের প্রাণ, গড়ের মাঠ। ডিনার, লাঞ্চ, সাপার, ককটেল ড্যান্স, হৈ-হল্লা। কিংবা সুন্দরী মেয়েদের দেখলে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কিংবা সস্তায় জিনিস কিনে বান্ধবীকে প্রেজেন্ট দেওয়া—এই হলো ডিপ্লোমাটের জীবন না ডিপ্লোমাটের জীবন বহু পাকে বাঁধা। তাদের সেই সুখ দুঃখের কাহিনী তো বইয়ের এই কয়েক পাতায় বলা যায় না। তাই সংক্ষেপে আমার এই কাহিনী সারতে হবে।

আপনি ডিপ্লোমাট, দামী সুট পরে মার্সিডেজ বেনজ গাড়ী হাঁকিয়ে বান্ধবীকে নিয়ে বাজারে গিয়েছেন সওদা করতে হামিদিয়ার সুকে। এইতো কিছুদিন আগে আপনিও গিয়েছিলেন এই বাজারে। লোকে গিস্ গিস্ করছে। দোকানী যেই ডিপ্লোমাট ও তার বান্ধবীকে দেখল অমনি জিনিসের দাম দ্বিগুণ করে দিল। আপনাকে আরবী ভাষায় জবাব দিল। আপনি বুঝতে পারলেন না। অথচ বান্ধবীকে অসন্তুষ্ট করতে চান না তাই বেশ চড়া দামে জিনিসটা কিনে আনলেন। কিন্তু এতো গেলো বাজারের বেচাকেনার ব্যাপার। ধরুন আপনাকে দ্য'গলের বাড়ীতে কিংবা ক্রুশ্চেভের বাড়ীতে চা খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। আপনি ফরাসী জানেন না, রাশিয়ান তো দূর ছাই। আপনি বোকার মতো বসে বসে কেক গিললেন। অথচ আপনার সহকর্মীরা দ্য'গল আর ক্রুশ্চেভের সঙ্গে এনতার গল্প করল। তাই বিলক্ষণ জানবেন যে, ডিপ্লোমাট তকমা পরবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ গোটা তিনেক ভাষা

আপনাকে জানতেই হবে। ভাষাটা জানলে বান্ধবীকে হামদিয়ার সুক থেকে সস্তায় জিনিস কিনে দিতে পারবেন আর দ্য'গল বা ক্রুশ্চেভের সঙ্গে বসে খোস গল্প করতে পারবেন।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জীবনের গতি পাল্টে গেলো। সন্ধ্যা ছ'টায় কালো লাউঞ্জ স্যুট পরে ককটেলে গেলেন। আপনার মিসেস নেই। একাই ককটেলে গেলেন। ঘরে ঢুকবার আগে গৃহস্বামী এবং গৃহিনীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। বললেন—বসোঁয়ার হাউ আর ইউ কিংবা আলেস অরদন্যুং, কুল্লু কোয়ায়েস। আপনার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো কতোদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। কথাটা আপনার কানেই বেসুরো শোনালো। কর্তা এবং গিন্নীকে আপনি এর আগে কখনও দেখেন নি। কিন্তু তবু ডিপ্লোমাটিক ককটেলে আপনাকে এ ধরনের কথা বলতে হবে।

গিন্নী এবার আপনার কথা শুনে হাসলেন। তার হাসি দেখে মনে হলো আপনি তার বহুদিনের পরিচিত। বললেন—হোয়াট এ প্লেজার। আপনি এসেছেন।

এবার আপনি ককটেলের ভীড়ের ভেতর গিয়ে পড়লেন। অথচ আপনি কাউকে চেনেন না। দাঁড়ান আপনার সঙ্গে এক ফরাসী দম্পতির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তারাও ডিপ্লোমাট।

বসোঁয়ার মাদাম, বসোঁয়ার মঁশিও-কমা তালেভু···কমা তালে ভু, সাভা। তু ভাঁ বিয়া। পারমেত মোয়া দ্য ভু প্রেজান্তে মন আমি······

এই যা, আপনার পুরো নামটা ভুলে গেছি। কিন্তু তার আগেই আপনার পানে তাকিয়ে বললাম—মঁশিও ও মাদাম বর্দো। এখানকার একজন গণ্যমান্য ডিপ্লোমাট।

আপনি মঁশিও ও মাদামের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন—যে সুই অরেজ দ্য ফেয়ার ভোতর কোনেইসান্স···

ভু পার্লে ফ্রান্সেস—মাদাম বর্দো হঠাৎ একটা অপ্রিয় প্রশ্ন করেন। আপনার একটি লাইন জানা ছিলো। আপনি ফরাসী ভাষা জানেন না। আপনি ভেঙ্গে পড়লেন। বাধ্য হয়ে আপনাকে স্বীকার করতে হলো যে স্কুলে থাকতে আপনি ফরাসী ভাষার 'প্রমিয়ার লেসন' নিয়েছিলেন। তারপর··· তারপর অবশ্য আপনি ইংরেজীই পড়েছেন।

মঁশিও বর্দো অল্প-বিস্তর ইংরেজী জানেন। অতএব তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে আলোচনা সুরু করলেন।

ফরাসী জাত, তাই শ্রদ্ধায় আপনার মাথা নুইয়ে পড়েছে। আপনি ইনটেলেকচুয়াল। সাহিত্য-সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। সেকসপীয়র-শেলী থেকে দু লাইন আউড়ে আপনি জ্ঞানের পরিচয় দিতে চান। সিরিয়াস আলোচনা আপনার পছন্দ সই। আপনি ভাবনায় পড়লেন কোন

বিষয় নিয়ে গল্প করবেন। সঙ্গীত, সাহিত্য, ওয়াইন না প্রেম। প্রথমে আপনি ফ্রাঁসোয়া সাঁগার বই নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন। বঁজুর ত্রিসতেস কিংবা 'আঁ সার'তা সুরির বা দাঁ জাঁ মোয়া দাঁ জাঁ-আঁ' বইয়ের নাম উল্লেখ করলেন। লুক-আঁরীর চরিত্র আপনার ভালো লেগেছে, এই মন্তব্যটা প্রকাশ করলেন।

কিন্তু মঁশিও বর্দো প্রথমেই আপনাকে জানিয়ে দিলেন যে, ফ্রান্সোয়া সাঁগা তার ভালো লাগে না। এবার সিমান দ্য বুভোয়ার-এর মানদারিন বই এর কথা বললেন। ভাবলেন ওদের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবাদ এলো মাদামের কাছ থেকে। স্পষ্টই বললেন,—যে মেয়ে বিয়ে না করে অন্য কারো সঙ্গে থাকতে পারে তার বই পড়বার আগ্রহ আমার কখনই হবে না।

অতএব আপনার এবার আর্টের কথা ফাঁদতে হলো। পিকাসো, রবিনসন—সুর রিয়ালিস্টের কথা তুললেন।

কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ আপনার মনে হলো যে, এই কাহিনী যেন আপনার শ্রোতার কাছে একটু বেসুরো শোনাচ্ছে। ঠিক জমছে না। ভাবলেন চেম্বার ম্যাজিক নিয়ে কথা বলবেন। দেবুসী, র‍্যাভেল · কিন্তু এ আলোচনাও বেশীদূর এগোল না।

বুঝতে পারলেন যে, আপনি ভুল পাত্রের হাতে পড়েছেন। হঠাৎ একজন এসে আপনাকে এ পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। ভদ্রলোক মাদাম বর্দোকে হেসে বলে—কেল নুভেল কী খবর ?

রিঁয়া—সংক্ষিপ্ত জবাব এলো মাদাম বর্দোর কাছ থেকে।

'ভু জাবে যাতানদুই কেলকেসোজ ত্রেইনতারেশানত্'—আপনি মজার খবরটা শুনেছেন ?—ভদ্রলোক বললেন।

কোঁয়া ? কী ?—স্বামী-স্ত্রী দুজনে একই সঙ্গে এবার প্রশ্ন করেন।

ভু-কোনেসে মাদাম রেঁনো—মাদাম রেঁনোকে আপনি চেনেন ?

উই। পুরকোয়া ?—ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন।

এ্যালর এল আ কিঁতে সাঁ মারী—মাদাম রেঁনো তার স্বামীকে ত্যাগ করেছেন।

এবার দুজনের কণ্ঠস্বর একসঙ্গেই শোনা যায়। কণ্ঠস্বর বললে ঠিক বর্ণনা হবে না। বলতে পারেন মেঘ গর্জন হলো। দুজনেই বলেন—নো মঁশিও, নে পা ত্রে—এ খবর সত্যি নয়।

সে ত্রে। দ্য লা প্রমিয়ার জুইসকা লা দারনিয়ার মো। সে এলা ত্রোয়াজিম মারী এল আ কিতে—এ সত্যি। প্রথম থেকে শেষ অক্ষর অবধি। এই নিয়ে তিন স্বামীকে ত্যাগ করেছেন মাদাম রেঁনো।

আপনি দেখতে পেলেন মাদাম বর্দো একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। এমন খবর বান্ধবীদের না বলে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাই আপনার দিকে এবং নবাগতের পানে তাকিয়ে বললেন—মেরাঁসি মিল ফোয়া—মেরাঁসি মিল ফোয়া।

জে দোয়া এ্যানফরমে মে জামি···ধন্যবাদ। আমার বন্ধুদের এ খবরটা দিতে হবে। এমন মুখরোচক খবর অনেকদিন তারা শোনেন নি।

মাদাম এবং মঁশিও এবার ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। অসংখ্য অতিথির কণ্ঠস্বরের ভেতর তাদের গলা আপনি আর শুনতে পাচ্ছেন না।

নবাগত ভদ্রলোক এবার আপনার দিকে তাকিয়ে বললেন: গুতেন আবেন্দ। হের কোবাৎজ। ইস বীন আইন কাউকম্যান···আমার নাম হের কোবাৎজ। আমি বিজনেসম্যান।

গুতেন আবেন্দ। ইস বীন ফ্রয়দে সু কেনেন। ইস ভার আউস ইন্দিস আনগেকমেন। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভারী আনন্দিত হলাম। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি।

ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া। আমার এক আত্মীয় রৌরকেল্লাতে কাজ করেন।

হ্যাঁ, স্টিল সিটি—আপনি জবাব দেন।

এবার এ অঞ্চলের ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা সুরু হলো। কোবাৎজ আপনাকে এখানকার ব্যবসার বাজারের একটা ফিরিস্তি দিল। আপনি জানতে চাইলেন ভারতীয় ব্যবসার প্রসার হচ্ছে কিনা কিন্তু কোবাৎজের জবাব শুনে আপনাকে নিরাশ হতে হলো।

হঠাৎ কোবাৎজ যেন ভীড়ের মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখতে পেলেন। আপনার দিকে তাকিয়ে বলল—এনতসুলদিগেনী মী নীর। এস গীবত্ত মাইন ফ্রয়েন্দ। অব ভিদারসেহেন—মাপ করবেন। আমার বন্ধু এসেছে। কোবাৎজ চলে গেলেন।

এবার আপনি ভাবছেন কী করবেন। ভীড়ের মধ্যে কোথায় যাবেন। এমনি সময় গৃহকর্তী আপনার কাছে এলেন। বললেন: স্ট্রেন্‌জ! কারু সঙ্গে কথা বলছেন না। দাড়ান কাউকে গল্প করার জন্যে ধরে আনি।

একটু বাদেই গৃহকর্তী একটি অল্পবয়সী মেয়েকে ধরে নিয়ে এলো। অপূর্ব সুন্দরী। গোলাপী রংয়ের অর্গাণ্ডীর ব্লাউজ পরেছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে স্কার্ট পরেছে। নতুন ফ্যাসানে চুল বেঁধেছে। সামনের দিকটা উঁচু। ঠোঁট নখ 'ক্রিশ্চিয়ান দিয়োরের' প্রসাধনে রক্তিম।

আপনার মনে হলো যে, মেয়েটি সাজগোজ না করলে আরো সুন্দরী দেখাতো।

গৃহকর্ত্রী পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেইনরা রমেলা।

সেইনরা না সেনোরিতা—আপনি বিস্মিত, কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন।

হেসে গৃহকর্ত্রী জবাব দেন। না দুঃখিত। ইনি হলেন সেইনরা রমেলা।

এবার আপনি একটু মাথা নীচু করে বলবেন: বোয়েনাশ নোচেশ। কমো এসতা উসতেদ। তেইনগো মুচো ওসতো আঁ ভেরোরলে। কেমন আছেন

সেইনরা। আপনাকে দেখে ভারী খুশী হলাম।

বইয়ে, ফিল্মে, আপনি স্প্যানিশ রূপসীর ছবি দেখেছেন। কিন্তু রক্তমাংসের গড়া স্প্যানিশ রমণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কখনও হয়নি। তাই কথা বলতে আপনার দ্বিধা ও সংকোচ হয়। কিন্তু আপনার জড়তা সেইনরা রমেলা ভেঙ্গে দিলেন। তার মুখ দিয়ে তখন স্প্যানিশ ভাষার খই ফুটছে। বললো: গ্রাস্তিয়াস। ই উসতেদ—আমি ভালো। আপনি?

কী জবাব দেবেন ভাবছেন। হঠাৎ আপনার মুখ দিয়ে বেরুলো: পারা সারভির ই উসতেদ ··অশেষ ধন্যবাদ,···আপনার সেবায় আমি প্রস্তুত।

সেইনরা রমেলা আপনাকে মুগ্ধ করেছে। আপনি তার সঙ্গে বসে গল্প করতে চান। কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে সে সুযোগ কোথায়?

হঠাৎ আপনার নজরে পড়লো সেইনরা রমেলার হাতে কোন ড্রিংক নেই। প্রশ্ন করলেন: সেইনরা, কী ড্রিংক করবেন?

গ্রাস্তিয়াস। শেরী—সেইনরা জবাব দিল। তার মুখের হাসি আপনার হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেলো।

সেইনরা রমেলার হাতে শেরীর গ্লাস তুলে দিয়ে আপনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

এবার আপনাদের আলাপচারী সুরু হলো।

সেইনরা প্রশ্ন করেন: আপনি এদেশে নবাগত?

হালে এসেছি—আপনি জবাব দেন।

আই লাইক ইণ্ডিয়া। 'আমার ভারতীয় মেয়েদের ড্রেস, বিশেষ করে শাড়ী, ভারী পছন্দ। আমার স্বামী বিয়ের আগে কলকাতায় স্প্যানিশ কন্সাল ছিলেন।

সেইনরার কথা শুনে আপনার মনে হলো যে আপনার দেশবাসী কাউকে দেখতে পেয়েছেন। কলকাতার নাম শুনলেই আপনার মনটা আনচান করে উঠে। তাই উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞেস করেন: আপনারা কলকাতায় ছিলেন। হোয়াট এ কয়েনসিডেন্স! আমিও যে কলকাতার লোক।

আমি নয়, আমার স্বামী ছিলেন। আমাদের বিয়ে হবার আগে, তার মুখেই কলকাতার গল্প শুনি।

এবার সেইনরা ভারতীয় মেয়েদের নিয়ে আলোচনা সুরু করলো। তাদের জীবন, ভালোবাসা প্রেম, বিয়ে, বহু প্রশ্ন করলো। হয়তো বললো: শুনেছি নাকি আপনাদের দেশে মেয়েরা ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে পারে না। এ কথা কী সত্যি?

এ প্রশ্নে আপনি একটু থতমত খেয়ে যান। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নেন। তারপর বলেন, আগে পারতো না। এখন কিন্তু নিতাই নিজের খুশীমতো বিয়ে হচ্ছে।

সেইনরা এবার জাতিভেদ বর্ণ বৈষম্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা সুরু করলেন। আপনি বললেন—সেইনরা ইণ্ডিয়া ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্লেস। ইউ মাষ্ট গো দেয়ার ওয়ান্স—।

আপনাদের কথাবার্তায় হঠাৎ বাধা পড়লো। সেইনরার স্বামী এসে আপনাদের আলোচনায় যোগ দিলো। তাই হয়তো আপনি একটু নিরাশ হলেন।

কিন্তু আপনাদের গল্পগুজব ককটেলে আর কতোক্ষণ চলতে পারে। আলাপ আরো ভালো করে জমাবার জন্যে আপনি বলেন : সেইনরা দেসআরিয়া উসতেদ—আকমপানিয়ারমে রেস্তোরান্তে মানানা…আপনারা যদি আমার সঙ্গে কাল খান তাহলে অনেক গল্পগুজব করা যাবে।

হেসে সেইনরা জবাব দেন—সী সী কোন মুচো ওস্তো·· গ্রাসিয়াস, ধন্যবাদ। নিশ্চয় আসবো।

আবার আপনাদের কথাবার্তায় বাধা পড়লো। সেইনরা ঘড়ির পানে তাকিয়ে বললেন : অনেক দেরী হয়ে গেছে। আচ্ছা, আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে।

রেস্তোরাঁর ঠিকানা দিয়ে দিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে গুণগুণ করতে করতে আপনি ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

এমনি করে পার্টির চতুর্দিকে ঘুরুন। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করুন। তারপর পার্টিশেষে গৃহস্বামী এবং গৃহিণীর কাছ থেকে বিদায় নিন।

গৃহিণী বললেন : ইউ কেইম। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড।

আপনি মৃদু হেসে বলেন : চমৎকার পার্টি। এমনি ধরনের পার্টি আমি বহুদিন দেখিনি।

কর্তা আপন প্রশংসা শুনে আনন্দে বিগলিত হলেন। বললেন : আসুন না আর একদিন। হ্যাভ এ লাঞ্চ। বসে বসে রাজা উজীর মারা যাবে'খন। আপনি হেসে জবাব দেন : সার্টেনলি—নিশ্চয়। আমি টেলিফোন করে ডেট ঠিক করে নেব।

আপনি বাইরে এলেন। বাইরে অসংখ্য গাড়ীর ভীড়। আপনার গাড়ীটা কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন না। অন্ধকারের ভেতর ঘুরতে লাগলেন। অনেকক্ষণ বাদে গাড়ীর হদিস পেলেন।

* * *

আপনি ডিপ্লোম্যাট অথচ আপনি নাচতে জানেন না। একথা কক্ষনো কারু কাছে স্বীকার করবেন না। কতো ধরনের নাচ আপনাকে শিখতে হবে। হাই লাইফ, টুইস্ট, আরো কতো কী। নাইটক্লাব বা আফটার ডিনার পার্টিতে গিয়েছেন—নাচের আসরে আপনার ডাক পড়লো। পার্টনার ঠিক করে নিন। তারপর নাচতে গেলেন।

প্রথমে মৃদুমন্দ সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের রেশ একটু একটু করে বাড়তে লাগলো। ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ে। পায়ের বীট বেড়ে গেলো। ভুল করে হয়তো আপনি মেয়েটির পা মাড়িয়ে ফেললেন। সর্বনাশ, কী লজ্জার কথা। এমন কাজটিও করবেন না। হয়তো মেয়েটি প্রতিবাদ করবে না কিন্তু জানবে যে আপনি নাচে দক্ষ নন।

নাচের শেষে নিজের টেবিলে এসে বসলেন। হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে বসেছেন। হঠাৎ দূরে কোন পরিচিতা মেয়েকে দেখতে পেলেন। সে আপনাকে আবার নাচের আসরে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করল। আপনি লোভ সামলাতে পারলেন না। হুইস্কীর গ্লাস ছেড়ে আপনি নাচতে গেলেন।

* * *

কিংবা আপনি ডিপ্লোমাট অথচ ব্রিজ খেলতে জানেন না।

প্রথম যেদিন আপনি দপ্তরে পা দিয়েছেন আপনার এম্বাসাডার প্রশ্ন করল: ব্রিজ খেলতে জানো ?

যদি বললেন হাঁ, তাহলে আপনি পরীক্ষায় পাশ করলেন কিন্তু যদি আপনার উত্তর নিরুৎসাহজনক হলো তাহলে কর্তা ঠাওরালেন যে আপনি বেরসিক।

ডিনারের শেষে ব্রিজ খেলতে আপনার ডাক পড়লো। আপনি না করতে পারবেন না।

* * *

ডিপ্লোমাটের জীবনের কিছুটা আভাষ আপনাকে দিয়েছি। তাদের ককটেল-পার্টি, ডান্স ডিনারের গল্প শুনলেন। হয়তো এ কাহিনীকে আমার আর একটু টেনে নিয়ে যেতে হবে, কারণ এমনি এক পার্টিতে আমার কল্যাণী সেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়।

* * *

আজকে আপনাদের যে পার্টিতে নিয়ে যাবো সে নাচের আসর নয়, নাইট ক্লাব নয়, এ হলো রাজার জন্মদিবস, যার দৃশ্য আপনি প্যারামাউন্ট বা মেট্রো গোল্ডুইনের ছবিতে দেখতে পাবেন। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জাতীয় পোষাক পরে তৈরী হয়েছেন। গির্জায় যেতে হবে, রাজার জন্মদিন, প্রার্থনা হবে। আপনার এম্বাসাডার যাচ্ছে। তার সঙ্গে আপনিও যাচ্ছেন। চুড়িদার পাজামা, গলাবন্ধ কোট। আপনার পোষাকে কোন ঝামেলা নেই। অথচ আপনার সহকর্মী অন্য দেশের ডিপ্লোমাটকে কিন্তু সকাল থেকে ড্রেসের পাঁয়তারা কষতে হচ্ছে। মর্ণিং কোট পরতে হবে। সাদা বো-টাই, টেলকোট বাঁধা। সিঁথি, কালো মুজো। আপনি মিলিটারী এ্যাটাশে। আপনার পোষাক ভিন্ন। সব কিছু ম্যাচ করা চাই। এই পোষাকের ভুল ত্রুটি হতে পারবে না। তাহলে সবাই আপনাকে তীক্ষ্ন নজরে দেখবে।

এম্বাসাডারের গাড়ীতে চেপে আপনি গির্জায় গেলেন। রাস্তার দুধারে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। কেউবা মজা দেখছে কেউবা কৌতূহলী। বিনে পয়সায় এর চাইতে দ্রষ্টব্য আর কী থাকতে পারে! রাজার জন্মদিন, রাজভক্ত প্রজা। আজ ছুটি, তাই শহরের জীবনের গতি মন্থর হয়ে এসেছে। সমস্ত শহর সাজানো হয়েছে রাজার ছবি, মালা ফুল দিয়ে। সবাই রাত্রির প্রতীক্ষা করছে, কারণ তখন নানান্ রংয়ের আলোয় শহর জগমগ্ করবে। তারপর বাজী পোড়ান হবে। রাজপ্রাসাদে হবে বল ডান্স।

রাজপ্রাসাদের সামনে গির্জা। রাজভবনের লোক আর গির্জার প্রতিনিধিতে সমস্ত জায়গাটা গিস্‌গিস্ করছে। গাড়ী থেকে নেমে আপনারা গির্জার ভেতর ঢুকলেন। কোথায় আপনি দাঁড়াবেন সে স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। আপনি দাঁড়াবেন বাঁদিকে। আপনার গোষ্ঠী ডিপ্লোমাটেরা আপনার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম সারিতে বসবে মন্ত্রীরা। মেয়েরা দাঁড়াবে ডানদিকে।

হঠাৎ অর্গানের সঙ্গীত ভেসে এলো। মৃদু সঙ্গীত, প্রথমে ব্রাম তারপর লিজৎ-এর সঙ্গীত। সে সঙ্গীত আপনি আগেও শুনেছেন কিন্তু তখন এতো সুমধুর লাগেনি, আজ যে রকম লাগলো। অসংখ্য লোকজনের আনাগোনা, সঙ্গীত এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যে, আপনার মনে হবে অতীত যুগে ফিরে এসেছেন। চতুর্দিকে ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক এবং রেডিওর লোকেরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। টি ভি. কর্মচারীরা যন্ত্র মেরামত নিয়ে ব্যস্ত।

একটু বাদেই প্রার্থনা সুরু হবে। আপনি শ্রোতা, এ প্রার্থনায় আপনার যোগ দেবার দরকার নেই। আপনি শুধু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকুন। কখনও কখনও বা বাঁকা দৃষ্টিতে অন্যান্য অতিথিদের পানে তাকান।

তারপর প্রার্থনা শেষ হবে। এবার আপনাকে রাজভবনে যেতে হবে, নিজের নাম সই করতে। ভিজিটারস্ বুক খোলা আছে। সেই খাতায় নামটা লিখে এলেই হলো।

দুপুর বেলায় বিছানায় একটু গড়িয়ে নিয়েছেন। সন্ধ্যায় সময় হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বসলেন। বিভিন্ন দেশের এম্বাসাডার ও ডিপ্লোমাটেরা আগে থেকেই ওখানে বসে চা বা কফি খাচ্ছেন। এম্বাসাডারদের দেখে হ্যাণ্ডশেক করছেন আর বলছেন বসোঁয়ার কমা তালে ভূ·· সাভা মেয়াসিঁ।

কফি -আপনি হয়তো না ভেবেই জবাব দেন।

কী অদ্ভুত চরিত্রের লোক হে তুমি। হ্যাভ এ হুইস্কী। গার্সোঁ দোনে মোয়া দ্য হুইস্কী, উইন আভেক লো, লেজতর সাভেক রকস।

আপনি হুইস্কীর সঙ্গে সোডা খান না। এ আপনার বন্ধুর জানা আছে। তাই আপনি হুইস্কী শুধু বরফ দিয়ে খাবেন।

তারপর গল্প সুরু হলো। ভেবেছেন রাজনীতি নিয়ে। না, না, মেয়েমানুষ নিয়ে। সময় কাটাবার জন্যে এর চাইতে মুখরোচক গল্প আর নেই।

রাত্রি নটায় আপনারা আবার রাজপ্রাসাদে এলেন। সাপার এবং বলড্যান্সের নেমন্তন্ন। আপনি জাতীয় পোষাক পরেছেন। গলাবন্ধ কালো কোট, চুড়িদার পায়জামা। সাহেবরা কেউ পরেছেন স্মোকিং কেউবা টেলকোট, কালো কোট, স্ট্রাইপ ট্রাউজার আর বো টাই।

এবার একটা ছোট ঘরে লাইন করে দাঁড়ান। লাইনের প্রথম সারিতে আপনার এম্বাসাডার। আপনার ডান পাশে মেয়েদের সারি। এম্বাসাডারের গিন্নী লাইনের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের পাশেই অন্যান্য দেশের ডিপ্লোমাটদের লাইন।

একটু বাদেই রাজা-রাণী আপনাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে আসবেন। আপনি প্রস্তুত থাকুন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে রাজা ও রাণী এলেন। রাজাকে আপনি আগে কখনও দেখেন নি। তাই কৌতূহলী হয়ে হয়তো ঘাড়টা উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করলেন। ব্যস্ত হবেন না। রাজাকে দেখবার অনেক ফুরসৎ মিলবে।

রাজার সংগে এসেছেন তার শেম্বারলাঁ—অর্থাৎ রাজার সেক্রেটারী। এবার রাজা এসে আপনাদের সংগে হ্যাণ্ডশেক করলেন। আপনার এম্বাসাডার আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে রাজা-রাণী বিদায় নিলেন। এলো শাম্পাইনের গ্লাস। পান করুন বা না-করুন মুখের কাছে গ্লাসটা ধরুন এবং রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করুন।

এর পরবর্তী দৃশ্যের পরিচয় বহুবার আপনি সিসিল বি. ডি-মিলির ছবিতে দেখেছেন। সেই জাঁকজমক পূর্ণ মস্তো বড়ো হলঘর। সমস্ত ঘরটা লাল পুরু কার্পেটে আচ্ছাদিত, চতুর্দিকে বড়ো বড়ো ঝালর বাতি ঝুলছে। দেয়ালে পুরাণ সম্রাটদের ছবি।

হলঘরের তিনদিকে বড়ো বড়ো টেবিলে খাবার বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার পছন্দসই খাবার তুলে নিন। পুলে রোতি, কিংবা কোল্ড বুফে। দূর থেকে দেখলেই আপনার জিভে জল আসবে। সেরা রান্না আপনারা যাকে বলেন 'কুইজিন ফ্রানসেস'। খাবারের সংগে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে সেরা ওয়াইন। কী খাচ্ছেন, মাংস। নিতে পারেন রেড ওয়াইন 'নুই সা জর্জ' কিংবা 'আনরে দা মার'। মাছ নিলে নিতে পারেন 'বর্দো হোয়াইট ওয়াইন' সাবিলি। ১৯৪৮ কিংবা ১৯৫২ এর সেলার থেকে আনা হয়েছে। হাজার হোক রাজবাড়ীর মদ, সেরা না হলে চলবে কী করে। আপনার ওয়াইন ভালো না লাগে শ্যাম্পাইন নিন। ব্রুট ইম্পিরিয়াল কিংবা মোয়েঁ শান্দ কিংবা ভয়েভ ক্লিকে না পেরিয়রে জুয়ে।

ভীড় ঠেলে খাবার প্লেট ভরে নিতে কম ঝামেলা নয়। হয়তো প্লেট হাতে করে বেরিয়ে দেখলেন এক পরমা সুন্দরী অপ্সরের মতো খাবার টেবিলের

সামনে খালি প্লেট হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভীড় ঠেলে খাবার আনবার যো নেই। আপনি আর কী করবেন। হাজার হোক এক যুবতীকে দেখে আপনি চুপ করে থাকতে পারেন না। আপনার খাবার প্লেটটা মেয়েটার হাতে তুলে দিলেন।

মেয়েটির রূপের বর্ণনা করবো। না থাক, রূপের চাইতে বয়সের কথাই বলি। কারণ যৌবন বয়সই সব চাইতে আকর্ষণীয়। আপনার সমবয়স্কা হবে। তাই আপনার চোখে পড়ে গেলো।

খাবারের প্লেটটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন: প্ৰীইজ ভু জর্ফারির ·····

দাঙ্কে শোয়েন। ইস কান নীসত্ ইম ফ্রানজোসিস্ স্প্রেকেন। ইস কমে আউসন কোলন।

আপনার আর কোন সন্দেহই রইল না যে মেয়েটি জার্মানীর। আপনার ভালো জর্মান ভাষা আসে না কিন্তু ভাষার অভাবে আলাপ পরিচয়ের ঝোঁকা তো আর ছাড়তে পারেন না। তাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা জর্মান ভাষা দিয়ে কথা চালালেন।

ইতিমধ্যে আপনি আর এক প্লেট খাবার আর মদ নিয়ে এসেছেন। এবার বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুরু করলেন। কিন্তু কী নিয়ে আলোচনা করবেন। এই তো সেদিন ককটেলে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বোকা বনে গেলেন। তাই এবার সংগীত দিয়ে গল্প শুরু করলেন।

ঘরের একপ্রান্ত থেকে মৃদু মন্দ সংগীত ভেসে আসছিলো। সে সংগীতের রেশ আপনি সহজে ভুলতে পারেন না। তাই আপনি বললেন: হয়তো হায়ডেনের সুর। কোন সিম্ফনি বলুন তো—'মার্চ' নিশ্চয়।

মেয়েটি আপনার কথা শুনে হাসে। বলে: না, হায়ডেন নয়, মোৎজার। সিম্ফনি ৪১। 'জুপিটার'। এর আগে শোনেননি কখনও?

বাধ্য হয়ে আপনাকে স্বীকার করতে হলো যে, জুপিটার আপনি এর আগে কখনো শোনেন নি।

আপনি সংগীত নিয়ে গল্প করেন। স্ট্রাভিনস্কি না মেনদেলজেন কিংবা শুবার ভালো লাগে এই নিয়ে তর্ক করেন। 'প্রিন্স ইগোর' না শুবারের চেম্বার ম্যাজিক পছন্দ করেন এই নিয়ে মতবাদ প্রকাশ করতে চান।

আলাপ আলোচনার মাঝখানে বললেন: ফ্রয়লাইন ··· কিন্তু আপনার কথায় মেয়েটি বাধা দিলে। বলল: এনতসুলদিগেন সী মীর। ইস হাইস ফ্রাউ আনালিতা ······

'ফ্রাউ' শুনে আপনি একটু দমে যান। ভেবেছিলেন মেয়েটি ফ্রয়লাইন, হয়তো আলাপ জমবে। প্রকৃত পরিচয় যখন পেলেন তখন জানতে পারলেন যে, মেয়েটি বিবাহিতা, ফ্রাউ আনালিতা।

কিন্তু এইখানে ভুল করলেন। ইয়োরোপে বিবাহিতার সঙ্গে আলাপ ভালো

জমবে, অবিবাহিতার সঙ্গে নয়। তাই নিঃসঙ্কোচে আপনি ফ্রাউ আনালিতার সঙ্গে গল্প করে যান।

ফ্রাউ আনালিতা বলে : আমার স্বামী কার্ল স্মিট। ইলেকট্রিকের ব্যবসা। গত যুদ্ধে, তখনও আমি অবিবাহিতা, আফ্রিকার যুদ্ধে আমার স্বামী ছিলেন ফিল্ড মার্শাল রোমেলের এ ডি. সি। তার কাছেই রোমেল আর আফ্রিকা কোরের বিস্তর গল্প শুনেছি। এইতো কিছুদিন আগে হঠাৎ ফ্রয়ডেনস্টাডে ফ্রাউ রোমেল এবং তার ছেলের সঙ্গে দেখা হল। আফ্রিকা কোর যুদ্ধে হারার পর আমার স্বামী রুশ প্রান্তে জেনারেল ভন গুদেরিয়ানের সঙ্গে কাজ করেন।

ফ্রাউ আনালিতার সঙ্গে গল্প করে আপনি বিস্মিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে আপনি বই পড়েছেন, কিন্তু কারো কাছ থেকে যুদ্ধের গল্প শুনতে কখনই বিরক্তি বোধ করেন না। আপনি আর্দেনস, বাঁস্তো দি হেল, নাফসাঁতো, আঁরলো ঘুরে দেখেছেন কিন্তু এখানকার যুদ্ধে যারা লড়াই করেছেন তাদের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি।

কিন্তু এ ব্যাপারে ফ্রাউ আনালিতা আপনাকে নিরাশ করবে। বলবে : যুদ্ধ করেছেন আমার স্বামী। লড়াইর সময় আমার বয়স তখনও অল্প। তবে যুদ্ধের শেষ কয়েকটা বছর আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন কোলন শহরে থাকতাম। যে কোলন শহর দেখে আজ আপনি বিস্মিত হবেন সেদিন কোলন শহর ছিলো ধ্বংসস্তূপ। সেদিনকার কোলন শহরে মাত্র একটি জলের কল ছিলো। বাকী সব বোমাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। ভোর সাতটার সময় মা ও আমি জলের বালতি নিয়ে কলের সামনে লাইন করে দাঁড়াতাম। মস্তো বড়ো লাইন। আমাদের জল নেবার পালা যখন আসতো তখন প্রায় বিকেল তিনটে। জর্মানীর সেই কয়েকটা দিন আমার এখনও মনে আছে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার জানবার আগ্রহ অপরিসীম। আপনি হয়তো ফ্রাউ আনালিতার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে চান কিন্তু আপনি কোন কিছু বলার আগেই ফ্রাউ আনালিতা আপনাকে বলে : আমি ভারতীয়দের বড়ো ভালোবাসি। জানেন, আমার একটি ভারতীয় বান্ধবী আছে। ইস হাভে আইনে ফ্রয়েনদিনেন ফন ইনদিশে বোতশাফত ·....

আপনি সেই ভারতীয় মেয়েটিকে চেনেন না। বললেন : নাইন, নাইন

আইনেন আউগেন ব্লিক। মাইনে ফ্রয়েনদিনেন ইসত্ ইয়ের ; আমি তাকে ডেকে আনছি। তিনি পরমা সুন্দরী।

একটু বাদেই ফ্রাউ আনালিতা একটি ভারতীয় মেয়েকে ডেকে আনলেন। মেয়েটি পরমা সুন্দরী না হলেও তার দেহের মাদকতা আর যৌবন আপনাকে আকৃষ্ট করবে।

ফ্রাউ আনালিতা বলল : মাইনে গ্যুতে ফ্রয়েনদিনেন, ফ্রাউ সেন। দি দামে ফন এরস্‌তে জেকরেতার ·· ···

আপনি মাথা নীচু করে ফ্রাউ সেনের হাতে চুমু খেয়ে বললেন : ইস বীন ফ্রয়দে সু কেনেন······

কিন্তু স্পষ্ট বাংলায় এর জবাব এলো। ফ্রাউ সেন বললেন : আমি বাঙালী। নমস্কার, আমার নাম কল্যাণী সেন। আমি হাংগারফোর্ড স্ট্রীটের সেন বাড়ীর মেয়ে·· ···

* * *

জবাব শুনে থমকে গেলেন।

এমনি এক বড়ো রিসেপশ'ন আমার সংগে কল্যাণী সেনের সংগে পরিচয় হয়েছিলো।

দিনটা আমার স্মরণ আছে। কল্যাণী সেনের সংগে আমার পরিচয় হবার জন্যে নয়, সেদিন বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছিলো। কিন্তু তবু রাজবাড়ীর নেমন্তন্ন উপেক্ষা করতে পারিনি। বরফকে তুচ্ছ করে আমি এসেছিলাম।

কল্যাণী সেনের সংগে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। কল্যাণী সেন বাঙ্গালী বলে নয়, বাড়ী ফিরবার সময় গাড়ীতে লিফট পাবার মুস্কিল হবেনা বলে।

বিদেশে দূতাবাসের কারু কাছ থেকে বাংলা শুনতে পাবো এ কখনও আশা করিনি। তাই বাংলা শুনে বিস্মিত হয়ে কল্যাণী সেনের পানে তাকালাম। হয়তো এই তাকানোটা শোভনীয় হয়নি। কল্যাণী সেন একটু অপ্রস্তুত অনুভব করলেন।

কল্যাণী সেন আমারই সমবয়সী। প'য়াত্রিশ-ছত্রিশ, কিন্তু দেহের প্রসাধনের দরুণ বয়সটা ঢাকা পড়ে গেছে। পরনে ছিলো একখানা বেনারসী শাড়ী, হাতকাটা ব্লাউজ। শাড়ীটা দেহের চারদিকে লেপটানো ছিলো এবং আংগুলে লিপস্টিকে ও কিউটেক্সে লাল ছিল। চোখে কালো মাসকারা।

কল্যাণী সেনকে আমার ভালো লাগার কারণ তার দেহশ্রী নয়, কারণ তার করুণ চোখ। আমি সাংবাদিক, দীর্ঘকাল যাবৎ পরবাসী রোম, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, ফ্রান্‌কফুর্ট, কায়রো, দামাস্কাস আমার কাছে ডালভাত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ দিনের ভ্রমণের দরুণ বহু সুন্দরী আমার চোখে পড়েছে কিন্তু কেউ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু আজ কল্যাণী সেনের করুণ চোখ আমাকে আকর্ষণ করল।

আমার মনে আছে যে, কথা-বার্তা বলতে বলতে আমরা দুজনে রিসেপশনের এক প্রান্তে চলে এসেছিলাম। আমি কল্যাণী সেনকে প্রশ্ন করেছিলাম, ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস ভালো লাগে?

কল্যাণী সেন একটু মৃদু হাসে। তারপর বলে : ভালো লাগবে না কেন?

এ জীবনে যে শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা নেই। উনুনের সামনে গিয়ে কয়লার আগুনে পোহাতে হয়না। যেখানে খুশী বেড়াতে যান, নিষেধ করার কেউ নেই। ইচ্ছে হলো তো নাইট ক্লাবে গেলেন, কিংবা পরিচিত কারু সঙ্গে ক্যাবারেতে নাচতে গেলেন। বারে বসে মদ খাই কিংবা সিগারেট খাই এখানে কেউ চক্ষু টাটাবেনা। না বিক্রমাদিত্য, এ জীবনে বাধা দেবার মত কেউ নেই কিন্তু প্রলোভন দেখাবার লোকের অভাব নেই। অথচ যদি বাংলা দেশে থাকতাম তাহলে হেঁসেলেই জীবন কাটাতাম। এই দেখুননা, কথায় কথায় আমাদের দেশের ছেলেরা ইয়োরোপের রীতিনীতি বা জীবনধারার সঙ্গে তুলনা করে। বলে ঃ দিস ডাজ নট হ্যাপেন ইন ইংল্যাণ্ড। কিন্তু যখন নিজেদের স্ত্রীদের স্বাধীনতা দেবার প্রশ্ন ওঠে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলুন, আমাদের দেশের বিলেত ফেরৎ ছেলেদের এ মতবাদকে হিপোক্রেসী ছাড়া আর কী বলবো! অস্বীকার করবো না যে, দেশের জন্যে আমার প্রাণ আই-ঢাই করে কিন্তু আই লাইক ডিপ্লোমেটিক সার্ভিস।

আমাকে চুপ করে থাকতে হয়। আমি দেশ বিদেশ ঘুরেছি। আমি জানি কল্যাণী সেনের কথাগুলো খাঁটি। তাই কোন প্রতিবাদ করিনে।

কল্যাণী সেন আরো বলেন, দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তিন বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি বেলগ্রাদ, সিঙ্গাপুর, পারী, ন্যু ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনসে কাটিয়েছি। হামেশাই তো বাজার করতে লণ্ডনে যাই। অথচ দেশে থাকাকালীন দার্জিলিং যাবার আয়োজন করে উঠতে পারিনি। দেশ বিদেশ ঘোরার কতো সার্থকতা। আপনার দৃষ্টি প্রসারিত হয়।

আপনি দেশ ঘুরতে ভালোবাসেন? আমি কৌতূহলী, তাই প্রশ্ন করি।

নিশ্চয়। আই লাইক টু ট্রাভেল। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চাই। শুধু ইয়োরোপ, আমেরিকা, মস্কো নয়, আমি দেখতে চাই আফ্রিকার বনানী, মধ্যপ্রাচ্যের অতীত স্মৃতি। ইয়েস, আই লাইক টু গো টু মিডল ইস্ট, দি ল্যাণ্ড অব দি ক্রাইস্ট অ্যাণ্ড মুহম্মদ ··

সেদিন আমি কল্যাণী সেনের কথা বিশ্বাস করিনি। তখনো ভাবিনি যে, তাকে আবার মধ্যপ্রাচ্যে দেখতে পাবো। কিন্তু সত্যিই যখন তার সঙ্গে আমার মধ্যপ্রাচ্যে দেখা হয়েছিলো তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

*   *   *

মরহবা। কিফক হাল?

মেয়েলি কণ্ঠে সেদিন আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলো তাকে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী সেন। এ যে অবিশ্বাস্য!

আমি ভবঘুরে। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানই আমার পেশা ও নেশা।

কিন্তু পুরাতন বন্ধুকে নতুন দেশে দেখতে পাওয়া আমার কাছে সত্যিই বিস্ময়জনক। তাই কল্যাণী সেনকে সেদিন বেরুট নগরীতে দেখে শুধু বিস্মিত নয় আনন্দিতও হয়েছিলাম এই আনন্দের গৌণ একটা কারণ ছিলো। কল্যাণী সেন আমার বান্ধবী। আমরা দুজনে, কতোদিন কতো সন্ধ্যা সাঁজেলিসীর কাফেতে বসে সময় কাটিয়েছি তার হিসেব রাখিনি !

আমার মনে আছে বিকেলে আমরা শেন নদীর পাড় দিয়ে হাটতাম। তারপর আসতাম লাতিতে কাতিয়েন। পুরানো বইর বাজার দেখতে। সেখান থেকে কাফে দ্য মাগোতে বসে বৈঠকী গল্প করতাম। একদিন এই কাফেতে আমার সঙ্গে আলবেয়ার কামু, সিমণ দ্য বুভেয়ার-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। কল্যাণী সেনের বাড়ীতে আমি ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের সঙ্গে বসে ভারতীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছি।

হয়তো একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কল্যাণী সেনের রূপ বা বাকচাতুর্য তার দেহের একমাত্র অলঙ্কার নয়। কল্যাণী সেন ইনটেলেকচুয়াল। আপনার অভিধানে ইনটেলেকচুয়ালের কী মানে জানিনে। কিন্তু ইনটেলেকচুয়াল আমি তাদেরই বলবো যাদের সঙ্গে বসে আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারেন। একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করেন না। কল্যাণী সেই তাদেরই একজন যাদের সঙ্গে গল্প করতে বসলে আপনাকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হবে।

কল্যাণী সেন কখনও কখনও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতো। মার্ক্সবাদ নয়, তার আফ্রিকা জীবনের স্মৃতি। বলতো : বুঝলেন বিক্রমাদিত্য, এবার গিনির রাজধানী কোনাক্রীতে ভারী মজা হয়েছিলো। গিনির নাম নিশ্চয় শুনেছেন। এককালে ফরাসীদের উপনিবেশ ছিলো। কিন্তু সেকুতুরে গিনিকে ফরাসীদের শাসন থেকে মুক্ত করেন। যাক, কী বলছিলাম ? হয়তো সে ঘটনার দিনটা ছিলো গিনির স্বাধীনতা দিবস। মালী থেকে তার প্রধান মন্ত্রী মদিবো কিতা এসেছেন, লাইবেরিয়া থেকে টাবম্যান, আরো সব মহারথীরা এসেছেন। আমরা ছিলাম কোনাক্রীর হোতেল দ্য ফ্রান্সে। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন আমাদের সবার এয়ারপোর্টে যাবার নেমতন্ন হয়েছিলো। গানার রাষ্ট্রপতি কোয়ামে এনক্রুমা আসবেন। গানা গিনির সঙ্গে তখন বেশ মিতালি চলছে তাই এনক্রুমার আগমনের সংবাদ জনতার ভেতর বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ঠিক হয়েছিলো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে সেকুতুরে মদিবো কিতা এবং এনক্রুমাকে নিয়ে শহর ঘুরবেন।

গানার প্লেন মাটিতে ছোঁবার আগে কামানের তীব্র গর্জন সবাইকে জানিয়ে দিলো যে, কোয়ামে এনক্রুমা আসছেন। এয়ারপোর্টের জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো। স্বয়ং সেকুতুরে নিজে গেলেন প্লেনের কাছে এনক্রুমাকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু দুর ছাই, প্লেন থেকে কে বেরিয়ে এলো জানেন ?

গানার এক সামান্য মন্ত্রী কজো বতসিও। বতসিওকে দেখে সেকুতুরে

রেগে কাঁই। তিনি ভেবেছিলেন স্বয়ং এনক্রুমা আসবেন কিন্তু তার পরিবর্তে এক মন্ত্রীকে দেখে রেগে গেলেন।

এ তাকে অপমান করা ছাড়া আর কী?

সেদিন থেকে গানা-গিনির ইউনিয়ন শেষ হয়ে গেলো।

এ ধরনের বহু ঘটনা আমি কল্যাণী সেনের কাছ থেকে শুনেছি। আরো বহু কাহিনী হয়তো শুনতে পারতাম কিন্তু গল্প বলার সময় কোথায় কল্যাণী সেনের!

আমাকে বলতো: জানেন বিক্রমাদিত্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি একটা না একটা কাজের ধান্ধায় ঘুরছি।

বাজার করি, চাকর বাকরদের খাবারের ফর্দ করে দিই। তারপর দশটা বাজলেই কফি পার্টিতে দৌড় দিই। দুপুরে কর্তা দপ্তর থেকে ফিরে এলেন। লাঞ্চ খেয়ে আমি এম্বাসাডার গিন্নীর সঙ্গে গেলাম রেডক্রসের মিটীং-এ কিংবা কালচার এসোসিয়েশনের সভায়।

বিকেলে আছে ককটেল, রাত্রে ডিনার কিংবা ড্যান্স পার্টি। দুমিনিট যে নিশ্চিন্ত মনে বসবো সেও আমার ভাগ্যে জোটে না।

কল্যাণী সেনের এই কথাগুলো অতিরঞ্জিত নয়। ডিনারের আসরে কল্যাণী সেন অপরিহার্য। সিট ডাউন ডিনার। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে ভেনিজুয়েলার এম্বাসাডার জানালেন যে, কোন কারণ বশতঃ তার গিন্নী আসতে পারবেন না। অমনি কর্তা তলব করলেন কল্যাণী সেনকে। ভেনিজুয়েলার এম্বাসাডারের গিন্নীর অ্যাকটিং করতে হবে। নইলে সমস্ত ডিনার মাটি হয়ে যাবে। সিট ডাউন ডিনার। যতোজন ছেলে ততোজন মেয়ে চাই।

তারপর ডিনারের শেষে ব্রিজ পার্টি বসলো। পর্তোরিকোর রাজদূত স্পষ্টই বলে বসলেন যে কল্যাণী সেনকে পার্টনার না পেলে তিনি খেলবেন না

এ প্রস্তাব শুনে কল্যাণী সেন একটু অপ্রস্তুত হ'ন। কল্যাণী সেনের কর্তার গিন্নী স্বয়ং পর্তোরিকোর রাজদূতের পার্টনার হয়ে খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে আমল না দিয়ে কল্যাণী সেনকে নিয়ে খেলতে বসা সত্যিই একটু দৃষ্টি-কটু দেখায়। কিন্তু কর্তা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। বুঝতে পারলেন যে কল্যাণী সেন সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারছেননা। তাই নিজেই কল্যাণী সেনকে পার্টনার করে খেলতে বসলেন।

খেলার আসর ভাঙলো তখন ভোর প্রায় তিনটা। হয়তো আরো কিছুক্ষণ খেলা চলতো কিন্তু ভেনিজুয়েলার এম্বাসাডারকে ভোর পাঁচটার সময় রোমের প্লেন ধরতে হবে। তাই খেলার আসর ভাঙতে হলো।

স্পেনের চার্জ দ্য এফেয়ার এসে বলল: লিফট দেবো সেনোরা সেন? আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি।

আজকের ডিনারে মিঃ সেন আসেন নি। কল্যাণী সেন অফার গ্রহণ করলেন।

হেসে বলল : গ্রাশিয়াস।

এবার চার্জ দা এফেয়ারের বিস্ময়ের পালা। বললেন : সেইনোরা আবলা উসতেদ এসপাইনল। পারা সারভির আ উসতেদ।

স্প্যানিশ ভাষায় কল্যাণী সেন জবাব দেন : নো সেইনর, য়ো আবলো উনপকো। অল্প অল্প বলতে পারি।

মুই এ ইনতেরাশনতে। ইনটারেষ্টিং। চার্জ দা এফেয়ার গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন। কল্যাণী সেন ড্রাইভারের পাশের সিটটাতে গিয়ে বসল। এর মধ্যে একটু দ্বিধা বা সংকোচ ছিলো না। কল্যাণী সেনের স্বামীর কর্তা সদা সর্বদাই কল্যাণী সেনকে ডেকে পাঠান। দপ্তরে কিংবদন্তী ছিলো কল্যাণী সেন হলেন এম্বাসাডার গিন্নীর সোশাল সেক্রেটারী। কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। কর্তা গিন্নী দুজনেই কল্যাণী সেনকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। প্রায়ই তো এম্বাসাডার গিন্নীকে মহিলা মহলে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, মহিলা সমাজ নিয়ে বক্তৃতা করতে হয়। এ বক্তৃতার খসড়া তৈরী করে দেন কল্যাণী সেন। রাজনীতি বা ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বা বামপন্থী নেতাদের মতবাদ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়। আলোচনা সুরু করেন গিন্নী এবং সমাপ্তি করেন কল্যাণী সেন। কখনও কখনও মহিলা মহলে শাড়ী নিয়ে আলোচনা হয়। এ আলোচনার উদ্যোক্তা কল্যাণী সেন। যদি কোন ফ্যাশান প্যারেড হয় তার মডেল কল্যাণী সেন। যে কোন ভঙ্গীতে তিনি শাড়ী পড়ুন না কেন, যে কোন পোষাক তার দেহে উঠুক না কেন মিসেস সেন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই করবে। সে ডিনার পার্টির পোষাকই হোক বা সী বীচের বিকিনি কস্টুমই হোক।

এবার রান্নার কথা বলা যাক। প্যারীতে থাকতে কল্যাণী সেন রান্না শিখেছিলো। স্যুপ লো আইনো থেকে গ্রাসে শ'কোলা অবধি। তারপর ম্যাকারনি, ফেতুচিনিও কল্যাণী সেনের হাতে অপূর্ব, অনবদ্য।

আজ এম্বাসাডারের বাড়ীতে বিরাট বুফে ডিনার হবে। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক খাবে। গিন্নী মিসেস সেনকে ডেকে পাঠালেন। খাবারের শেষে সুইট দেওয়া হবে রসোগোল্লা। ভারতীয় স্পেশালিটি। প্রায় দুশো রসোগোল্লা কল্যাণী সেন নিজ হাতে বানাল। সবাই সেই মিষ্টি খেয়ে তাজ্জব বনে গেলো। আমেরিকান এম্বাসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী এসে বলল : মিসেস্ সেন, কলকাতার আমাদের কনসুলেটে থাকতে এই মিষ্টি খেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিনকার মিষ্টির চাইতে আজকের মিষ্টি অনেক ভালো।

কল্যাণী সেনের বর্ণনা শুনে আপনারা হয়তো তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন। তাই আমার কথার স্রোতে আপনাদের ভাসিয়ে নিতে চাইনে। চলুন আপনাদের কল্যাণী সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের

আলাপ পরিচয়ের স্থান হলো বেরুট নগরীর এক ককটেল পার্টি। এই ককটেল পার্টির বাড়ী খুঁজে নিতে আপনাদের নিশ্চয় কোন অসুবিধে হবে না। কারণ আপনার নেমন্তন্ন কার্ডের সঙ্গে একটা ম্যাপ আঁটা আছে। সেই ম্যাপ দেখে সোজা চলে আসুন। কার্ডে লেখা আছে, দি ফার্স্ট সেক্রেটারী ইনফরমেশন অব্ দি ইণ্ডিয়ান এম্বাসী এ্যাণ্ড মিসেস কল্যাণী সেন রিকোয়েস্ট দি প্লেজার অব ইউর কোম্পানী এ্যাট এ ককটেল এ্যাট দেয়ার হাউস এ্যাট সেভেন পি এম···

* * *

মরহবা।

মরহবা।

কিফাক হাল?

কুল্লু কোয়ায়েস—

আলা ওয়াসালান······

একের পর এক গেস্ট আসছে। কেউ বা ডিপ্লোমাট কেউ বা সাংবাদিক কেউ বা পররাষ্ট্র দপ্তরের লোক। মিঃ ও মিসেস্ সেন সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছেন আর বলছেন, কুল্লু কোয়ায়েস, আলা ওয়াসালান।

কল্যাণী সেনকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! প্রথমটায় দেখে চিনতেই পারিনি, এই সেই মেয়ে যাকে চার বছর আগে আমি প্যারীতে দেখেছিলাম।

কল্যাণী সেনকে দেখে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি। তারপর যখন তার মুখ দিয়ে কয়েকটি অসংলগ্ন কথা বেরুলো···বিক্রমাদিত্য··আপনি ·তুমি এখানে · হোয়াট এ সারপ্রাইজ! নেভার থট আই শ্যাল সী ইউ ইন দিস্ পার্ট অব দি ওয়ার্লড!

পৃথিবীটা ছোট জায়গা, বিশেষ করে ভবঘুরের কাছে।

এবার মিঃ সেনের কথা বলার পালা। অনুযোগের কণ্ঠে বললেন—দীর্ঘ দিন ধরে বেরুট নগরীতে আছেন, একবার খোঁজ খবরও করেন নি।

আমি কী করে জানবো আপনারা এই দেশে। ভারতীয় দূতাবাসে তো আমি সচরাচর যাইনে।

আচ্ছা বলুন তো আমাদের দূতাবাসের প্রতি সবার এতো রাগ কেন? একটু অভিযোগের কণ্ঠে মিঃ সেন বলেন।

আমি হেসে জবাব দিই রাগ নয় সেন সাহেব, উদাসীনতা।

কল্যাণী সেন আমাদের কথায় বাধা দিলো। বলল: আহা, কী বাজে জিনিষ নিয়ে তর্ক করছো। যাক্ বিক্রমাদিত্য, এবার বলো এ অঞ্চলে কী করছো?

ভবঘুরের পেশা কী হতে পারে। পরনিন্দা ও পরচর্চা। আমি জবাব দিলাম।

অর্থাৎ? কল্যাণী সেনের কণ্ঠে কৌতূহলের সুর।

অর্থাৎ জার্নালিজম। আজকালকার কাগজে গালমন্দো না দিলে কী আর কাগজ বিকোয়।

আমার জবাব শুনে সবাই হেসে ওঠে। কল্যাণী সেন বলেন : সেই অতীত দিনের কথা ভাবতে আমার অবাক লাগে। পারীর মাদাম কনারসকির পাঁসিওতে আমাদের শেষ দেখা হয়েছিলো। জানো বিক্রমাদিত্য, আমার পারীই ভালো লাগে। ইট ইজ এ প্যারাডাইজ।

কিন্তু শুনেছি বেরুট নাকি পেতিত পারী—আমি জবাব দিই।

বেরুট পেতিত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু পারী কিনা বলতে পারবনা। কিন্তু যাক, এবার চলো আমার অতিথিদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। একটা কথা তোমায় বলবো বিক্রমাদিত্য, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে যদি ওয়াকিবহাল হতে চাও তবে বেরুটের চাইতে শ্রেষ্ঠ নগরী আর নেই। এখানে তুমি সব পাবে। সিন্দবাদ রেস্তোরাঁর নাম শুনেছ? সেখানে বড়ো বড়ো নেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারো. আর—

কল্যাণী সেনের কণ্ঠস্বর একটু খাদে নেমে এলো।

আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম : আর কী বললে না তো?

বিক্রমাদিত্য, বেরুট নগরী হলো গুপ্তচরদের স্বর্গ। এখানে বিবিধ ধরনের লোক দেখতে পাবে। ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স, এম. আই. ফাইভ, এম. আই. সিক্স বলো কিংবা চাও আমেরিকার সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স অথবা এজেন্সী রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক, সবাই এখানে তৎপর হয়ে আছে। চলো এবার অতিথিদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। বিশেষ করে কিম ফিলবির সঙ্গে। কিম ফিলবি হলো লণ্ডন অবজার্ভার এবং ইকনমিস্টের সংবাদদাতা।

* * *

ঘরের একপ্রান্তে জন পাঁচেক লোক মদেরগ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কল্যাণী সেন আমাকে তাদের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন : ডেভিড, আমার বন্ধু বিক্রমাদিত্যকে তোমাদের কাছে নিয়ে এলাম পরিচয় করিয়ে দিতে। বিক্রমাদিত্য ইজ এ করেসপণ্ডেণ্ট অব এ বিগ পেপার অফ ইণ্ডিয়া। আর ইনি হলেন. ডেভিড ল্যাঙ্কাশায়ার অব এসোসিয়েটেড প্রেস, ইনি আর্থার কুক অব ডেলী মেল, আর পিটার কিলনার অব আরব নিউজ এজেন্সী।

এই ব্যূহের একটু দূরে আর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তার কাছে গিয়ে কল্যাণী সেন বললেন : ইনি হলেন কিম ফিলবি। কিম ইজ এ বিগ গাই ইন দি নিউজ পেপার ওয়ার্লড ···

আমি হ্যাণ্ডশেক করে বললাম : সো গ্ল্যাড টু মীট ইউ।

কিম ফিলবি ·····, এই নামটা আমার পরিচিত। কোথায় যেন এই নাম শুনেছি। চট করে স্মরণ করতে পারলাম না। কোথায়, কোথায় · · ·

আমার স্মরণশক্তি প্রখর হয়ে উঠলো। বহুদিনের একটি পুরানো কাহিনী

আমার মনে পড়লো। লণ্ডন · ১৯৫৪ লণ্ডনের হাউস অব কমন্সের সামনে পায়চারী করছিলাম। হঠাৎ ভেতরে ঢুকবার এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা হলো। সেদিন ঢুকবার প্রবেশপত্র পেতে অসুবিধা হয়নি। পরিচিত এক লেবার মেম্বারের সাহায্য নিয়ে পার্লামেন্টের ভেতর গিয়েছিলাম।

সেদিনকার আলোচনার বিষয় ছিলো মুখরোচক। ম্যাকলীন-বার্জেস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। সমস্ত ইংল্যাণ্ডে এই এদের নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। কাগজে কাগজে লেখালেখির অন্ত নেই। ব্রিটিশ ফরেইন অফিসে সোভিয়েট গোয়েন্দা ঢুকেছে। ম্যাকলীন-বার্জেস তাদেরই দলের। তাই আজ ম্যাকলীন-বার্জেসকে নিয়ে আলোচনা। আর সেই সঙ্গে কিম ফিলবির নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু সব স্পাইদের নিয়ে তো আর এই কাহিনী লেখা যায় না। তাহলে আমাকে রামায়ণ মহাভারত ফাঁদতে হবে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনীর সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের নিয়ে আমার গল্প শুরু করবো।

* * *

বেরুটের সমুদ্রতট রৌসে।

দুপুরের প্রখর রৌদ্রে রৌসে যেন ঝলসে যায়, আবার রাত্রি বেলায় আলোয় ঝলমল করে। চারদিকে কাফে আর রেস্তোরাঁ। বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন যাত্রী। পাঁচমিশালী লোক। হৈ-হল্লা ফুর্তি হচ্ছে। তাই সবাই বলে বেরুট হলো পেতিত পারী। রৌসেতে এলে আপনার মনে হবে যে, আপনি 'কান বা নীস' শহরে এসেছেন।

প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যায় রৌসে লোকে গিসগিস করছে। কেউ যাচ্ছে নাচতে, কেউ খাচ্ছে, কেউ বা বান্ধবীকে বগলদাবা করে ষ্টিরিও ক্লাবে যাচ্ছে। কেউবা কাফেতে বসে চুকচুক করে মদ গিলছে।

চলুন এই মহল্লার একটি ছোট রেস্তোরাঁয় যাই। গল্পের খাতিরে এই আড্ডাখানার নাম ধরে নিন লিডো।

সকাল সন্ধ্যায় লিডো রেস্তোরাঁ লোকে-লোকারণ্য। একটানা জনস্রোত বয়ে চলেছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে, পুরানো খদ্দের যায় আসে নতুন গ্রাহক।

মরহবা·· হাবিবী·· কীফক হাল কুল্লু কোয়ায়েস, হামদুলিল্লা। আপনি নবাগত। পরিচিত কাউকে দেখে হয়তো অনেকগুলো প্রশ্ন করেন।

নাম··· কুল্লু কোয়ায়েস। সু আকবর মিন আল বাগদাদ অথৎ বাগদাদের খবর কী?

আপনি সাংবাদিক, নিজেকে ভাবেন সবজান্তা। আপনার বন্ধু মিচেলমোর সাহেব বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। তার সঙ্গে আপনার যথেষ্ট দহরম মহরম। তার কাছ থেকে আপনি টাট্‌কা খবর পেয়েছেন। তিনি আপনাকে সতর্ক করেছেন। ইরাকে শিগ্‌গিরই বিপ্লব হবে। কাসেমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

হচ্ছে। এ খবরেই আপনি সন্তুষ্ট। ভাবেন মধ্যপ্রাচ্যর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনি বিশারদ হয়েছেন। কিন্তু আপনার বন্ধু আঁতোয়ান এ খবর শুনে হাসেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেঃ হবে কী হে? হয়ে গিয়েছে। আজ দুপুরবেলা ইরাকী সৈন্যদল বিদ্রোহ করেছে। কাসেমের পতন হয়েছে। বাজারে গুজব, শুধু পতন নয় মৃত্যুও হয়েছে। তার মৃতদেহ নাকি টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। এবার দেশের শাসনকর্তা হয়েছেন বাথপার্টি। কিন্তু আপনি জানেন এরা রাজনীতিতে বড্ডো কাঁচা। কী করে দেশের শাসনতন্ত্র চালাতে হয় এরা কিছুই জানেনা। অতএব আপনার চিন্তা বাড়ে

আপনি এ খবর পেয়ে বিস্মিত, হতবাক। দ্রুতলয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তার পুরো ফিরিস্তি যে রোমের সমুদ্রতটে বসে পাবেন এ কিন্তু কখনও কল্পনা করেননি! আপনার সংবাদের ভাণ্ডার মিচেলমোর সাহেব। আপনি ভাবেন মিচেলমোর এ এলাকার খবরের অথরিটি। কিন্তু আপনি ভুল করলেন তার চাইতে সংবাদের অথরিটি হলো ব্রায়ান স্মিথ বা কোলী সাহেব।

গল্পের খাতিরেই এদের নাম বলছি। এদের নাম হিগিনস বা স্টুয়ার্ট হতে পারতো। ভাবছেন এরা কোন দেশের আদমী। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বা রুশ বা চীন দেশের হতে পারে। এদের পেশা কী? সেই নিয়েই তো আজ আমার গল্প। এবার শুনুন সেই কাহিনী।

এই যে ব্রায়ান স্মিথের নাম করলাম—ধরে নিন ইনি হলেন আমেরিকার লোক।

আপনি আমেরিকার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স বা ইংল্যাণ্ডের এম. আই. ফাইভ বা রুশ দেশের 'কেজিবি'র নাম শুনেছেন। আমার এই কাহিনীকে রসালো করার জন্যে ধরে নিন ব্রায়ান স্মিথ হলেন সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের লোক।

যাক, যে কথা বলছিলাম। এ অঞ্চলের খবরের অথরিটি হলো ব্রায়ান স্মিথ। আর এই যে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের নাম করলাম এর কাজ হলো কোথায় বিপ্লব হচ্ছে—কার দলিলে কী লেখা আছে, কিউবাতে কবে সৈন্য নামাতে হবে তার আয়োজন করা। আর এই সি. আই.-এর কর্তা ছিলেন এ্যালান ডালেস। ইনি হলেন ফস্টার ডালেসের ভাই।

ব্রায়ান স্মিথ সি আই-এর কর্মচারী। অতি সাদাসিধে সরল মানুষ। টায়ারের ব্যবসা করেন। এ কাজটা তার মুখোস। একে গুপ্তচরদের ভাষায় বলা হয় 'কভার'। তার আসল কাজ হলো গুপ্ত খবর সংগ্রহ করা।

এবার কোলী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করুন। আপনি ব্রিটিশ গুপ্তচর-বিভাগ এম. আই. ফাইভ বা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এম. আই. সিক্সের নাম শুনেছেন। কোলী এদের লোক।

শুধু কোলী আর ব্রায়ান স্মিথ নয়, অন্যান্য দেশের গুপ্তচরদেরও দেখা

আপনি পাবেন এই বেরুট নগরীতে।

লিডো রেস্তোরাঁয় আপনি ব্রায়ান স্মিথের দেখা পাবেন, শুধু মাত্র লিডো রেস্তোরাঁর নয়, পৃথিবীর বহু জায়গায়, বহু রেস্তোরাঁয় আপনি ব্রায়ান স্মিথদের দেখা পেতে পারেন।

আপনি ব্রায়ান স্মিথদের সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক? স্মিথ লিডোর একপ্রান্তে বসে আছেন। আপনার বন্ধু আঁতোয়ানের মারফৎ হঠাৎ আপনার পরিচয় হলো।

হ্যালো আঁতোয়ান? হোয়াট ইজ দি নিউজ? কিফক হাল—ব্রায়ান স্মিথ দু'চারটা আরবী শব্দ ব্যবহার করেন।

কোয়ায়েস··শোনো একটা জরুরী খবর আছে।

আঁতোয়ানের কথা শুনে ব্রায়ান স্মিথের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আঁতোয়ান তার বিশ্বস্ত চর। যাকে বলা হয় 'এজেন্ট'। সমস্ত গুপ্ত খবর এনে দেয়। আঁতোয়ানের খবর কখনই ভুল হয়না। তাই আঁতোয়ানের উপর স্মিথের ভারী বিশ্বাস। আঁতোয়ানের প্রশ্ন শুনে একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন—কী খবর?

গামেল আব্দেল নাসেরকে চেনো? আঁতোয়ান প্রশ্ন করেন।

গামেল নাসের! নামটা শুনেছি। ঐ কায়রোর সৈন্যবাহিনীর নেতা—স্মিথ জবাব দেয়।

দ্যাটস রাইট! লোকটা কর্মঠ, বিপ্লব করার যুগ্যি। আজকাল বিদ্রোহী মিশর সৈন্যবাহিনীর একচ্ছত্র নেতা।

কিন্তু···আপনাকে দেখে ব্রায়ান স্মিথ কথা বলতে একটু ইতস্ততঃ করেন। আপনি অপরিচিত···তাই গোপনীয় কিছু নিয়ে আপনার সামনে আলোচনা করতে তার সংকোচ। কিন্তু আঁতোয়ান ব্রায়ান স্মিথের সংকোচ ভেঙ্গে দেয়। কারণ আপনি আঁতোয়ানের বন্ধু। তার জীবিকা পেশা সম্বন্ধে সব খবরই আপনার জানা আছে। সময় সময় আপনি আঁতোয়ানকে খবর সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাই আপনার সামনে গোপনীয় কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা নেই। এ খবরটা জেনে ব্রায়ান স্মিথ যেন সোয়াস্তি বোধ করে।

* * *

ইজিপ্টের খবর ব্রায়ান স্মিথের অজানা নেই। খবর সংগ্রহ করাই তো পেশা! এ খবর যোগাড় করতে তাকে কতো টাকা ঢালতে হয় তার হিসেব নিকেশ নেই। আর এই কাজের জন্যে তাকে নিত্যি কায়রো-আলেকজান্দ্রিয়া শহর ঘুরতে হয়। কতো বড়ো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়। সুন্দরী মেয়েদের প্রেমে হাবুডুবু খেতে হয়, শুধু ইজিপ্টের গুপ্ত খবর জানবার জন্যে।

আজ ইজিপ্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আঁতোয়ানের একটা কথা মনে পড়লো।

সেদিন কে জানি তাকে বলছিলো যে, ইজিপ্টের সম্রাট ফারুকের রাজত্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাজত্বের মেয়াদ শেষ হবেই বা না কেন বলুন? যথেচ্ছাচারে ফারুকের জুড়িদার আর কোথাও আপনি পাবেন না। নাচ গান আর মেয়েমানুষ এই নিয়ে তো তার দিন কাটে। দেশের ভালো মন্দের দিকে ঝোঁক দেবার সময় তার নেই। দেশের ভেতর কী ঘটছে তার হিসেব সম্রাট রাখেন না। তাই প্রতিদিনই দেশের দুর্নীতি বাড়ে। প্রজারা বিক্ষুব্ধ হয়। বাজারে জোর গুজব, ফারুকের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙেগ পড়বে।

এই তো সেদিন ইসরাইলের সঙ্গে লড়াই হয়ে গেলো। আর এই সংগ্রামে ইজিপ্টের সৈন্যবাহিনীকে বিস্তর নাস্তানাবুদ হতে হলো।

যুদ্ধে হারার প্রধান কারণ, লড়াই করার জন্যে সব পচা মাল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো যুদ্ধে ইজিপ্টের পরাজয় হলো। সবার কাছে সৈন্যবাহিনীর মাথা কাটা গেলো। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মান সম্মানের দিকে নজর দেবার সময় কোথায় সম্রাটের! তার প্রধান পেশা এবং নেশা ফূর্তি আর মেয়েমানুষ।

সেদিনকার ঘটনার বিবরণী দিল আঁতোয়ান। ব্রায়ান স্মিথ চুপ করে এই খবর শোনেন। প্রতিদিনই এ ধরনের বহু ছোটখাটো খবর শুনতে পান ব্রায়ান স্মিথ। কোন খবরটা জরুরী, কোন খবরের গুরুত্ব নেই এইটে যাচাই করা হলো ব্রায়ান স্মিথের কাজ। আর জরুরী খবরের সংগে নিজের মন্তব্য যোগ করে সেই খবর পাঠিয়ে দেন তার মনিব এ্যালান ডালেসের কাছে।

* * *

আঁতোয়ানের সংগে ব্রায়ান স্মিথের প্রায়ই দেখা হয়। প্রতিদিনই কিছু না কিছু খবর এনে দেয় আঁতোয়ান। মধ্যপ্রাচ্যে তো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এইতো সেদিন ব্রায়ান স্মিথ খবর পেলেন যে, ইজিপ্টের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আর এই বিপদের আশংকা করে সম্রাট ফারুক শাসনতন্ত্রের অদল বদল করছেন। প্রজাদের খুসি করার জন্যে তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু করলে কী হবে, অবস্থার উন্নতি হয় না।

মন্ত্রীত্বের অদল বদল হয়। প্রথমে প্রধান মন্ত্রী হলেন ওয়াফদ দলের নেতা নাহাস পাশা। কিন্তু তিনি দেশের ভেতর কোন উন্নতি আনতে পারলেন না। এবার ডাক পড়লো হিলালী পাশার। যদি তিনি কিছু করতে পারেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কিছুই হলো না। তাই প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসানো হলো হুসেন শিরী পাশাকে।

একদিন ব্রায়ান স্মিথ জানতে পারলেন যে, সম্রাটের ভগ্নীপতিকে যুদ্ধমন্ত্রী করা হচ্ছে। ব্রায়ান স্মিথ আন্দাজ করলেন যে, এই নিয়ে দেশের ভেতর বিস্তর হাঙগামা হবে। কারণ সম্রাটের ভগ্নীপতিকে প্রজারা এবং সৈন্যদল কখনই বরদাস্ত করবেনা। বহুদিন থেকে সৈন্যদের নেতা নেগুইব যুদ্ধমন্ত্রী হবার জন্যে পাঁয়তারা করছেন।

ব্রায়ান স্মিথের বুঝতে অসুবিধা হলোনা যে ইজিপ্টে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাই, একদিন বেরুটের আস্তানা গুটিয়ে এলেন কায়রোতে। এখানে এসে খোঁজ খবর আরম্ভ করলেন। প্রথমে খবর নিলেন কর্ণেল নাসেরের। নাসেরের নাম তখন কেউ ভালো করে জানেনা। কিন্তু ব্রায়ান স্মিথ সেদিন আন্দাজ করেছিলেন যে ইজিপ্টের ভবিষ্যৎ হর্তা-কর্তা বিধাতা হবে এই কর্ণেল নাসের।

হঠাৎ একদিন কায়রো শহরে বিদ্রোহের ঝড় ভেঙ্গে পড়লো। দিন তারিখটা ব্রায়ান স্মিথের স্মরণ আছে। বাইশে জুলাই, ১৯৫২ সাল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে নেগুইব-নাসের ফারুকের রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহী সৈন্যরা শহরের বড়ো-বড়ো ঘাঁটি দখল করে নিল।

ভয় পেয়ে সম্রাট আমেরিকান রাজদূতের কাছে সাহায্য চাইল। রাজদূত তখন জেফারসন কাফেরী। তিনি ছিলেন ফারুকের বিশেষ বন্ধু। তারই সাহায্য নিয়ে ফারুক ইজিপ্ট ত্যাগ করে গেলেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে তার জাহাজ ছাড়লো। যাবার সময় বিস্তর ধনদৌলত নিয়ে গেলেন সম্রাট।

সম্রাট যখন ইজিপ্ট থেকে বিদায় নিচ্ছেন তখন বন্দরঘাটায় দাঁড়িয়েছিলেন ব্রায়ান স্মিথ। সম্রাট চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রায়ান স্মিথের কর্মতৎপরতা বাড়লো। চক্রান্তের জাল ছড়াবার চেষ্টা করলেন ব্রায়ান স্মিথ। কিন্তু তার চেষ্টা সফল হলো না ব্রায়ান স্মিথের অভিসন্ধি সফল হবার আগেই নাসের মিশরের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। ব্রায়ান স্মিথ একটু আতঙ্কিত হলেন। কারণ তিনি জানেন যে, নাসেরকে নিয়ে বিস্তর ঝক্কি পোহাতে হবে তাকে। ভবিষ্যতে তাকে আরো কাজ করতে হবে।

* * *

ইজিপ্টের বিপ্লবের বেশ কিছুদিন বাদে ব্রায়ান স্মিথের সঙ্গে আঁতোয়ানের আবার লিডোর রেস্তোরাঁয় দেখা হলো। কিছুদিনের জন্যে বেরুটে ফিরে এসেছিলেন ব্রায়ান স্মিথ।

কী করব? ব্রায়ান স্মিথ তার গতানুগতিক প্রশ্ন করেন। ব্রায়ান স্মিথ তো জানেন যে, খবর দেবার জন্যেই আঁতোয়ান তার সঙ্গে লিডোর রেস্তোরাঁয় দেখা করতে এসেছে।

খবরটা ভারী ইন্টারেষ্টিং। আমার বন্ধু সুলতানকে চেনো?

কোন সুলতান? সেই যে ইরাণের বিপ্লবের সময় যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো? কেন, কী হয়েছে তার?—অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করেন ব্রায়ান স্মিথ। সুলতানের নাম শুনে ব্রায়ান স্মিথের চিন্তাশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে।

ঠিক বলেছো। সেদিন সুলতান ছিলো ইরাণের প্রধান মন্ত্রী মোসাদেগের ডান হাত। যাক, আজ কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ সুলতানের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সুলতানের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শেখ—তার আসল নামটা নাইবা বললাম। তার কাছে এ খবর শুনলাম।

কী খবর ? একটু ব্যাকুল হয়েই ব্রায়ান স্মিথ এই প্রশ্ন করেন।

রুশদের কাছ থেকে নাসের হাতিয়ার কিনছে। আঁতোয়ান জবাব দেয়।

খবরটা শুনে ব্রায়ান স্মিথ একটু নড়ে চড়ে বসেন। সত্যিই এ খবরটা লোভনীয়। কিছুদিন আগে নাসের আমেরিকান সহকারী ষ্টেট্‌স্ সেক্রেটারী মিঃ বায়রোডের কাছে হাতিয়ার চেয়েছিলেন। আরব দেশের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ইসরাইল। তাদের শায়েস্তা করার জন্যে ইজিপ্টের হাতিয়ার চাই। কিন্তু হাতিয়ার দেবার আগে বিস্তর কথা শোনাতে লাগলেন। বললেন, শর্ত করো তবে হাতিয়ার দেবো। কী শর্ত ? প্রথমতঃ হাতিয়ার দেখবার জন্যে কায়রোতে সাপ্লাই মিশন বসবে। কিন্তু নাসের স্পষ্ট জবাব দিলেন, কোন শর্ত করে তিনি হাতিয়ার নিতে রাজী নন।

ভাবনায় পড়েন জন ফস্টার ডালেস। হালে তিনি মধ্য প্রাচ্য সফর করে গিয়েছেন। এই অঞ্চলকে নিয়ে তিনি এক মিলিটারী প্যাক্ট করার স্বপ্ন দেখছেন। এই প্যাক্টের নাম হবে 'বাগদাদ মিলিটারী' প্যাক্ট। তাঁর বড়ো ইচ্ছে নাসের এই প্যাক্টে যোগ দেয়। কারণ এই মিলিটারী প্যাক্টের ভেতর নাসের থাকলে তার আর কোন ভাবনা নেই। রুশদের তিনি আর পরোয়া করবেন না।

ডালেস যখন কম্যুনিজম আর রুশদেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন তখন একদিন খবর পেলেন যে, নাসের রুশদের কাছ থেকে হাতিয়ার কিনছে। আর সেই খবরের প্রথম আভাষ পাওয়া গেলো আঁতোয়ানের কথায়।— তাই একটু খুলেই বলো না।

বেশ, শোন তাহ'লে। শেখের ভাষায় তোমায় এ কাহিনী খুলে বলি। সুলতান আমায় বলল ··

* * *

ইসরাইলের সঙ্গে যখন ইজিপ্টের লড়াই হচ্ছে নাসেরের ডান হাত সালা সালেম দামাস্কাসে। একটা জরুরী কাজের ফয়সলা করতে তিনি সিরিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নাসের তাকে ডেকে পাঠালেন। ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করাতো চাট্টিখানি কথা নয়। ওদের পশ্চিম জগতে বিস্তর বন্ধু আছে। চাইলেই হাতিয়ার পাওয়া যায়। ওদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো হাতিয়ার ইজিপ্টের নেই। অতএব এবারের লড়াইতে ইজিপ্টের পরাজয় হলো।

লড়াই শেষে নাসের এক মিটিং করলেন। কারণ ইসরাইল তো আজকের শত্রু নয় ভবিষ্যতের দুশমন। এ শত্রুকে রুখতে হলে উপযুক্ত হাতিয়ারের প্রয়োজন। ইসরাইলের মস্তো বড়ো বন্ধু ইংরেজ এবং আমেরিকা। এদের সাহায্য নিয়ে ইসরাইল বেঁচে আছে। আর সেই টাকা দিয়ে ইসরাইল আমেরিকা থেকে হাতিয়ার কিনছে। কিন্তু ইজিপ্টের তো টাকা নেই। হাতিয়ার

আসবে কোথেকে ?

আমেরিকার কাছে হাতিয়ার চাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ইজিপ্টকে হাতিয়ার দিতে ডালেস রাজী ন'ন। বললেন, ইজিপ্টকে হাতিয়ার দিলে মধ্যপ্রাচ্যে ঝগড়া বিবাদ বাড়বে। কিন্তু একদিন ভগবান নাসেরকে হাতিয়ারের সন্ধান দিয়ে দিলেন। বেশ সহজেই হাতিয়ার সংগ্রহ করা হলো।

বান্দুং-এ আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলোর সম্মেলন বসেছে। বিভিন্ন দেশের মহারথীরা সবাই এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। নেহেরু-সোকার্নো-চৌ-এন লাই। নাসের গেলেন সেই সম্মেলনে যোগ দিতে।

কনফারেন্সে বৈঠকের মাঝে একদিন চৌ-এন লাই এবং নাসেরের সঙ্গে মোলাকাৎ হলো। এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। দুজনেরই দুজনাকে জানবার আগ্রহ অপরিসীম। বিশ্বনীতি আর আরব রাজনীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। চৌ-এন লাই সব ব্যাপারেই বেশ খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন।

নাসের বললেন যে, আরবদের প্রধান শত্রু হলো ইসরাইল। আর এই ইসরাইলের পেছনে আছে বড়ো বড়ো শক্তিশালী দেশ। আরব দেশগুলোকে কাবু করার জন্যে ইসরাইলকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। আর যতোদিন ইসরাইলের অস্তিত্ব থাকবে ততোদিন আরব দেশগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু ইসরাইলের সংগে লড়াই করা চাট্টিখানি কথা নয়। শুধু লোকজন নয়, এই লড়াইর জন্যে হাতিয়ার চাই। কিন্তু ইংরেজ বা আমেরিকা এই হাতিয়ার ইজিপ্টের কাছে বিক্রী করবে না।

একটু চুপ করে থেকে নাসের চৌ-এন লাইকে প্রশ্ন করেন, আমাদের হাতিয়ারের প্রয়োজন। বিক্রী করবে না হাতিয়ার ?

এই প্রশ্ন শুনে চীনা প্রধানমন্ত্রী হতবাক্‌। তিনি মহাধুরন্ধর। মনের কথা কখনও ভাষায় প্রকাশ করেন না। তাই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, আমাদের নিজেরও হাতিয়ারের প্রয়োজন। এর জন্যে আমাদের রুশ দেশের কাছে হাত পাততে হয়।

তখনও রুশ আর চীন দেশের ভেতর ভাঙ্গন ধরেনি। দুই দেশের ভেতর ভারী মিতালি। হঠাৎ চৌ-এন লাই জিজ্ঞেস করেন রুশ দেশের কাছ থেকে হাতিয়ার কিনতে আপত্তি আছে ?

নাসেরের তখন হাতিয়ারের বড্ডো প্রয়োজন। সে হাতিয়ার যে দেশ থেকেই আসুক। তাই এ প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ করেন না।

আলোচনা শেষে ঠিক হলো চৌ-এন লাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব কায়রোর রুশ রাজদূতের মারফৎ দেবেন।

বান্দুং সম্মেলনের কিছুদিন বাদ কায়রোতে একদিন রুশ রাজদূত সলোড মেজর সালা সালামের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজদূত ডানিয়েল সলোডের কিন্তুর নাম। সালা সালেমের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি কথা হলো। তিনি

বললেন যে, চৌ-এন লাইর মারফৎ রুশ সরকার ইজিপ্টের অনুরোধ পেয়েছেন। এ নিয়ে তারা বিস্তর চিন্তা করেছেন এবং সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইজিপ্টকে হাতিয়ার দেওয়া হবে। এই হাতিয়ারের পরিবর্তে তারা ইজিপ্টের কাছ থেকে তুলো এবং চাল কিনবেন।

কথায় কথায় সলোড জানালেন যে, রুশ দেশ ইজিপ্টকে আসোয়ান বাঁধ তৈরী করার জন্যে টাকা দেবেন।

সলোডের এই প্রস্তাবে নাসের বিস্মিত। তিনি চেয়েছিলেন হাতিয়ার শুধু হাতিয়ার নয়, এর পরিবর্তে পাওয়া গেলো আসোয়ান বাঁধ বানাবার টাকা। এই বাঁধের টাকার জন্যে নাসের রোজ রোজ ইংরেজ আমেরিকার দোরে হানা দিয়েছেন। কিন্তু কেউ টাকা দিচ্ছে না।

সলোডের প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করার জন্যে ক্যাবিনেটের বৈঠক বসলো। শুধু হাতিয়ার কেনার প্রশ্ন নিয়ে নয় আসোয়ান বাঁধের ঋণ নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনা হলো। ক্যাবিনেটের বৈঠক শেষে নাসের আমেরিকার রাজদূত বায়রোডকে ডেকে পাঠালেন।

এইখানে একটু অতীতের কাহিনীকে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। বায়রোডের আগে কায়রোতে আমেরিকার রাজদূত ছিলেন কাফেরী। নাসের এবং ইজিপ্ট সরকারকে টাকা ঋণ দেবার জন্যে তিনি প্রথম থেকে আমেরিকান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। তার প্রস্তাবে ছিলো যে, আমেরিকার সাহায্যে আসোয়ন বাঁধ তৈরী করা হোক। এই বাঁধ তৈরী করা ইজিপ্টের একান্ত প্রয়োজন।

১৯৫৩ সালে বায়রোড এলেন কাফেরীর পরিবর্তে কায়রোতে। বায়রোডে৷ বয়স অল্প। বেশ কয়েকদিনের ভেতর নাসেরের সঙ্গে তার ভারী বন্ধুত্ব হলো। বায়রোডও নাসেরকে সাহায্য করার পক্ষপাতী।

হঠাৎ একদিন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস আভাষ পেলেন যে রুশ দেশ নাসেরকে হাতিয়ার দিচ্ছে। এই খবরে ডালেস সাহেব শুধুমাত্র বিচলিত নয় চিন্তিতও হলেন। কারণ এতদিন মধ্যপ্রাচ্যে রুশ দেশ ঢুকতে পারেনি। এবার এই হাতিয়ার বিক্রির অজুহাতে এই অঞ্চলে রুশ দেশ আস্তানা গাড়বে। কিন্তু ডালেস এই হাতিয়ার সাপ্লাইর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলেন না। মনের রাগ পুষে রাখলেন। ভাবলেন সুবিধে মতো এর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

এদিকে সলোডের প্রস্তাবে নাসের বিস্মিত। কারণ তিনি আমেরিকার কাছ থেকেও এতোটা সাহায্যের প্রত্যাশা করেননি।

জুন মাসের শেষে একদিন সলোড আবার ইজিপ্ট সরকারের কাছে আর এক প্রস্তাব করলেন। রুশ দেশের প্রাভদা কাগজের নাম নিশ্চয় শুনেছেন? সেই প্রাভদার সম্পাদকের নাম শেপিলভ। তিনি ছিলেন রুশ দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। রুশ পররাষ্ট্রনীতি গঠনে তার যথেষ্ট হাত ছিলো। সলোড

বললেন যে, ইজিপ্টের জাতীয় দিবসে শেপিলভকে নেমন্তন্ন করা হোক। তার কথাবার্তার মূল্য আছে। এই সময়ে তিনি একবার কায়রোতে এলে রুশ ইজিপ্ট মিতালি আরো শক্ত হবে।

এই প্রস্তাবে নাসের বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন না।

কায়রোর নেমন্তন্ন পেয়ে শেপিলভ এলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার বেচাকেনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। ঠিক হলো, এই হাতিয়ারের সঙ্গে মিগ প্লেনও সাপ্লাই করা হবে। ইজিপ্টের পুরো চাহিদার খসড়া নিয়ে এবার শেপিলভ মস্কোতে ফিরে গেলেন।

কয়েকদিন বাদে ইজিপ্ট থেকে একদল সরকারী কর্মচারী এলো মস্কোতে। হাতিয়ার সাপ্লাই নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করার জন্যে।

এই আলোচনা হচ্ছিলো অতি গোপনে। কাকপক্ষীও এই আলোচনার কথা জানতে পারেনি।

কিন্তু লিডো রেস্তোরাঁয় বসে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর কর্মচারী ব্রায়ান স্মিথ এর আভাষ পেয়েছিলেন। আর তার মারফৎ এই খবরের পুরো ফিরিস্তি পেয়েছিলেন সি আই. এর মনিব অ্যালান ডালেস এবং তার ভাই জন ফস্টার ডালেস।

খবর পেয়ে ফস্টার ডালেস রেগে কাঁই হলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে, নাসেরকে এমনি শিক্ষা দেবেন যেন জীবনে কখনই না ভোলে ডালেসের নীতি কী। কিন্তু নাসেরকে ঠিক চিনতে পারেননি ডালেস। নাসেরকে কাবু করতে গিয়ে তিনি নিজেই কাহিল হলেন।

সে কাহিনী বারান্তরে বলা যাবে। আজ কিম ফিলবির কাহিনী বলতে গিয়ে আমি ব্রায়ান স্মিথের গল্প অনেকটা করেছি। এই রসালো কাহিনী বলার প্রয়োজন ছিলো। কারণ ব্রায়ান স্মিথ এবং কিম ফিলবি ছিলো একই সুতোয় বাঁধা, একই পথের পথিক।

* * *

আমি জানি কিম ফিলবির কাহিনী শোনবার আপনার ভারী ইচ্ছে। কারণ ফিলবিকে নিয়ে সম্প্রতি লন্ডনের দৈনিক কাগজগুলোতে যে হৈ-হল্লা হয়ে গেলো তারপর সমস্ত ঘটনা জানবার ঔৎসুক্য কার না হয়। কিন্তু ফিলবির পুরো ঘটনা বলতে গেলে এ কাহিনীর ভেতর সুলতানকে টেনে আনতে হবে।

কিম ফিলবির প্রকৃত পরিচয় আমার জানা ছিলো না। শুধু জানতাম যে, ফিলবি হলো লন্ডনের এক কাগজের প্রতিনিধি। একটু বাদেই তার পুরো পরিচয় পেলাম। ফিলবির সঙ্গে দু'একটা কথাবার্তা বলার পর কল্যাণী সেন আমাদের আলোচনায় বাধা দিল। ফিলবিকে বলল, মাপ করবেন, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করে দেবার জন্যে, বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে যাচ্ছি।

তারপর আমাকে নীচু কণ্ঠস্বরে বলল : বিক্রম, মধ্যপ্রাচ্যকে যদি ভালো করে

জানতে চাও তবে ইউ মাস্ট মিট্ সুলতান।

সুলতান কে? আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের সুর।

আমার প্রশ্ন শুনে কল্যাণী সেন এক ঝলক হেসে ওঠে। তারপর বলে: তোমার প্রশ্ন শুনে একটুও বিস্মিত হইনি। এ অঞ্চলের সবাই জানতে চায় সুলতান কে? সুলতানকে জানবার আগ্রহ সবারই। সুলতানকে জিজ্ঞেস করো: কী তার পরিচয়? বলবে: ব্যবসায়ী। কার্পেটের ব্যবসা করে। কিন্তু আমি জানি মিঃ সেন জানেন যে, সুলতান হলো একজন খবর সংগ্রহকারী অর্থাৎ তোমরা যাকে বলো স্পাই।

- স্পাই! আমি একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি।

ঠিকই বলেছ স্পাই। এই অঞ্চলে এর মনিব হলেন ব্রায়ান স্মিথ। কিন্তু স্মিথ সাহেবের দেখা সাক্ষাৎ কখনোই পাবেনা। তার সব কাজই করে আইভোয়ান আর সুলতান। মধ্যপ্রাচ্যের কোথায় কী ঘটছে সবই সুলতানের নখদর্পণে। কেন বিপ্লব হলো যদি তার পুরো কাহিনী জানতে চাও তবে সুলতানের স্মরণাপন্ন হও। নেভার মাইন্ড, লেট আস মিট সুলতান।

আমি কিম ফিলবিকে ত্যাগ করে সুলতানের কাছে এলাম। সেদিন ফিলবির সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলিনি।

কল্যাণী সেনের পীড়াপীড়িতে সুলতানের কাছে চলে এসেছিলাম। কিন্তু পরে আমার অনুশোচনা হয়েছিলো ফিলবির সঙ্গ কেন বেশী কথা বলিনি।

ঘরের একপ্রান্তে সুলতান দাঁড়িয়েছিলো। অল্পবয়সী কিন্তু তার চেহারা কাউকে আকৃষ্ট করে না। তাই আপন মনে দাঁড়িয়েছিলো। তার চারপাশে কোন ভীড় ছিলোনা। কী ভাবছিলো জানিনা। আমি আর কল্যাণী সেন তার চিন্তায় বাধা দিলাম।

সুধামিশ্রিত কণ্ঠে কল্যাণী সেন প্রশ্ন করল: কী ভাবছ সুলতান? কীফক্ হাল?

হঠাৎ একটু চমকে গিয়ে সুলতান জবাব দেয়: কোয়ায়েস। সু আখবর মিন আল হিন্দ ··

হ্যালো মিসেস সেন! সত্যি এ অভাগার প্রতি আপনি যে দৃষ্টি দেবেন এ কিন্তু আমি ভাবিনি।

না, ভারতবর্ষ থেকে কোন নতুন খবর নেই। যাক্, সুলতান আমার এক বিশেষ বন্ধুকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম বিক্রমাদিত্য—সাহিত্যিক, সাংবাদিক অর্থাৎ সবজান্তা। আর ইনি হলেন—সুলতান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির আবহাওয়ার অথরিটি। জানতে চাও কোন দেশে কী ঘটছে? সুলতানকে জিজ্ঞেস করো। বাসী খবর নেই—সব টাটকা খবর পাবে। তাই নয় কী? মিসেস সেন এই বলে সুলতানের পানে তাকায়। তারপর বলে: সুলতান—নামে সুলতান কাজকর্মেও সুলতান।

সুলতান এবার কল্যাণী সেনের কথার প্রতিবাদ করে। বলে : আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন মিসেস সেন। আমার জন্যে আপনি যতোগুলো বিশেষণ ব্যবহার করলেন, আমি তার কোনটার যোগ্য নই। আমি এই অঞ্চলের অথরিটি নই, সামান্য দর্শক মাত্র।

অর্থাৎ আপনি নাটকের পরিচালক ন'ন, শুধুমাত্র অভিনেতা।

না সামান্য ক্যাপার বয়—আমার কথার সংশোধন করে সুলতান বলে। যাক আপনি মিসেস সেনের বন্ধু অর্থাৎ আমাদেরও বন্ধু। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি।

বিক্রমাদিত্য, এবার তুমি যোগ্য লোকের হাতে পড়েছ। যাক্, তোমাদের এই আলাপ আলোচনা শোনবার সময় আমার আজ হবে না। বহু অতিথি এখনও আসছে। এবার তাদের প্রতি নজর দেওয়া দরকার।

এই বলে কল্যাণী সেন চলে যায়। আমি আর সুলতান একা দাঁড়িয়ে থাকি। সুলতান আমাকে প্রশ্ন করে : আপনি ফিলবিকে চেনেন? সুলতানের কণ্ঠস্বরে কৌতূহল ছিল।

ফিলবি! হু হিজ ফিলবি? আমি একটু বিস্মিত হয়েই এই প্রশ্ন করি।

এই খানিকক্ষণ আগে যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন। তিনি হলেন লণ্ডনের এক কাগজের সংবাদদাতা। কিন্তু আমাদের কাছে ওর ভিন্ন পরিচয়। আমরা ওকে চিনি ভিন্ন নামে। এ বাজারে জোর গুজব ফিলবি হলো রাশিয়ার লোক। কেউ বলে ও হলো এম আই. সিক্সের কর্মচারী। সত্যি মিথ্যে জানিনে, ওর সম্বন্ধে বাজারে বহু গুজব প্রচলিত আছে।

তাহলে সবাই ওকে অযথা সন্দেহ করে কেন? আমি এ প্রশ্ন না করে পারিনে।

ঐটেইতো মজার ব্যাপার! জানেন বিক্রমাদিত্য, বেরুট হলো স্পাইদের মক্কা। একদিন আসুন না আমার সঙ্গে। বিভিন্ন দেশের স্পাইদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো। দেখবেন লিডো রেস্তোরাঁয় লোকজন ভর্তি। সকাল সন্ধ্যা লোক আসছে যাচ্ছে। এরা হলো এজেন্ট। ভদ্র ভাষায় বললে সংবাদ সংগ্রাহক। বড়ো বড়ো কর্তারা ঘরের ভেতর বসে থাকেন। চুনোপুঁটিরা খবর সংগ্রহ করে এনে কর্তাদের দেয়। জানতে চান, কাল বাগদাদে কী হবে? ঐ লিডোতে গিয়ে ঘণ্টা খানেক বসুন। সবকিছুর আভাষ পাবেন। আপনার কোন গোপনীয় ফাইলের কপি চাই? অপেক্ষা করুন লিডো রেস্তোরাঁয়। কনটাক্ট ম্যানের সাক্ষাৎ করুন; আপনাকে ফাইলের কপি এনে দেবে।

পয়সা ঢালুন বাঘের দুধ পাবেন। এ হলো কামিনী-কাঞ্চনের শহর। কামিনীর আভাষ নিশ্চয় পেয়েছেন? এবার কাঞ্চনের কথা আপনাকে বলি। এই কাঞ্চন কাননে আপনি আপনার লোকের দেখা পাবেন। লিডো হলো স্পাইদের শেয়ার মার্কেট। অর্থাৎ বাজারে কোন খবরের কোন গোপন দলিলের

কী দাম তার আভাষ এইখানে পাওয়া যাবে।

সুলতানের কথায় আমি বাধা দিই। বলি : আপনি কিম ফিলবির কাহিনী বলতে সুরু করেছিলেন।

সত্যি, বাই জোভ। কিম ফিলবির কথা বলতে গিয়ে আপনাকে রামায়ণ মহাভারত শোনাতে আরম্ভ করেছি। বিক্রমাদিত্য, ফিলবির কাহিনী বলতে গেলে আমাকে এম্বাসী এবং ডিপ্লোমাটদের জীবনী নিয়ে গল্প শুরু করতে হবে। আমরা হলাম বেরুট নগরীর বাসিন্দা। এর জীবনের সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত।

তাই শুনুন আমার দীর্ঘ কাহিনী। আমি জানি এ কাহিনী আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে তবু আজ এর আভাষ না দিয়ে পারছিনে। এই যে মিসেস সেনের পার্টিতে বসে আমি আপনি ড্রিংক করছি। এই যে অসংখ্য অতিথি ইভনিং সুট পরে সেন সাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে ঘরে ঢুকছে, এরা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রুচির এবং এদের আগমন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। সাংবাদিক খবর সংগ্রহ করে, ব্যবসায়ী তার বিজনেস বাড়াবার চেষ্টা করে। আর এম্বাসীর লোক আপনার পেট থেকে খবর বের করে নেয়। কারণ খবর সংগ্রহ তাদের কাজ, তাদের পেশা। গুপ্তচরদের ভাষায় এ হলো ইনটেলি-জেন্সের কাজ।

আগেই বলেছি এম্বাসীর প্রধান কাজ হলো গুপ্ত খবর সংগ্রহ করা। আপনি কোন দেশের ডিপ্লোমাট। আপনার দেশের সরকার আপনাকে মোটা মাইনে দিচ্ছে। তার উপর ফরেইন এ্যালাউন্স, ছেলেদের এডুকেশন এ্যালাউন্স এবং সর্বশেষে এনটারটেণ্টমেণ্ট এ্যালাউন্স। এতো মোটা টাকা দিয়ে আপনার সরকার আপনাকে পুষছে শুধু গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার জন্যে। তাই এম্বাসীগুলোকে যদি গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার আড্ডাখানা বলেন তবে কোন অত্যুক্তি হবে না। গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার ব্যাপারে সবচাইতে পারদর্শী হলো বড়ো বড়ো দেশের দূতাবাসগুলো। আপনার দেশের খবর সংগ্রহ করার জন্যে এরা বিস্তর টাকা খরচ করছে। আর খবর সংগ্রহ করার জন্যে বিশেষ বিশেষ লোক বসে আছে। এদের চেনবার যো নেই। কোন এক এম্বাসীর ড্রাইভারের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো। আপনি ভাবছেন লোকটা ড্রাইভার। কিন্তু আপনি ভুল করলেন। এর আসল কাজ হলো স্পাইং। যদি কখনও ভেতরের সন্ধান নে'ন তবে দেখবেন লোকটা তার দেশের একজন হোমড়া চোমড়া কর্মচারী। হয়তো পদমর্যাদায় এম্বাসাডারের চাইতে গণ্যমান্য। ড্রাইভারের কাজটা হলো ওর কভার। আসল যে কাজ তা জানবার উপায় নেই।

মস্কো ওয়াশিংটনে অবস্থিত দূতাবাসগুলোতে এ ধরনের অনেক লোক আছে। এদের ছাড়া খবর সংগ্রহ করার জন্যে আরো লোক আছে, বিভিন্ন পন্থা আছে। যেমন ধরুন কম্যুনিস্ট সরকার বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টির মারফৎ

খবর পায়। আমেরিকা এবং ইংরেজ সরকার তাদের ব্যবসায়ীর মারফৎ খবর সংগ্রহ করে।

কিন্তু যে সব দেশে ডিমোক্রেসী আছে অর্থাৎ যাদের পুলিশি স্টেট স নয় সেখানে খবর সংগ্রহ কঠিন কাজ নয়। কারণ সংবাদপত্র মারফৎ বহু জরুরী খবরের আভাষ পাবেন। এখানে আলোচনায় কোন বাধা নেই। সংবাদপত্রের মারফৎ দেশের চতুর্দিকে কী হচ্ছে জানা যায়। কিন্তু চীন দেশের কোন খবর সংবাদপত্র মারফৎ জানতে পারবেন না।

তারপর ধরুন এই সব দেশে কোন একটা নতুন জিনিষের আবিষ্কার হলো। অমনি টেকনিক্যাল ম্যাগাজিনে এই নিয়ে লেখালিখি সুরু হয়ে গেলো। পার্লামেণ্টের খবর থেকে সরকার কী করছে জানতে পারলেন। এ ছাড়া খবর সংগ্রহ করার আরো বহু উপায় আছে। তার পুরো বিবরণী দিয়ে আপনার মনকে ক্লান্ত করতে চাইনে।

যারা খবর সংগ্রহ করে তাদের বলা হয় 'এজেণ্ট'। অবশ্যি আজকাল এদের নামের অভাব নেই। কাউকে বলা হয় 'ইনফরমার'। কখনও বলা হয় 'সোরস্'। আজকাল এজেণ্ট নামটার এতো অপলাপ হয়েছে যে, অনেকে নিজেকে এজেণ্ট না বলে 'ভলাণ্টিয়ার' বলে।

শুধু মাত্র দূতাবাস নয়, দূতাবাসের মারফত আরও বহু লোক এ খবর সংগ্রহ করে। অবশ্যি দূতাবাসের সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই। এরা যেচে এসে খবর দিয়ে যায়। হয়তো প্রথমে এদের খবরে আপনার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু একটু সংবাদ যাচাই করে দেখুন। দেখবেন এরা ঠিক খবর দিচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে কম্যুনিষ্ট। কেউ বা আবার কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরোধী। এরা সামান্য এজেণ্ট নয়। টাকার লোভে এরা কাজ করে না। এরা হোমড়া চোমড়া আদমী। ইচ্ছে করে খবর এনে দেয়। এ ছাড়া ধরুন কম্যুনিষ্ট দেশ থেকে অনেক পাইলট লণ্ডন নিউইয়র্কে প্লেন নিয়ে আসে. এদের কাছে অনেক সময় ভালো খবর থাকে। অবশ্যি এই কাজে বাধা দেবার জন্যে চীন একটা পন্থা অবলম্বন করেছে। মিলিটারী প্লেনগুলোতে বেশী পেট্রোল ভরতে দেয় না। পাছে এরা প্লেন নিয়ে বিদেশে চলে যায়। স্পাইং-এর ভাষায় এদের বলা হয় 'ডিফেকটর'।

খবর আদানপ্রদানের বহু উপায় আছে। অবশ্যি এম্বাসীর মারফৎ খবর দেওয়া হলো সবচাইতে নিরাপদ। কিন্তু এতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই খবর পাঠাবার জন্যে অন্য উপায় খুঁজতে হয়। চিঠি লিখে খবর পাঠাতে পারেন। অনেক সময়ে চিঠিতে কোড ব্যবহার করা যায়। ধরুন বড়ো একটা গোপনীয় দলিল পাঠানো হবে। এই দলিলে মাইক্রোডট ব্যবহার করুন। মাইক্রোডট হলো দলিলটাকে মাইক্রোফিল্ম করা এবং ফুলস্টপের পরিবর্তে চিঠিতে সেই মাইক্রোফিল্ম ব্যবহার করা।

এবার কোডের কথা কিছুটা বলি। কোন একটা শব্দ কিংবা একটা পুরো লাইন বা পুরো কাজের নির্দেশের জন্যে কোড ব্যবহার করতে পারেন। এই কোড অক্ষরে বা শব্দে হতে পারে। যুদ্ধের সময়. বিশেষ করে, রেডিওর মারফৎ বিদেশে খবর পাঠানো হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে য়ুরোপে মিত্র সৈন্যবাহিনী হানা দেবার আগে রেডিওর মারফৎ গরিলা যোদ্ধাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করায় জাপানী ডিপ্লোমাটদের কোডে সতর্ক করা হয়েছিলো। প্রতি জাপানী ব্রডকাস্টে আবহাওয়ার সংবাদ বলা হয়েছিলো 'ইস্ট-উইন্ড রেন'। এ কথার মানে হলো জাপানী এবং আমেরিকার রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্রমেই গুরুতর পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবার সাইফারের কথা কিছুটা শুনুন। অনেক সময় সাধারণ সাইফারে কোন একটা শব্দ বা অক্ষর, অন্য শব্দ বা অক্ষরের জন্যে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ সাইফারে একই শব্দ বা অক্ষর বার বার ব্যবহার করতে পারেন।

অংক কষে অনেক সময় সাইফার ভাঙ্গতে পারা যায়। এ ধরণের পন্থাকে বলা হয় 'ক্রিপ্টো এনালিসিস'। প্রতি দেশেরই একটা কোড বই থাকে। এই কোড বই দেখে সাইফার ভাঙ্গা হয়।

কোড বই অনেক সময় বিদেশী সরকারের হাতে গিয়ে পড়ে। তাই কিছুদিন পর পর কোড বদলানো হয়। অবশ্যি কোড শত্রুর হাতে পড়েছে কিনা অতি সহজেই জানা যায়।

লড়াইর সময় একদিন বৃটিশ নৌবাহিনী দেখতে পেলো যে, তাদের সাবমেরিন প্রায়ই ধরা পড়ছে। আর সব সময় একই জায়গায় ধরা পড়ে দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না তাদের কোড সিগন্যাল অন্যে জানতে পেরেছে। অমনি কোডের অদল বদল করা হল।

স্পাইং এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইনে, বিক্রমাদিত্য। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, যদি কোনদিন স্পাই হিসেব আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয় তবে জানবেন আপনার সাজা কঠোর দন্ড। কারণ আপনি যাদের হয়ে কাজ করছেন তারা স্বীকার করবে না যে, আপনার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ আছে। আপনি যদি ডিপ্লোমাট স্পাই হন তবে আপনাকে বড়ো জোর দেশত্যাগ করতে বলা হবে। প্রায়ই তো কাগজে দেখতে পান অমুক দেশের প্রথম সেক্রেটারীকে দেশ ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে। এরা শুধু নামে ডিপ্লোমাট কিন্তু এদের আসল কাজ হলো স্পাইং। ডিপ্লোমাটের কাজটা হলো 'কভার'। এরা কেউ সেনট্রাল ইনটেলিজেন্সের কর্মচারী, কেউ বা এম আই ফাইভ বা রুশ গুপ্তচর বিভাগ এম. ভি. ডি. বা জি. আর. ইউ'র কর্মচারী।

* * *

কিছুদিন বাদে সুলতান একদিন এসে আমার আস্তানায় হানা দিলো।

বললো—বিক্রমাদিত্য আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, এই অঞ্চলের পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। চলুন, আজ আমার সঙ্গে লিডো রেস্তোরাঁয়। আজ সেইখানে আমাদের বৈঠক বসবে। সেই বৈঠকে বড়ো-বড়ো নেতাদের দেখতে পাবেন। বাথ পার্টির কর্তারা থাকবেন। আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে বাথদলের নেতা মিশেল আফ্লাকের দেখাও পেতে পারেন।

বাথ পার্টি। বাগদাদ এবং দামস্কাসে যারা বিপ্লব করেছে? আমি জিজ্ঞেস করি। আমার প্রশ্নে ছিলো কৌতূহলের সুর।

হ্যাঁ, বাথ পার্টির কয়েকজনার সঙ্গে আজ আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মিশেল আফ্লাক, জিব্রান মাজদালানী, এলিয়াস ফেরজিলি, মোনা সোল সবাই আজ আসছে লিডোর রেস্তোরাঁয়। এরা সব সময়ে এই সরাইখানাতে আসেনা। কিন্তু আজ আসবে। বাথ পার্টির ভেতর হাঙ্গামা নিয়ে এরা সবাই আলোচনা করবে।

শুনছি বাথ পার্টির নেতাদের ভেতর মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে—আমি একটু সঙ্কোচে এই প্রশ্ন করি।

আমার প্রশ্ন শুনে সুলতান একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে। তারপর বলে—আপনার অনুমান মিথ্যে নয় বিক্রমাদিত্য। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মিশেল আফ্লাক আর সলাহউদ্দীন বিতার বাথ পার্টি গঠন করেছিলেন। তাই দলের নাম দিয়েছিলেন 'নবজাগরণ পার্টি বা বাথ'। কিন্তু আজ মধ্য প্রাচ্যর রাজনীতির আবর্তে পড়ে এই দলে ভাঙ্গন ধরেছে। বাথ পার্টির ইতিহাস দু'কথায় শেষ করা যাবে না। আসুন আমার সঙ্গে লিডো রেস্তোরাঁয়। সেইখানে বসে এর ইতিহাস শোনা যাবে'খন। আর দেরী নয়, চলুন। এর পর গেলে আর বন্ধুদের দেখা মিলবে না।

লিডো রেস্তোরাঁয় এসে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে হয়তো রাত এগারটা কিন্তু রৌসে তখনও জনকোলাহলে মুখরিত।

রেস্তোরাঁর এক প্রান্তে বাথ পার্টির নেতারা বসেছিলেন। এদের সঙ্গে সুলতান পরিচয় করিয়ে দিলো। বললো—জিব্রান মাজদালানী, এলিয়াস ফেরজিলি. এরা এই অঞ্চলের বাথ দলের বিশিষ্ট নেতা।

মজার ব্যাপার কী জানেন বিক্রমাদিত্য? এই বেরুট নগরীতে বাথ পার্টি বেআইনী। প্রকাশ্যে এদের কাজ করার কোন ক্ষমতা নেই। অথচ এখানে সবাই বাথ পার্টির অস্তিত্ব জানে।

এবার এলিয়াস ফেরজিলি মুখ খুললো। সুলতানকে সতর্ক করে বললো—সুলতান আমাদের ভারতীয় বন্ধুকে ভয় দেখিও না। উনি আতঙ্কিত হবেন।

আমি হেসে জবাব দিই, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল আমাকে আতঙ্কিত করেনা। কিন্তু যাক্ এসব কথা। এবার আপনাদের দলের কিছু

কাহিনী আমাকে শোনান। শুনেছি মধ্যপ্রাচ্যে নাসেরের দলের পর এইটে সব চাইতে বড়ো দল।

আমার প্রশ্নের জবাবে এলিয়াস ফেরজিলি বলেন—আপনার অনুমান মিথ্যে নয় বিক্রমাদিত্য। রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের পার্টি বেশ শক্তিশালী। আর নীতি হিসেবে বলতে পারেন এইটেই একমাত্র সোশালিস্ট দল। এ ছাড়া ছোটখাটো যে সব দল আছে, যেমন আরব ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট কিংবা প্রগেসিভ সোস্যালিস্ট পার্টি অথবা মুস্লিম ব্রাদারহুড এদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ নাসের। বললে অত্যুক্তি হবেনা কিন্তু কথাটা সত্যি, এই সব দল হলো নাসেরের ছবি। কিন্তু আমরা নাসেরের ভক্ত নই। আমরাও আরব ইউনিটি চাই কিন্তু এই একতা অর্জন করার জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আর নাসেরের মতের সঙ্গে পার্থক্য আছে।

উদাহরণ দিন—আমি কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করি! আমি সাংবাদিক, জানবার আগ্রহ অপরিসীম। তাই প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারিনে।

সুলতান এবার আমার কথার জবাব দিলো। বললো—বিক্রমাদিত্য, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি হলো গতানুগতিক গ্রামোফোন রেকর্ড। একসুরে বাজছে, এর ভেতর বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু তবু মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হলে এই গ্রামোফোন রেকর্ড ভালো করে শোনা দরকার। বলুন ফেরজিলি, আপনাদের পুরাণো কাসুন্দী আবার ঘেঁটে নিন।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে ফেরজিলি তার কাহিনী সুরু করে। কফির ভাণ্ড আমাদের চতুর্দিক ছড়িয়ে আছে। যেই মুহূর্তে এক কাপ শেষ হচ্ছে, অমনি আসছে আর এক কাপ। টার্কিশ কফি অসম্ভব তীব্র। দুকাপ খেলে রাত্রের ঘুমের নেশা ছুটে যায়।

ফেরজিলি বলে—বিক্রমাদিত্য এ হলো মধ্যপ্রাচ্য। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক তীর্থস্থান কোনটা?—জানেন কায়রো নয়, বাগদাদ নয় আম্মান নয়, এখানকার রাজনৈতিক তীর্থভূমি হলো দামাস্কাস। বহুজনার কাছ থেকে দামাস্কাসের কাহিনী শুনেছেন। হামিদিয়ার সুকের গল্প আপনার অজানা নেই। ওমাইয়াদ মসজিদের ইতিহাস আপনি জানেন, কিন্তু দামাস্কাসের রাজনৈতিক জীবনের সংগে আপনার পরিচয় নেই। এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ আছে যে, দামাস্কাসের রাজনীতিকে যে হাত করতে পারবে মধ্যপ্রাচ্যে তারই হবে জয়জয়কার।

তাই হজরত মুহম্মদ একদিন দামাস্কাস নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর আশংকা ছিলো যে, দামাস্কাস হাত না করতে পারলে তাঁর ধর্মপ্রচারে ব্যাঘাত ঘটবে। নাসেরও আজ দামাস্কাসকে হাত করতে চাইছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন? দামাস্কাস চিরকাল দামাস্কাসই থাকবে। কারও কাছে মাথা নত করবে না। এবার শুনুন দামাস্কাসের রাজনীতির কথা। আর এই রাজনীতির কথা বলতে গেলে আপনাকে বাথ পার্টির ইতিহাস জানতে হবে।

ফেরাজিলি এবার একটু চুপ করে। আমরা সবাই উদগ্রীব শ্রোতা। আর আপনারা যারা আজ এই কাহিনী পড়ছেন তারা পাঠক। এই রাজনীতির কাহিনী পড়তে গিয়ে আপনাদের মনে যদি কোন বিরক্তি আসে তবে মাপ করবেন। মধ্যপ্রাচ্যকে ভালো করে জানতে হলে এ কাহিনী জানা একান্ত আবশ্যক। তাই এ কাহিনী আমাকে একটু ফেনিয়ে বলতে হচ্ছে।

* * *

চলুন বিক্রমাদিত্য আপনাকে ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে নিয়ে যাই।

ফেরাজিলি বলতে লাগলো।

পারী, সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। আর কৃষ্টির আড্ডাখানা হলো স'রবো বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১৯ সাল, স'রবো বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দুটি অখ্যাতনামা ছেলে পড়তো। মিশেল আফ্লাক এবং সালাউদ্দীন বিতার। একজন ক্রীশ্চান ও অপরজন মুসলমান। ধর্ম নিয়ে এদের মাথা ঘামাবার সময় ছিলো না। রাজনীতি ছিলো এদের স্বপ্ন-আরাধনা।

মিশেল আফ্লাক গরীব ঘরের ছেলে। পয়সা কড়ির দুর্ভোগ তাকে যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আফ্লাকের বাবা ফরাসী সরকারের বিরোধিতা করে জেলে গিয়েছিলেন। কাজেই অর্থের কষ্ট তার কোনদিন ঘোচেনি।

স'রবো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে আফ্লাক আর বিতার এলেন দামাস্কাসে। পারীতে থাকাকালীন তারা সোস্যালিজম সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। দামাস্কাসে ফিরে এসে এবার সোস্যালিজম নিয়ে চর্চা শুরু করলেন। আর রাজনীতি নিয়ে চর্চা করার সব চাইতে ভালো জায়গা হলো স্কুল। বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যে। এখানকার ছাত্ররা রাজনীতি নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামায়। স্কুলের ছাত্রদের ভেতর আফ্লাক এবং বিতার সোস্যালিজমের বীজ ছড়াতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো সাংবাদিকতা। দু বন্ধুর চেষ্টায় আল তালিয়া' নামে একটি বামপন্থী কাগজ প্রকাশিত হলো।

কম্যুনিজম এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আফ্লাক এবং বিতারের পরিচয় ছিলো কিন্তু তখনই তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়নি। কম্যুনিজমের প্রতি তাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিলো না।

এই সময়ে পারীতে কম্যুনিষ্ট পার্টি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির আদেশ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট পার্টি চলতো। এ নীতির বিরোধী ছিলেন আফ্লাক এবং বিতার। বিদেশের রাজনৈতিক দলের হুকুম মানতে তাদের দ্বিধা ছিলো।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে। ইরাকে রসিদ আলী গিলানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করেছেন। দামাস্কাসে দুই বন্ধুর চেষ্টায়

গিলানীর জন্যে টাকা-পয়সা যোগাড় করা হল। এইসব কাজকর্মের জন্যে স্কুলের চাকুরী ছাড়তে হলো। কারণ লড়াইর বিরূদ্ধে আন্দোলন, ছাত্রদের নিয়ে সভা-সমিতি করা সহজ কথা নয়। এই সময়ে দামাস্কাসের আনাচে-কানাচে আফ্লাকের বৈঠক বসতো।

লড়াই শেষে সিরিয়ার শাসনতন্ত্রের অদলবদল হলো। এতোদিন দেশ শাসনের ভার ছিলো ফরাসীদের হাতে। এবার সিরিয়ানদের হাতে ক্ষমতা এলো। বেআইনী বাথ পার্টি বাজারে চালু হলো। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাথ পার্টির শাখা স্থাপিত হলো। লেবানন, জর্ডন এবং ইরাকের ছাত্ররা এসে বাথ পার্টিতে যোগ দিলো। এইসব দেশের সরকার বাথ পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু চিন্তিত হলেন। তাদের আদেশে বাথ পার্টিকে এই অঞ্চলে বে আইনী বলে ঘোষণা করা হলো। আজও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বাথপার্টি আইন সঙ্গত নয়।

১৯৪৭ সাল। দামাস্কাসে সর্বপ্রথম ইলেকশন হল। এই নির্বাচনে আফ্লাক এবং বিতার দলবল নিয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু বাথপার্টি তখনও বাজারে প্রকাশ্য কাজ করতে পারত না। নির্বাচনে জিততে হলে অন্য রাজনৈতিক দলের সাহায্যের প্রয়োজন। আফ্লাক এবং বিতার আক্রাম হুরানী নামে আর এক নেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন।

বিচিত্র মানুষ আক্রাম হুরানী। সিরিয়ার বহু রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশের সামরিক বাহিনীর উপর তার যথেষ্ট হাত ছিলো। দেশের রাষ্ট্রপতি শিশকলী তারই সাহায্য নিয়ে দেশের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু শিশকলী এবং হুরানীর বন্ধুত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তাই শিশকলীর বিরূদ্ধে লড়বার জন্যে হুরানী আফ্লাক এবং বিতারের সঙ্গে মিতালি করলেন।

বাথপার্টির নীতি নিয়ে কিন্তু কম ঝগড়া বিবাদ হয়নি। দলের সাগরেদদের ভেতর এই নিয়ে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হত। সবশেষে আফ্লাক ঠিক করলেন যে, বাথপার্টির নীতি তিনটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে হবে। এই তিন কাঠামোকে বলা হলো ত্রিমূর্তি। সোস্যালিজম, ইউনিটি এবং ফ্রীডম। দলের নীতি নিয়ে তো আর প্রকাশ্যে আলোচনা করার যো নেই। কারণ বাজারে বাথপার্টি বেআইনী। বাথপার্টির নেতারা গোপনেই মিটিং করতেন।

আফ্লাক কিন্তু স্বীকার করেছেন যে বাথ পার্টির নীতি গঠন করবার সময় তিনি মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জর্মান দার্শনিকদের মতবাদও তাকে বেশ আকৃষ্ট করেছিলো।

আফ্লাকের মতানুসারে আরব ইউনিটির জন্যে আরব দেশ এবং আরবদের অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এবং স্বার্থবাদের হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। আরব ইউনিটির আজ একান্ত প্রয়োজন।

এই একতা শুধুমাত্র দেশের উন্নতির জন্যে নয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সুখের জন্যেও আবশ্যক। আফ্লাক বলেন, স্বাধীনতা মানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করবার স্বাধীনতা এবং বিদেশী শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার স্বাধীনতা জাতীয়তবাদের অপরিহার্য অংশ।

আফ্লাক জানতেন শুধুমাত্র কথা বললে, বক্তৃতা দিলেই এই নীতি বাজারে চালু করা যাবে না। এর জন্যে কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন।

বাথপার্টির নীতিতে কিন্তু ইসলাম ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আফ্লাক স্বীকার করেছেন যে, আরব জাতীয় জীবনে ইসলাম এক অপরিহার্য অংশ। সমস্ত আরব জাতীয় জীবন ইসলাম ধর্মে পরিপুষ্ট। একে বাদ দিলে আরব জাতির প্রতিভা কখনই পরিস্ফুট হবে না।

ইসলাম তো শুধু ধর্ম নয়, এ হলো সভ্যতার প্রতীক। এবং আরব জাতির জাতীয় আন্দোলনের জন্যে ইসলামের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

আফ্লাক বিশ্বাস করেন নি যে, ধর্মের সঙ্গে ন্যাশনালিজমের সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। কারণ ধর্ম যেমনি মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, ন্যাশনালিজম হলো তেমনি আর একটি পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা। ধর্ম এবং ন্যাশনালিজম একই তালে চলে! আফ্লাক পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই কথা বললেন।

ইউনিটি, সোস্যালিজম এবং ফ্রীডম জাতীয় জীবনের রিএ্যাকশনারী মনোবৃত্তিকে দূর করে। সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের বিরোধী হল গোঁড়া মনোবৃত্তি। জীবনের অগ্রগতির জন্যে এই গোঁড়া মনোবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পাবার প্রয়োজনীয়তা আছে। পশ্চিমী সভ্যতা বা সংস্কৃতি আরব জাতিকে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে পারবে না। শুধুমাত্র বাথপার্টির ফ্রীডম, ইউনিটি এবং সোস্যালিজম আরব জাতিকে অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত করতে পারবে।

কথা বলতে বলতে ফেরাজিলি একটু দম নিয়ে নেয়। তারপর আবার তার কাহিনী বলতে শুরু করে। বলে: নিজের দেশের মাটিকে না ভালোবাসলে কখনই প্রকৃত জাতীয়তাবাদী হওয়া যায় না। দেশকে গালমন্দ করবেন, অথচ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন না এ কী কখনো সম্ভব! যারা বলে দেশের স্বাধীনতা চাই, আর্থিক উন্নতি চাই অথচ দেশের দুর্নাম করে তারা হলো দেশদ্রোহী। আফ্লাফ চিরকাল এদের বিরোধিতা করেছেন।

আফ্লাক এবং বাথপার্টির এই নীতি সমস্ত আরব জাতির ভেতর আলোড়ন এনেছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ অতি অল্পদিনের মধ্যে বাথপার্টি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বাথপার্টির জন্মস্থান হলো দামাস্কাস। আর এই নগরী থেকে বাথপার্টির চিন্তাধারা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

হুরানী দলে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাথপার্টি আরো শক্তিশালী হলো। আগেই বলেছি, সিরিয়ার রাজনীতিতে হুরানীর বেশ প্রতিপত্তি ছিলো। সবাই তাকে সমীহ করতো। তার কারণ, দেশের জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে হুরানী লড়াই করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

* * *

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো। এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এবার আমাদের বৈঠকে যোগ দিলেন। ফেরাঞ্জলি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো : এর নাম হলো নাখলে মুতরান, বিখ্যাত আরব কম্যুনিস্ট, বাগদাদের বন্ধু। আর সৈয়দ মুতরান, ইনি হলেন বিক্রমাদিত্য, ভারতীয় সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং হালচালের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। একে বাথপার্টির কিছু ইতিহাস বলেছি। কিন্তু আপনি বাগদাদের বন্ধু। আপনার মুখ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের কম্যুনিস্ট দলের কিছু কাহিনী শোনা যাক।

নাখলে মুতরান একটু মৃদু হাসলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো : আপনি ভারতীয়। সত্যিই আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুশী হলাম। আপনাদের রাজনীতি এবং পণ্ডিত নেহেরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বিক্রমাদিত্য। যে নীতি আপনারা অবলম্বন করেছেন, আজকালকার যুগে এর চাইতে ভালো নীতি আর নেই। আসল কথা কী জানেন, নেহেরুর নীতি কেউ ভালো করে বোঝেনি। তাই এই নীতির এতো বিরোধিতা। ভাবতে পারেন, নেহেরু যদি এই নীতি প্রচলন না করতেন তাহলে নতুন স্বাধীন দেশগুলোর কী হতো? আমেরিকার ডালেস সাহেব বলেছিলেন যে, নেহেরুর নীতিকে তিনি সমর্থন করেন না। কিন্তু ডালেস সাহেব কী জানতেন যে, নেহেরুর নীতি না থাকলে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশগুলোই আজ রুশ দেশ এবং কম্যুনিস্ট নীতিকে সমর্থন করতো। যাক্, এ নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। বলুন, এবার আমি আপনার কী করতে পারি?

মধ্যপ্রাচ্যের কম্যুনিজমের কিছুটা বর্ণনা দিন।

কিন্তু মিডলইস্টের কম্যুনিজম সম্বন্ধে বলার মতো এমন কিছু তো নেই, মুতরান জবাব দেন।

কী যে বলেন সৈয়দ মুতরান! প্রতিদিন সংবাদপত্রে ইরাক, দামাস্কাসের কম্যুনিস্ট পার্টির বিবরণী বেরুচ্ছে। আর আপনি বলছেন এখানে কম্যুনিজম সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই।

শুনেছি আপনাদের দেশে কম্যুনিস্টরা বেশ শক্তিশালী। আর দল গঠন করার জন্যে বেশ কষ্ট স্বীকারও করেছে কিন্তু ভারতীয় বা ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির মতো আরব কম্যুনিস্টরা শক্তিশালী হতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, কম্যুনিস্ট দলের নেতারা আপনাদের দেশের মতো সংগঠন করতে পারেনি।

করবে কী করে বলুন? সব কাজই তো করতে হয় বাগদাশকে। এক হাতে সব কাজ করছে। তার জুড়ি আর কেউ নেই।

এই যে বাগদাশের নাম করলাম, উনি হলেন কুর্দিস্থানের লোক। কুর্দিস্থানের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। ইরাকের উত্তর প্রান্তে এক পার্বত্য অঞ্চল। এখানকার লোকদের সঙ্গে ইরাক সরকারের ঝগড়া বিবাদ তো লেগেই আছে। কুর্দিস্থানের আদমী বলে বাগদাশের ভক্তবৃন্দের অভাব হয়নি কোনদিন।

বাগদাশ কম্যুনিস্ট, মধ্যপ্রাচ্যের সবাই একথা জানে। তাই দেশের সরকার বাগদাশের উপর তীক্ষ্ম নজর রাখেন। তার বয়স যখন আঠারো তখন বাগদাশ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ম নজর এড়াতে পারেননি কখনই। তাই লুকিয়ে বাগদাশ এলেন মস্কোতে।

মস্কোতে বেশ কিছুদিন কাটলো বাগদাশের। এখানে শেখবার মতো অনেক কিছু ছিলো। কিছুদিন বাদে তিনি আবার সিরিয়ায় ফিরে এলেন। তখন ধরা পড়ার আশংকা ছিলো কম। এর প্রধান কারণ ফ্রান্সে তখন 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকার গঠন হয়েছে।

দামাস্কাসে ফিরে এসে বাগদাশ কম্যুনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করে তুলবার চেস্টা করলেন। তাঁরই উৎসাহে দলের একটা নিজস্ব সংবাদপত্র প্রকাশিত হলো। এই কাগজের নামকরণ হলো 'সৌত অল সাব' [ভয়েস অব দি পিপল]। এ ছাড়া প্রকাশ্যে কম্যুনিস্ট দলের প্রতিনিধি হিসেবে বাগদাশ সর্বত্র চলাফেরা করেন। প্যারীতে মধ্যপ্রাচ্যের কম্যুনিস্ট দলের প্রতিনিধি হিসেব সভায় সমিতিতে যোগ দিতে যান। সেইখানে বড়ো বড়ো নেতাদের সঙ্গে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়।

কিন্তু বাগদাশের এই অবাধ গতিবিধি, কাজকর্ম করার স্বাধীনতা বেশী দিন বজায় রইলো না। একদিন শোনা গেলো ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছে। বাগদাশের পক্ষে একটা বিপদের লক্ষণ। কারণ পপুলার ফ্রন্ট থাকাকালীন তার গতিবিধির উপর কোন বাধা ছিলো না। এবার কিন্তু হাঙ্গামা সুরু হলো।

ইতিমধ্যে আর একটা বিপদ দেখা দিলো। ইয়োরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধের মেঘ দেখা দিয়েছে। এবার বাগদাশের সঙ্গে ফরাসী সরকার এবং সিরিয়ার সরকারের সংঘর্ষ লাগলো।

সবই ঠিক যাচ্ছিলো কিন্তু হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে, স্টালিন হিটলারের সঙ্গে মিতালি করেছেন। এই সংবাদে বাগদাশও একটু বিচলিত হলেন। কারণ ফাসিস্ত জার্মানীর সঙ্গে কম্যুনিস্ট সরকার কী করে হাত মেলাতে পারে এটা তিনি ভেবে পেলেন না। অতএব বাগদাশের দলের ভেতর ভাঙন দেখা দিলো।

সিরিয়ার সরকার কম্যুনিস্ট দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করল। কাজেই

পুলিশের নজর এড়িয়ে বাগদাশ এলেন লেবাননে। তার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরা বেরুট এলেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট কর্মী রফিক রিদা ফারজালা, হিলু, মুস্তাফা আরিস, বাগদাশের সঙ্গে ছিলেন।

দ্রুতলয়ে লড়াইর পরিবর্তন সুরু হলো। ইতিমধ্যে রুশ সরকারের সঙ্গে হিটলারের মিতালি টুটে গেছে। পশ্চিম শক্তি আবার সিরিয়ায় কায়েমী হয়ে বসেছে। তাই দলবল নিয়ে বাগদাশ দামাস্কাসে ফিরে এলেন। কিন্তু দলের সংবাদপত্র 'সৌত অল সাব' তখনও বেরুত থেকে প্রকাশিত হত।

বেরুতে কম্যুনিস্ট দলের নেতা আঁতোয়ান তাবেত ভদ্রলোক বেশ এক সমৃদ্ধশালী পরিবারের সন্তান। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, উদ্যোগী লোক—তারই প্রেরণায় 'আন্টি ফ্যাসিস্ত লীগ' গঠিত হয়েছে। আমিও সেই দলের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম এককালে।

নাখলে মুতরান একটু থামলো। গল্পের ঘোরে সময়ের দিকে আমরা নজর দিইনি। সুলতান ঘড়ির দিকে তাকাতেই ফেরাজিল বলে: সুলতান লিডো রেস্তোরাঁর কেউই ঘড়ির দিকে তাকায় না। এখানে সময়ের হিসেব রাখা হয়না। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতীয় বন্ধুকে মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে দাও। সময়ের নজির দিয়ে এখান থেকে কেউ যেন চলে যায় না।

নাখলে মুতরান একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো। বললো: হয়তো আমার দীর্ঘ কাহিনী শুনে বিক্রমাদিত্য একটু বিরক্ত বোধ করছেন। তাই আমার কাহিনী সংক্ষিপ্ত করছি।

লড়াই যখন পুরোদমে চলছে—তখন সিরিয়ায় নতুন সরকার গঠিত হলো। বাথ পার্টির নেতারা তখনও কর্মতৎপর হননি। বাগদাশ আর তার সাগরেদরা এই নির্বাচনে বেশ হৈ-হুল্লা করে যোগ দিলেন। তাদের ইলেকসনের প্রধান দাবী ছিলো সিরিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

বাগদাশ নিজের দলকে শক্তিশালী করার জন্যে বিভিন্ন আরব দেশের ভেতর দৃঢ় আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। সিরিয়ায় তখন ন্যাশনাল ব্লকের নেতা কাওতালি বাগদাশকে পূর্ণ সমর্থন করলেন।

লড়াইর প্রায় শেষভাগে রুশ সরকার নতুন সিরিয়ান গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করে নিল। এরপর বাগদাশের জনপ্রিয়তা বাড়লো।

ইতিমধ্যে একদিন রুশ এম্বাসডার গোপনে ন্যাশনাল ব্লকের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী কাওতালিকে তার গাড়ী করে সিরিয়া প্রান্ত থেকে লেবাননে নিয়ে এলেন। রুশ এম্বাসডারের এই কার্যকলাপে সবাই বিস্মিত হলেন। কারণ কাওতালিকে গ্রেপ্তার করার ফিকিরে ছিলেন সিরিয়ান সরকার। কিন্তু রুশ রাজদূতের জন্যে তাকে গ্রেপ্তার করা আর হলো না। এম্বাসডারের সাহায্য নিয়ে কাওতালি সে যাত্রায় রক্ষে পেলেন। এর পরিণামে সিরিয়ায় কম্যুনিস্টদের

প্রতিপত্তি গেলো। সমর্থন হারাবার আর একটা কারণ ছিলো—জনসাধারণ ভাবতে সুরু করলো যে মধ্যপ্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে ফরাসীদের কোন যোগাযোগ আছে।

এ সন্দেহের ভেতর কিছুটা সত্যি ছিলো। বাগদাশের ধারণা ছিলো যে, এই অঞ্চল থেকে ফরাসীরা চলে গেলে নিশ্চয় ইংরেজ আসবে। তার মতে ইংরেজের চাইতে ফরাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা অনেক শ্রেয়। এর কিছুদিন বাদে বাগদাশের আর একটা বিপদ ঘনিয়ে এলো। হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে, রুশ সরকার ইসরাইল সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে।

এই ব্যাপারে ঝক্কি সামলাতে বাগদাশের কম বেগ পেতে হয়নি। ইসরাইলের উপর আরবদের কী রাগ আপনি জানেন বিক্রমাদিত্য। হাজার-হাজার আরবদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই ইসরাইল সরকার। কিন্তু রুশ সরকার হঠাৎ ইসরাইল সরকারকে স্বীকার করে নেবার পর আরব দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কম্যুনিষ্ট দলকে আবার বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল বিভিন্ন আরব দেশে।

বাধ্য হয়ে বাগদাশকে লুকিয়ে কাজ করতে হলো। পার্টির সংবাদপত্র আবার হলো বে আইনী। সভাসমিতি প্রোসেশান নিত্যিই আয়োজন করা হয়, কিন্তু সবই বিনানুমতিতে।

মুতরান চুপ করল। এবার ফেরাজ্জিলি তার মুখ খুললো। বললো ঃ বাথপার্টির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কোন কালেই বন্ধুত্ব হয়নি বিক্রমাদিত্য, এ কথা আপনাকে আগেই বলেছি। আমি জানি সৈয়দ মুতরান আমার কথায় তীব্র প্রতিবাদ করবেন—কিন্তু কম্যুনিষ্টরা এ অঞ্চলের কারু সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারেন নি। তাই এখানে কম্যুনিষ্টরা কখনই শক্তিশালী হতে পারেনি।

মুতরান মৃদু প্রতিবাদ করলো। বললো ঃ এ হল ফেরাজ্জিলির দলের কথা আমাদের বক্তব্য নয়। কারু সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার মতো রাজনৈতিক দল এ অঞ্চলে কোথায় আছে বলুন? দল গঠন তো হালে হয়েছে। এর আগে সবাই ছিলো পৃথক রাজনৈতিক দল, সংগঠন কেউ করেনি। যাক সে কথা।

এই যে বাগদাশের কাহিনী আপনাকে বললাম এ কাহিনী বলার একান্ত প্রয়োজন ছিলো। বাগদাশ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির জনপ্রিয়তা দিন-দিন যতই বাড়তে লাগলো পশ্চিম জগতের কর্তারা ততই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাদের আশঙ্কা হলো মধ্যপ্রাচ্য অতি শিগগিরই কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে। আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডালেস চিরকালই কম্যুনিষ্টদের বিরোধী ছিলেন। তার মতবাদের বিরোধিতা যেই করতো তাকেই তিনি কম্যুনিষ্ট বলে ঠাওরাতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকার কর্তারা পৃথিবীর

চতুর্দিকে কম্যুনিজমের জুজুবুড়ি দেখতে পেলেন। তাদের ভয় হলো এই অঞ্চলে কম্যুনিজম হয়তো প্রসারিত হবে। আমেরিকার কর্তারা এবার ভাবতে লাগলেন, কী করে কম্যুনিজম এবং বাগদাশকে এই অঞ্চল থেকে হটানো যায়। অনেক আলোচনা—তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হলো যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে নিয়ে এক সামরিক চুক্তি করতে হবে। এই সামরিক চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হবে কম্যুনিজম কমুনিস্টদের হটানো। এই চুক্তির নামকরণ হলো 'বাগদাদ প্যাক্ট'। কারণ বাগদাদের প্রধানমন্ত্রী নুরী সইদ ছিলেন এই প্যাক্টের প্রধান সমর্থক।

মুতরানের কথা শেষ হবার আগেই সুলতান বলে : বাগদাদ প্যাক্টের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম মুতরান সাহেব। আপনি অনুমতি দিন, এই প্যাক্টের বিস্তৃত কাহিনী আজ আমি আপনাদের শোনাব।

সুলতান তার কাহিনী সুরু করলো। মুতরান কোন আপত্তি করলো না।

* * *

বাগদাদ প্যাক্টের পুরো কাহিনী তো আপনারা জানেন না বিক্রমাদিত্য, আমি জানি। আজ বহুদিন ধরে এই অঞ্চলের রাজনীতির সঙ্গে আমি বিশেষভাবে জড়িত আছি। কোথায় কী ঘটেছে, কেন বিপ্লব হলো আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে তার বিবরণী পড়েন কিন্তু তার পুরো ফিরিস্তি আমার নখদর্পণে। মুতরান আপনাকে বলেছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে যখন কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তার হচ্ছে ইংরেজ এবং আমেরিকার কর্তারা ভাবতে লাগলেন কী করে কম্যুনিস্টদের হটানো যায়। একবার এই অঞ্চলে রুশদেশ ঢুকলে তাদের সহজে হটান যাবে না। এখানে ইংরেজ এবং আমেরিকার বহু সম্পত্তি আর তেলের খনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। ইরাণে মোসাদেগকে নিয়ে কী তাদের কম বেগ পেতে হয়েছে! আশঙ্কার আর একটা কারণ বহুদিন ধরে এখানকার লোকদের সঙ্গে রুশদেশের লোকদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

ভাবছেন আমেরিকা ইংরেজদের মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে এতো মাথা ব্যথা কেন? কারণ আছে বিক্রমাদিত্য। যুদ্ধের শেষে আমেরিকার কর্তারা এই অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটির সন্ধানে ছিলেন। রুশ দেশ তো এখান থেকে অনেক বেশী দূরে নয়। জেট প্লেনে ঘণ্টাখানেকের পথ। এইখানে সামরিক ঘাঁটি বসাতে পারলে রুশদের যখন তখন হুমকি দেওয়া যাবে। আর শুধু তাই নয়, রুশ বিমান বাহিনীকে আটকাতে হলে এখান থেকে এই কাজটা করাই সবচাইতে সুবিধের।

তারপর তেল কোম্পানীকে রক্ষা করা এবং অন্যান্য সাহায্য করতে হলেও সামরিক ঘাঁটি থাকার প্রয়োজন আছে। আরও একটা কারণের জন্যে মধ্য-প্রাচ্যের গুরুত্ব ছিলো। এর আভাষ আগেই দিয়েছি। সে হলো মধ্যপ্রাচ্যের তেল। এখানকার বহুদেশ আছে যেখানে মাটি খুঁড়লেই আপনি তেল

পাবেন। কুয়েতের বাজারে দাঁড়িয়ে তেল কিনছেন, ঠিক আপনার পায়ের নীচে তেলের খনি আছে। এই তেল হলো য়ুরোপের জীবন। ঐ যে সম্পত্তি দেখছেন, পিকাডিলি সার্কাস, হাইড পার্ক, লিসেস্টার স্কোয়ার, দোকান পাট, ঐ সবই তৈরী হয়েছে তেলের টাকায়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল বন্ধ হলে য়ুরোপের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর ঐ যে ইয়োরোপের বড়ো বড়ো শহরে আলো জ্বলছে, কলকারখানা চলছে, সবই তো তেলের দৌলতে। আর এই তেল থেকে আমেরিকা কী কম টাকা বাগাচ্ছে! এতোগুলো টাকার মায়া কী সহজে ছাড়া যায়! কল্পনা করুন, ১৯৫৫ সালে পশ্চিম ইয়োরোপ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ৮৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন তেল কিনেছে। কিন্তু এবার হবে ৩১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এবার ভেবে দেখুন মধ্য প্রাচ্যের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

তৃতীয় কারণ, সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে ইংরেজ এবং পশ্চিম ইউরোপের আমদানী রপ্তানী চলছে। সৌদী আরবিয়া বা কুয়েতের তেলের কোম্পানীতে কোন জরুরী জিনিষপত্র পাঠাতে চান তো সুয়েজ ক্যানালের ভেতর দিয়ে পাঠাতে হবে। শুধু জিনিষ নয়, তেলের জাহাজ তো সবই ক্যানালের ভেতর দিয়ে যায়।

এবার আপনাকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রয়োজনীয়তার চার নম্বর কারণ বলবো।

ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন হবার পর আরব দেশের সঙ্গে ইসরাইলের ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। আরবদের ইসরাইল থেকে তাড়ানো হয়েছে। আমরা যতোই বলি ইসরাইল হলো আরব দেশ—আমাদের দেশ। ইংরেজ আমেরিকান কর্তারা আমাদের কথা কানে তোলেন না। এদের সাহায্য নিয়েই তো ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করা হলো। কী করে এই রাষ্ট্র গঠন হলো তার পুরো ইতিহাস আপনি জেরুজালেম শহরে গেলে শুনতে পাবেন।

এবার পুরানো কথায় ফিরে আসা যাক। ইসরাইল নিয়ে আমরা যতোই প্রতিবাদ করি, ইংরেজ আমেরিকান কর্তারা এদের টাকা পয়সা এবং হাতিয়ার দিয়ে জিইয়ে রাখেন। ভেবে দেখুন, কী ঘোরতর অন্যায়! ১৯৫০ সালে আমেরিকান সরকার ঠিক করলো যে, সমস্ত আরব দেশ এবং ইসরাইলের ভেতর সমান অংশে হাতিয়ার বিক্রী করা হবে। সমস্ত আরবদেশের তুলনায় ইসরাইল তো বিন্দু! অথচ হাতিয়ার বাঁটবার বেলায় সমান অংশ! আমেরিকান এই নীতির নাম হলো 'ট্রুমান ডকট্রিন'।

আরব দেশ চিরকালই কলোনিয়ালিজমের বিরোধিতা করেছে। আমাদের এই কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে তীব্র মতবাদ ডালেস সাহেবকে বিচলিত করেছিলো। তিনি বহুদিন থেকে ভাবছিলেন কী করে এই অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

হঠাৎ একদিন বিধাতা মৌকা দিয়ে দিলেন। ইজিপ্টের বিপ্লবের

কাহিনী আপনাকে আগেই বলা হয়েছে। বিপ্লবে জয়ী হয়ে দেশের শাসনভার কিছুদিনের জন্যে নেগুইব নিলেন। কিন্তু এই বন্দোবস্ত ছিলো সাময়িক কালের।

ইজিপ্টের বিপ্লবের প্রধান নায়ক ছিলেন গামেল আব্দেল নাসের। ক্ষমতায় আসবে নাসের এটা আমেরিকান কর্তাদের কল্পনার অতীত ছিলো। নেগুইবের উপর তারা বিশ্বাস রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন নেগুইবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা যাবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় বিপরীত। নেগুইবকে সরিয়ে নাসের এবার দেশের কর্তৃত্ব নিলেন। আমেরিকান কর্তাদের চিন্তা বাড়লো।

ডালেস এবার শঙ্কিত হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকে নিয়ে এক মিলিটারী প্যাক্ট করতে হবে। আর অবস্থার হেরফের জানবার জন্যে ডালেস তার দলবল নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সফরে বেরুলেন।

ডালেসের মত কখনও পাল্টায় না। সফর শেষে তিনি ঠিক করলেন যে, মিলিটারী প্যাক্ট নিয়ে আর গড়িমসী নয়। কাগজপত্রে এবার সই করা যাক। বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট ডালেস সাহেবের বহুদিনের স্বপ্ন! এই স্বপ্ন সার্থক না করতে পারলে তার জীবনে কখনই শান্তি আসবে না।

ডালেসের সঙ্গে নাসেরের মোলাকাৎ হলো। ডালেস সেই কম্যুনিস্ট জুজুবুড়ীর কথা বললেন, নাসের হেসে তার কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আমরা এই অঞ্চলে সুখে শান্তিতে আছি। এখানে কম্যুনিস্টদের কোন প্রভাব নেই। অনর্থক এই অঞ্চলে মিলিটারী প্যাক্ট করে কেন হাঙ্গামা বাড়াচ্ছেন!

ডালেস কিন্তু নাসেরের কথায় শান্তি পেলেন না। তার ধারণা কম্যুনিস্টরা এই অঞ্চল তাদের হাতের মুঠোয় রেখেছে। এখানকার দেশগুলোর সৈন্যবাহিনী মজবুত নয়, তাদের সাহায্য না করলে বিপদের আশংকা আছে।

দল ভারী করার জন্যে ডালেস এবার পাকিস্তানকে এই সামরিক চুক্তির ভেতর টানলেন। পাকিস্তানে আমেরিকার মস্তো বড়ো মিলিটারী ঘাঁটি। এখান থেকে প্লেন করে রুশদেশের অভ্যন্তরে হানা দেবার যথেষ্ট সুবিধে।

ইংরাজের মস্তবড়ো বন্ধু নুরী সইদ। বলতে গেলে তিনি ইংরেজের কথায় ওঠেন বসেন। এবার তাকে এই দলে টানা হলো। বহুদিন থেকে নুরী সইদ আরবদেশের নেতা হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তার স্বপ্ন পূর্ণ হবার একমাত্র পথের কাঁটা ছিলো ইজিপ্টের গামেল আব্দেল নাসের। নুরী সইদ এবার উঠে পড়ে লাগলেন নাসেরকে ধ্বংস করার জন্যে। এবং ধ্বংস করার প্রথম পরিকল্পনা হলো বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট।

* * *

জানুয়ারী মাস—১৯৫৫ সাল।

বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট নিয়ে আরব দেশে তুমুল আন্দোলন সুরু হয়েছে। ডালেস আর এন্থনি ইডেন চাইছেন আরব দেশগুলোকে নিয়ে এই প্যাক্ট সই করতে হবে। নাসের এর ঘোরতর বিরোধিতা করছেন। নুরী সইদ প্যাক্টের সমর্থন করছেন।

একদিন এই প্যাক্ট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে নাসেরের প্রতিনিধি সালা সালাম বাগদাদে এলেন। নাসের নুরী সইদকে বোঝাতে চাইছেন যে, এই প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হলে মধ্যপ্রাচ্যের অপকার হবে। নুরী সইদ নাছোড়বান্দা। তার এক গোঁ, কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এই প্যাক্টের আবশ্যকতা আছে।

নুরী সইদ বললেন যে, ইংরাজ তার অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি আমেরিকা এবং ইংরেজের সাহায্য নিয়ে ইরাকের সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলবেন।

সালা সালাম যতোই প্যাক্টের অপকারিতা বোঝাতে চেষ্টা করেন, নুরী সইদ হাসেন। তিনি সালা সালামকে বললেন: প্যালেষ্টাইনের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। মরবার আগে এর একটা বিহিত করে যাবো।

এবার সালা সালামের বলবার পালা। তিনি বললেন: বহুদিন তো আমরা পরাধীন ছিলাম। সবেমাত্র স্বাধীনতা পেয়েছি। আজ আর এই স্বাধীনতা হারাতে চাইনে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ইংরেজ আমাদের দেশের মাটি আঁকড়ে ধরেছিলো। আমাদের দেশকে শোষণ করেছে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে গোলযোগের সৃষ্টি করেছে। বলতে গেলে এককালে দেশের রাজা ছিলো বিটিশ এম্বাসডার। তার আদেশানুযায়ী আমাদের দেশের কাজকর্ম করতে হতো।

দীর্ঘ একটানা বক্তৃতা দিয়ে সালা সালাম একটু দম নিয়ে নেন। তারপর আবার বলেন: আজকালকার যুগে আমরা পরের নির্দেশে আর চলতে চাইনে। আমরা স্বাধীন নীতি অবলম্বন করতে চাই।

আর একটা কথা শুনুন। এই যে আমরা মিলিটারী প্যাক্ট করছি এব পরিণাম কী হবে জানেন? যার জন্যে এতো পাঁয়তারা করছি, যে মিলিটারী প্যাক্টের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা তাকেই শক্তিশালী করে তুলবো। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমরা চক্রান্ত করছি কিন্তু আপনি জানবেন যে, এবার রাশিয়া এই অঞ্চলে এসে আস্তানা গাড়বে। কারণ যেখানে আমেরিকা সেখানেই রাশিয়া। ইংরেজ এবং আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন হয়েছে। আরব দেশের সবচাইতে বড়ো দুশমন হল ইসরাইল। যারা আমাদের দুশমনকে গড়ে তুলেছে তাদের সঙ্গে হাত মেলানো অসম্ভব। শুধুমাত্র আরব দেশগুলোকে নিয়ে যদি কোন চুক্তি করা হয় তবে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমেরিকা ইংরেজকে এর ভেতর টানলে আমাদের ঘোরতর আপত্তি।

সালা সালামের কথা চুপ করে শোনেন নূরী সইদ। আলোচনা অন্তে আশ্বাস দেন যে, বাগদাদ চুক্তির ব্যাপার নিয়ে তিনি আরো চিন্তা করে দেখবেন। প্রয়োজন হলে নাসেরের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে তার আপত্তি নেই।

নূরী সইদের আশ্বাস পেয়ে সালা সালাম খুশী। তিনি ভাবলেন যে, নূরী সইদকে হাত করেছেন। এই বিস্তৃত আলোচনার পর ইরাক নিশ্চয় মিলিটারী প্যাক্টে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করবে।

কিন্তু এখানে সালা সালাম দাবার চালে একটু ভুল করে বসলেন। একদিন সাংবাদিকদের বললেন: শুধুমাত্র আরব দেশগুলোকে নিয়ে মিলিটারী চুক্তি হলে ইজিপ্টের আপত্তি নেই।

বেশ ফলাও করে মধ্যপ্রাচ্যের কাগজগুলোতে এই সংবাদ প্রকাশিত হলো। সবাই ভাবলে নাসের নূরী সইদের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন। নূরী সইদও চুপ করে বসে রইলেন না। তিনি এবার বাগদাদ চুক্তিকে শক্তিশালী করে তুলবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। সালা সালামের মন্তব্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন আরবদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সিরিয়া এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানালো। সৌদী আরবিয়া বেজায় খুশী। বাধ্য হয়ে কায়রো একদিন সালা সালামের প্রেস ইন্টারভিউর প্রতিবাদ করলো। বলা হলো, সালা সালামের মন্তব্য ইজিপ্টের সরকারী মনোভাব নয়।

আরব রাজনীতির বাজার গুজবের বাজার। এই বাজারে একদিন বলাবলি সুরু হলো যে, সালা সালাম কায়রোতে ফিরে যাবার আগে বাগদাদ চুক্তি নিয়ে ইংরেজ এবং আমেরিকান রাজদূতের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কায়রোতে নাসের সালা সালামকে ডেকে পাঠালেন। সালা সালাম যে ইংরেজ এবং আমেরিকান রাজদূতের সঙ্গে বাগদাদ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন এটা কিন্তু নাসেরের ভালো লাগেনি। বাধ্য হয়ে নাসের সালা সালামকে এবার তার মনের কথা খুলে বললেন। নাসেরের বক্তব্য যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইজিপ্টের নীতি নিয়ে ইংরেজের অনর্থক মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

কায়রোতে তখন ইরাকের এম্বাসাডার নাগিব আল রাই। একদিন তিনি নাসেরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি নাসেরকে জানালেন যে, নূরী সইদ কায়রোতে আসবেন না; কারণ এখানে আসার কোন সার্থকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। নূরী সইদ তার মত পাল্টেছেন। এর জবাবে নাসের তার মনের কথা খুলে বললেন, বাগদাদ চুক্তি নিয়ে তিনি ইংরেজ এবং আমেরিকার সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে চান না। আরবদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে তার আপত্তি নেই।

নাগিব আল রাই ধুরন্ধর, ধূর্ত ডিপ্লোমাট, তিনি নাসেরের কথা শুনে হাসেন। তার ধারণা আরব রাজনীতিতে নাসের এখনও নাবালক। নীতির ভালোমন্দ

বিচার করার ক্ষমতা তার এখনও হয়নি। তাই তিনিও স্পষ্ট জবাব দেন : এ নিয়ে আপনার সংগে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। কারণ নুরী সইদ আপনার সংগে বাগদাদ প্যাক্ট নিয়ে কথা বলার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে করেন না। বরং ইংরেজ এবং আমেরিকার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখেন।

এই জবাবে নাসের একটু গম্ভীর হয়ে পড়েন। তিনি বলেন : এ আপনাদের ইচ্ছে। আপনারা কী করবেন, না করবেন এটা বিচার করবেন নুরী সইদ। কিন্তু আপনাদের জন্যে আমি আরব স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট চালু হলে আরবদের ক্ষতি হবে। তাই আমি আরব নেতাদের নিয়ে মিটিং করার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি।

নাগিব আল রাই এই আলোচনার সারাংশ নুরী সইদকে জানালেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর নুরী সইদ কায়রোতে আসতে রাজী হলেন। আসার আর একটা কারণ ছিলো। আরব নেতারা সবাই কায়রোতে আসবেন। নুরী সইদ না এলে ক্ষতি হবে ইরাকের।

*　　　*　　　*

সেপ্টেম্বর মাস ১৯৫৫ সাল।

কায়রোর বিমান বন্দর। ইজিপ্ট এবং ইরাকের জাতীয় পতাকা উড়ছে। নুরী সইদ বাগদাদ থেকে প্লেনে কায়রোতে আসছেন। বিমান বন্দরে তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন স্বয়ং নাসের এবং সালা সালাম।

নুরী সইদ এলেন। নাসেরের সংগে কয়েকটা কথা বলার পর সালা সালামকে বিমান বন্দরের একপ্রান্তে ডেকে নিয়ে বললেন : কী ব্যাপার ? শুনছি তোমার সংগে নাসেরের বনিবনা হচ্ছে না, গুজবটা সত্যি ?

নুরী সইদের কথা শুনে সালা সালাম বিস্মিত, হতবাক। তিনি বেশ একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন : এ সব কী বলছেন আপনি ? নাসেরের সংগে আমার ঝগড়া ! আপনি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছেন। তার সংগে মতবিরোধ হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়না।

সালা সালামের জবাব কিন্তু নুরী সইদের কানে যায় না। তিনি সালা সালামকে আশ্বাস দিয়ে বলেন : ভয় পাবার কারণ নেই। নাসেরের সংগে তোমার যদি কোন মতবিরোধ হয় তবে আমি তোমায় সাহায্য করবো।

সালা সালাম এবার স্পষ্ট বুঝতে পারেন নুরী সইদ কী বলতে চাইছেন। তিনি যতোই নুরী সইদকে বলেন তার সংগে নাসেরের ঝগড়া হয়নি, ততোই নুরী সইদ তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

সেদিন বিকেল বেলা। কায়রোর সামরামি হোটেলে দুই নেতার বৈঠক বসলো। আলোচনা সুরু করলেন নুরী সইদ। তিনি কথা বলতে ভালোবাসেন। প্রায় একটানা দুঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন নুরী সইদ। কিন্তু তিনি যে কী বলতে চাইছেন একথা কেউ বুঝতে পারলো না। বিস্মিত হয়ে নাসের এবার

সোজাসুজি প্রশ্ন করেন। আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। সংক্ষেপে আপনার কথা গুছিয়ে বলুন।

নুরী সইদ একথা শুনে একটু গম্ভীর হলেন। এ ধরনের প্রশ্ন নাসের তাকে করবেন এ কিন্তু তিনি কখনও আশা করেননি। এবার একটু মৃদুকণ্ঠে বলেন, নাসের, আমি চাই ইরাককে সমৃদ্ধশালী, শক্তিশালী দেশ করতে। বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে আমি ইরাককে রক্ষা করতে চাই। কিন্তু দেশকে নতুন করে গড়ে তোলা তো সহজ কথা নয়। আর এই কাজ শুধু আরবদের সাহায্য নিয়ে করা কখনই সম্ভব নয়। দেশ রক্ষার জন্যে আমাকে যদি সৌদী আরবিয়া বা লেবানীজ সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। ইরাক এবং আরব দেশগুলোকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো ইংরেজের সঙ্গে মিতালী করা। তাই আমি বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের পক্ষপাতী। ইংরেজ এবং আমেরিকার সাহায্য পেলে আমাদের এই অঞ্চলে আর কোন চিন্তা ভাবনা থাকবে না।

নাসের নুরী সইদের জবাব শুনে একটু বিস্মিত হলেন। একটু অবাক হয়েই জবাব দিলেন : আপনি ইংরেজ এবং আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান এতে আমার কিছু বলবার নেই। একাজ ভালো কী মন্দ ভবিষ্যৎ এর বিচার করবে। কিন্তু অনর্থক অন্য আরব দেশগুলোকে এর ভেতর টানবেন না।

নুরী সইদ জিজ্ঞেস করেন : কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করলে আমরা হাতিয়ার পাবো কোথায় ?

: আপনি যদি শুধু হাতিয়ারের জন্যে এই মিলিটারী প্যাক্ট করতে চান তবে ভুল করছেন। বাইরের শত্রুই একমাত্র আমাদের দুশমন নয়। আমাদের দেশের বুকেই শত্রু কায়েমী হয়ে বসে আছে। তাদের তাড়াবার একান্ত প্রয়োজন। এ হলো সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে নাসের জানালেন যে, সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল থেকে শিগগিরিই ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে সরানো হবে। এখানে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর আর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু ইংরেজকে এই অঞ্চল থেকে তাড়াতে আরো বেশ কিছুদিন সময় নেবে। অবশ্য ইংরেজ চলে যাবার জন্যে ইজিপ্ট কী নীতি অবলম্বন করবে বলা সহজ নয়। নাসের স্পষ্টই বলেন : আমরা স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীন দেশের মতো চলাফেরা করতে চাই—স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই।

বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট নিয়ে দুই নেতার ভেতর কোন মীমাংসা হতে পারে না। এ বুঝতে কারু অসুবিধা হলো না। কারণ দুজনার নীতি ঠিক উল্টো। নুরী সইদ ইংরেজের বন্ধু। ইংরেজকে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে তিনি শক্ত করতে চান। বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট এ অঞ্চলের জন্যে আশু প্রয়োজন

এই তার ধারণা। নাসের এই মতের বিরোধী। কিন্তু নুরী সইদ বাগদাদ প্যাক্টকে কার্যকরী করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল চরকি বাজীর মতো ঘুরতে লাগলেন। লন্ডনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইডেনের সঙ্গে বাগদাদ প্যাক্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করলেন। সেখান থেকে গেলেন ইস্তানবুলে। কারণ তুর্কীও বাগদাদ প্যাক্টের সমর্থক। বাগদাদ প্যাক্ট চালু করার আগে ঐ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। কিন্তু মুস্কিল হলো তুর্কী আরবদেশের হিস্যা নয়। তুর্কীকে আরবদেশের চুক্তির ভেতর টানতে গেলে বহু ঝামেলা আছে।

বাগদাদ প্যাক্টের ব্যাপারে তুর্কীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। বহুদিন থেকে তুর্কীর কর্তারা এক মুসলমান সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তুর্কীর ধারণা যে, আরবদের সাহায্য পেলে তাদের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। হয়তো মুসলমান সাম্রাজ্য গঠিত হলে এই নতুন প্রাচ্যের কর্তা হবেন তুর্কী। তুর্কীর সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তি আছে।

নাসের ইরাক-তুর্কীর আলোচনার পুরো খবর জানতেন না। তিনিও তুর্কীকে তার দলের ভেতর টানতে চেষ্টা করলেন। তুর্কীর কর্তাদের বললেন, ইজিপ্ট তুর্কীর ভেতর বন্ধুত্বের চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

কিন্তু ইজিপ্ট তুর্কীর ভেতর ঝগড়া শুরু হলো এবং শোনা গেলো যে, কায়রো থেকে তুর্কীর রাজদূতকে চলে যেতে বলা হয়েছে।

বাগদাদ প্যাক্টকে বানচাল করা একান্ত প্রয়োজন। নাসের ভাবতে সুরু করেন এবার কী করা যায়। হঠাৎ তার মনে পড়লো, হয়তো সিরিয়াকে দলে টানলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

* * *

সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছিল। প্রতিদিনই নতুন সরকার গঠন হয়—ভাঙ্গে। কোনো প্রধানমন্ত্রীরই মেয়াদ বেশীদিনের জন্যে নয়। অনেক হাঙ্গামার পর একদিন সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন ফারীস খুরী। তিনি প্রবীণ, বিচক্ষণ ব্যক্তি। হুজুগে পড়ে মোটেই কাজ করেন না।

নাসের তাকে কায়রোতে আমন্ত্রণ করলেন। বাগদাদ প্যাক্ট নিয়ে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন। এই বৈঠকে অন্যান্য আরবদেশের প্রতিনিধিরাও এলো। ফারীস খুরী জানালেন যে, সিরিয়া বাগদাদ প্যাক্টের বিরোধী। লেবাননের প্রতিনিধি খোলাখুলিভাবে কিছু বললেন না। জর্ডনের প্রতিনিধি অবশ্য ইরাকের বিরুদ্ধে গালমন্দ করলেন। এই গালিগালাজের একটা নেপথ্য কারণ ছিলো। কিছুদিন হলো জর্ডন আর ইরাকের ভেতর মন কষাকষি চলছিলো। বৈঠকে অবশ্য উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না। শেষ অবধি ঠিক হলো যে, এই মিটিং-এর চারজন প্রতিনিধি বাগদাদ প্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করতে

নূরী সইদের কাছে যাবেন।

নূরী সইদ তখন বাগদাদে। অসুখের অজুহাত দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। আসল কথা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাগদাদ প্যাক্ট নিয়ে কোন আলাপ-আলোচনা করতে চান না। কারণ নূরী সইদের এক গোঁ : এই এলাকা রক্ষার জন্যে মিলিটারী প্যাক্ট চাই এবং সেই মিলিটারী প্যাক্টের প্রধান নেতা হবে ইংরেজ। এই কথা খোলাখুলি ভাবে বলতে নূরী সইদের একটুও দ্বিধা বা সংকোচ ছিলো না।

ব্যর্থ হয়ে প্রতিনিধিরা আবার কায়রোতে ফিরে এলেন। কায়রোতে ফেরবার আগে সালা সালামকে নূরী সইদ ডেকে পাঠালেন। বললেন : তোমাকে একটা কথা বলবো ভেবেছি।

: বলুন ? সালা সালাম নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেন।

: নাসেরকে বলো যে, আমি তার সৈন্যবাহিনীর সৈন্য নই। অতএব তার নির্দেশ শুনে আমি চলতে চাইনে। আমার নীতি আমি নিজেই ঠিক করবো। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তার বিচার করবো আমি।

সালা সালাম কায়রোতে ফিরে এলেন। কায়রোর বৈঠক ব্যর্থ হলো। প্রতিনিধিরা তাদের দেশে ফিরে গেলেন। কয়েকদিন বাদে সিরিয়ায় আবার গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হলো।

* * *

সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফারীস খুরীর চাকুরী যাবার প্রধান কারণ তিনি বাগদাদ প্যাক্টের বিরোধী ছিলেন বটে তবু ইরাকের নীতির বিরোধিতা করতে সংকোচ বোধ করছিলেন। মিলিটারী প্যাক্ট নিয়ে সিরিয়ার পার্লামেন্টে তুমুল হৈ-চৈ হলো।

তারপর আবার সিরিয়ার সরকারের অদলবদল হলো। কিছুদিন বাদে প্রধানমন্ত্রী হলেন সাবরি আল আসলি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন খালেদ আল আজম। কিন্তু তাদের এই মন্ত্রীত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

খালেদ আজম পররাষ্ট্র মন্ত্রী হবার পর সিরিয়ার সঙ্গে মস্কোর বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হলো। কারণ আজম মস্কোর নীতির পক্ষপাতী ছিলেন।

কায়রোও সিরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সিরিয়াকে একান্ত প্রয়োজন।

নূরী সইদও ইতিমধ্যে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছেন। একদিন তুর্কীর প্রধানমন্ত্রী মান্দারাস এলেন বাগদাদে। নূরী সইদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। এবং আলোচনা শেষে দুই নেতা বাগদাদ প্যাক্টে সই করলেন। কায়রো এবং দামাস্কাস এই প্যাক্টের তীব্র প্রতিবাদ করলো। কায়রো আরব ফেডারেল ইউনিয়নের প্রস্তাব করলো। ঠিক হলো এই ইউনিয়নে বাগদাদকে বাদ দিয়ে আর

সবাইকে গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু সমস্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। কারণ হঠাৎ একদিন ইসরাইল গাজা প্রান্ত আক্রমণ করলো।

এই আক্রমণ আরব দেশগুলোর ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সিরিয়ার সঙ্গে ইজিপ্টের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ঠিক হলো বাগদাদ চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে!

কিন্তু অন্যান্য আরবদেশ লেবানন-জর্ডন এই প্যাক্টে যোগ দিতে অস্বীকার করলো।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বাগদাদ প্যাক্টে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু তবু নুরী যা চেয়েছিলেন তা পেলেন না।

আরব রাজনীতির ঘাঁটি হলো কায়রো, বাগদাদ নয়। নুরী আরবদের একচ্ছত্র নেতা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরবদেশের সমস্ত সম্মান খ্যাতি পেলেন গামাল আব্দুল নাসের।

* * *

ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইডেন যাচ্ছিলেন ব্যাংককে সিআটোর বৈঠকে যোগ দিতে। পথে দুদিনের জন্যে কায়রোতে থামলেন। নাসেরের সঙ্গে বাগদাদ চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলো। নাসের ইংরেজ ও আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব চান—কিন্তু বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টে সই করতে তার ঘোরতর আপত্তি। তিনি বলেন, মধ্য প্রাচ্যে কোন মিলিটারী প্যাক্ট চালু করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

এরই কিছুদিন বাদে ইডেন সাহেব গেলেন বাগদাদে। সেইখানে সম্রাটের এক ডিনার পার্টিতে বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট নিয়ে কথাবার্তা হলো। নুরী চাইলেন এই প্যাক্ট অতি শিগ্‌গিরই বাজারে চালু করা হোক। ইংরেজ এবং নুরী সইদ ঠিক করলেন যে, বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্ট নিয়ে আর গড়িমসী করা চলবে না। প্যাক্ট কার্যকরী করা হোক।

* * *

বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের হৈ-হল্লার কথা রুশ দেশের কানেও এসেছিলো। রুশদেশের কর্তারা এই আলাপ আলোচনায় বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। এই মিলিটারী প্যাক্টের মানে আর কিছু নয়। রুশ দেশের চারদিকে জাল ফেলা। এই প্যাক্ট চালু হলে আমেরিকা-ইংরেজের মিলিটারী ঘাঁটি আরো পাকা-পোক্ত হবে। ক্রুশ্চেভ ভাবতে লাগলেন কী করে ইংরেজ আমেরিকানদের পরিকল্পনা বানচাল করা যায়। কিন্তু আরবদের সাহায্য বিনা একাজ করা কখনই সম্ভব নয়।

কিছুদিন আগে ক্রুশ্চেভ তার দাবার চালে একটু ভুল করেছিলেন। তিনি ইসরাইল সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এতে আরবরা বেশ রেগে

ছিলো। তাই আরবদের সঙ্গে মিতালী করতে হলে তাঁর নীতি পাল্টানোর প্রয়োজন হল। তাই নীতি পরিবর্তন করতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন নি। তিনি বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের বিরোধিতা করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী তখন খালেদ আজম। তার রুশ দেশের সঙ্গে ভারী বন্ধুত্ব। তিনি ক্রুশ্চেভকে সমর্থন করলেন। রুশ কর্তারা এবার ইরাক ও তুর্কীকে সতর্ক করে দিলেন। বললেন, বাগদাদ প্যাক্টের পরিণাম ভালো হবে না।

ইতিমধ্যে সিরিয়ায় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। সিরিয়ার সহকারী সেনাপতি আদনান মালকী বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। সবাই তাকে ভালবাসতো। একদিন ফুটবল খেলার মাঠে মালকীকে হত্যা করা হলো। বাস্, এই নিয়ে সমস্ত সিরিয়ায় তুমুল হৈ-হল্লা সুরু হয়ে গেলো। সবাই সন্দেহ করলো যে, এই হত্যার ব্যাপারে নুরী সইদের নিশ্চয় কোন হাত আছে। এই সন্দেহের কারণও ছিলো। মালকী ছিলেন বাগদাদ প্যাক্টের ঘোরতর বিরোধী।

এই হাঙ্গামার পর সিরিয়া এবং ইরাকের ভেতর ঝগড়া আরো বাড়লো।

নুরী সইদ বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টে সই করলেন বটে কিন্তু এই চুক্তি বাজারে কার্যকরী হলোনা।

*   *   *

বাগদাদ প্যাক্টের পর এই অঞ্চলের অশান্তি বাড়লো। কিছুদিনের মধ্যে নাসের ইংরেজ সৈনাদের সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল থেকে হটালেন। আতঙ্কিত হলেন ইংরেজ, ডালেস ভয় পেলেন।

নাসের তখন ইজিপ্টের গদীতে কায়েমী হয়ে বসেছেন। ইংরেজ বুঝে নিয়েছে যে, এবার এই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রতিপত্তির ভাঁটা পড়বে।

ইংরেজের কাছে এই অঞ্চলের যথেষ্ট গুরুত্ব। কারণ এখান থেকে বিলেতে তেল যায়। আর এই তেল কোম্পানীর মালিক হলো ইংরেজ। এদের দেখা-শোনার জন্যে ইংরেজ সৈন্য সুয়েজ বন্দরে মোতায়েন করা হয়েছিলো। এছাড়া ক্যানাল দিয়েইংরেজ এবং ফরাসিদের জাহাজ চলা চাই। দূর প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে বৃটিশ-ফরাসি জাহাজ চলাচল একান্ত আবশ্যক। ক্যানেলের মালিক ইংরেজ এবং ফরাসী। কিন্তু নাসের ক্ষমতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে, ক্যানেলের এলাকা থেকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী চলে যেতে হবে। অনেক আলোচনার পর ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ক্যানেলের অঞ্চল থেকে সরানো হলো।

কিন্তু গোল বাধলো ক্যানেলের লাভের অংশ নিয়ে। ইজিপ্টের বুক দিয়ে ক্যানাল বয়ে যায় তবু এই ক্যানেলের মালিক ইংরেজ-ফরাসী। বহু বৈঠক আলোচনার পর ইজিপ্ট সরকার এই লাভের একটা অংশ পেলেন কিন্তু ইজিপ্ট সরকারের আরো টাকার প্রয়োজন। কারণ আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে অর্থ চাই।

আসোয়ান বাঁধের নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। আপনি জানেন প্রতি বছর নীল নদীতে বন্যা আসে। দু-কূল ছাপিয়ে জল বয়ে যায়, গ্রাম ভেসে যায়, মানুষ মরে। এই নদীর প্লাবনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বহুদিন থেকে একটা বাঁধ বানাবার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু বাঁধ বানাতে হলে টাকা চাই। কে দেবে টাকা? নাসের ইংরেজ আমেরিকা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাতলেন।

এই ঘটনার ফিরিস্তি দেবার আগে আপনাদের একটু গৌরচন্দ্রিকা দিই।

চলুন আমার সঙ্গে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে। আজ যার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো তার নাম জন ফস্টার ডালেস।

এর নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। আপনার স্মৃতিশক্তি প্রখর, আপনি ডালেসের নাম ভুলে যাননি। ওয়াশিংটন থেকে আমরা লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রীটে যাবো। দুই রাজধানীর কর্তারা তখন মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যে গবেষণা করছিলেন সেই গবেষণার কিছুটা আভাষ আপনাদের দেব।

*   *   *

আমেরিকার পররাষ্ট্র—যার নাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

ডালেস সাহেব খুব ভোর বেলায় উঠে তার কাজকর্ম সুরু করতেন। প্রথমেই ওয়াশিংটনের সংবাদপত্র এবং নিউইয়র্কের দুখানা কাগজ পড়ে বিশ্ব-জগতের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হতেন। তারপর সি আই-র বিবরণী, উল্লেখযোগ্য টেলিগ্রাম পড়তেন। এরপর তার ঘরে পররাষ্ট্র দপ্তর এবং ইনটেলিজেন্সের কর্তাদের বৈঠক বসতো। এই বৈঠকে বিশ্বজগত নিয়ে আলোচনা হতো।

ডালেস বেশ কিছুদিন হলো মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা নিয়ে তার পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। নাসের সোভিয়েট সরকারের কাছ থেকে হাতিয়ার কিনছে এ খবরে তিনি বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি তার অন্যতম পরামর্শদাতা জর্জ এলেনকে কায়রোতে পাঠালেন। এলেন কায়রোতে এলেন নাসেরের কাছে অস্ত্র কেনার প্রতিবাদ করতে।

এলেন যে প্রতিবাদ করতে আসছেন এ খবর নাসের আগেই পেয়েছিলেন। তাই এলেন যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলো তিনি এই প্রতিবাদ পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

এলেন-নাসের আলোচনা শুরু হলো। এলেন জানালেন যে, ইসরাইল কিছুদিন আগে আমেরিকার কাছে হাতিয়ার চেয়েছে। কিন্তু এই হাতিয়ার দেয়া হয়নি। নাসের যদি রুশ দেশ থেকে হাতিয়ার কেনেন তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে গোলমাল বাড়বে কমবে না।

ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে ডালেস এবং এন্থনি ইডেনের ভেতর মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে। ইডেন জানালেন যে, ইসরাইল ফাইটার প্লেন কেনার প্রস্তাব করেছে। এই প্লেন বিক্রী করবে ফ্রান্স এবং কানাডা। এই বেচাকেনার

প্রস্তাবে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রীর পুরো সমর্থন আছে। তাই ডালেস এই নিয়ে আর বেশী আপত্তি করলেন না।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ইডেনের গভীর চিন্তা। তার ভয়ের প্রধান কারণ গামাল আবদুল নাসের। ইডেন তার দুশ্চিন্তার কথা ডালেস এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে জানালেন। এ ছাড়া ইডেন জানতে পেয়েছেন যে, সৌদী আরবিয়ার সম্রাট ইবন সৌদ বাগদাদ প্যাক্টকে বানচাল করার জন্যে বিস্তর টাকা ঢালছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইডেন সৌদী আরবিয়ার সম্রাটের কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। কারণ সৌদী আরবিয়ার টাকা তো আমেরিকার তেল কোম্পানী আরামকোরই টাকা

কয়েকদিন বাদে লন্ডনে রুশ কর্তারা এলেন। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ। ইডেন মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তাদের কাছে আশংকা প্রকাশ করলেন। ইংরেজের জাতীয় জীবনের পক্ষে তেল একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নাসের যদি এই তেল নিয়ে হাঙ্গামা শুরু করে তবে ইংরেজকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। ইডেন স্পষ্টই জানালেন, যদি নাসের তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তবে ভালো—নইলে এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্যে ইংরেজকে অন্য পথ দেখতে হবে। সেই পথটা যে কী, এটা কিন্তু ইডেন রুশ কর্তাদের খুলে বললেন না।

আলাপ-আলোচনার কয়েকদিন বাদে একদিন নাসের আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে আমেরিকা এবং ইংরেজের কাছে হাত পাতলেন।

এই বাঁধ বানাবার জন্যে বিস্তর টাকার প্রয়োজন ছিল। হিসেব করে দেখা গেলো প্রায় ১·৩ বিলিয়ন ডলার দরকার হবে। ইজিপ্ট প্রথম কিস্তিতে ৭০ মিলিয়ন ডলার ধার চাইলো। ৬৬ মিলিয়ন ডলার আমেরিকা দেবে—বাকীটা ইংরেজ। দ্বিতীয় কিস্তিতে ২০০ মিলিয়ন ডলার দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক, ১৩০ মিলিয়ন আমেরিকা, ৮০ মিলিয়ন ডলার ইংরেজ। অবশ্য বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা শোধ দেওয়া হবে। ইংরেজ এবং আমেরিকার টাকাও ফেরৎ দেওয়া হবে।

বাঁধের টাকা নিয়ে আমেরিকা ইংল্যান্ডের ভেতর প্রায়ই বৈঠক বসে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্তারাও দু-তিনবার কায়রোতে এলেন। তারপর একদিন ইংরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েড এলেন কায়রোতে। বাগদাদ প্যাক্ট নিয়ে আলোচনা হলো। সেইখানে লয়েড সাহেব শুনতে পেলেন যে, জর্ডন থেকে ইংরেজ সেনাপতি গ্লাব পাশাকে সরানো হয়েছে। লয়েড সাহেব একটু চিন্তিত হলেন। তার সন্দেহ যে, এই সরানোর ব্যাপারে নিশ্চয় নাসেরের হাত আছে।

লয়েডের পর কায়রোতে এলেন ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিনো। তিনি নাসেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ফ্রান্স বাগদাদ প্যাক্টে যোগ দেবে না। এর কয়েকদিন বাদে কায়রোতে সম্রাট ইবন সৌদ, নাসের এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রপতির কোয়াতলির মধ্যে এক বৈঠক হলো। সেই বৈঠকে ঠিক হলো যে, ইজিপ্ট

সিরিয়া এবং সৌদি আরবিয়া বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের বিরোধিতা করবে।

হঠাৎ একদিন বাজারে গুজব রটলো যে, সোভিয়েত সরকার আসোয়ান বাঁধ বানাবার জন্যে নাসেরকে টাকা ধার দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু নাসের আমেরিকা-ইংরেজের কাছেই হাত পাতলেন।

এবার ডালেস ভাবনায় পড়লেন, কী করা যায়। আসোয়ান বাঁধের জন্যে টাকা নেয়া উচিত কিনা। রুশদেশ টাকা দিচ্ছেন শুনে তার চিন্তা বেড়েছে।

ব্রিটিশ রাজদূত স্যার রজার মেকিন্ এলেন ডালেসের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে। ডালেস টাকা ধার দিতে ইতস্ততঃ করলেন। ফরাসী রাজদূত কুভ দ্য মুরভিলও ডালেসকে সতর্ক করলেন। বললেন যে, আসোয়ান বাঁধের জন্যে টাকা না দিলে মধ্যপ্রাচ্যে হাঙ্গামা শুরু হতে পারে।

কিন্তু ডালেস নাছোড়বান্দা। যেদিন থেকে শুনছেন যে সোভিয়েত সরকার নাসেরকে টাকা ধার দেবার পরিকল্পনা করেছেন সেদিন থেকে তার মেজাজটা বিগড়ে গেছে।

* * *

ওয়াশিংটন—জুন মাসের উনিশ তারিখ, ১৯৫৬ সাল।

ভোর আটটার সময় উঠে ডালেস প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন।

এগারটার সময় ইজিপ্টের রাজদূত হুসেন এলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমেরিকার সঙ্গে টাকা ধারের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন।

হুসেন জানালেন যে, নাসের এই বাঁধ বানাবার জন্যে আমেরিকার টাকা চাইছেন। অন্য কারু কাছ থেকে আমাদের টাকা নেবার কোন সংকল্প নেই।

ডালেস সাহেব গড়িমসী সুরু করলেন। তিনি হুসেনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আমেরিকার বাজারে টাকা যোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমেরিকার সরকারের বড়ো-বড়ো কর্তাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু কেউ টাকা ধার দিতে উৎসাহী নন।

ডালেসের কথায় হুসেন ভুলবার পাত্র নন। তিনি এবার নিরুপায় হয়ে বললেন: শুনুন ডালেস সাহেব, আমাদের টাকার প্রয়োজন। আমেরিকা যদি আমাদের টাকা দেয় ভালো—নইলে আমাদের অন্যের কাছে হাত পাততে হবে। রাশিয়াতো টাকা ধার দেবার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছে।

ব্যস, আর কথা নেই। রুশ দেশের নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ডালেস তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তার মুখোস খুলে গেলো। এতোক্ষণ হুসেনের সঙ্গে ভদ্রতা করে কথা বলছিলেন কিন্তু এর পর ভদ্রতার আভাষ রইলো না। তিনি

বেশ একটু কর্কশ কণ্ঠেই জবাব দেন : রুশ দেশ টাকা দিতে চাইছে, বেশতো টাকা তাদের কাছ থেকেই নিন। আমরা টাকা দেবো না।

এরপর আলোচনার আর কোন সার্থকতা নেই। হুসেন নিরাশ হয়ে তার এম্বাসীতে ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে সমস্ত আলোচনার সারাংশ নাসেরকে টেলিগ্রাম করে জানালেন।

সেদিন দুপুরে ডালেসের এক লাঞ্চ ছিলো। আজকে লাঞ্চের অতিথি হেনরী লুস এবং আমেরিকার ফরচুন কাগজের সম্পাদক জ্যাকসন। এদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। টাইম-লাইফ-ম্যাগাজিনের কর্তা লুস। আমেরিকায় তাদের যথেষ্ঠ নাম। খেতে-খেতে ডালেস তাদের হুসেনের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিলো তার একটা ফিরিস্তি দিলেন! লুস এবং জ্যাকসন কিন্তু ডালেসের কথা শুনে যথেষ্ট বিস্মিত হলেন। এই ঋণ না দেবার পরিণাম কী তাদের অজানা নেই। জ্যাকসনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ডালেস নাসেরের সঙ্গে ঝগড়াটা আরো একটু পাকাপোক্ত করতে চাইছেন।

ডালেস-হুসেনের আলোচনা কিন্তু বিদ্যুগতিতে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ডালেসকে গালমন্দ দিলো। কারণ ঋণ না দেবার ফলাফল অজানা নেই।

এই ঘটনার দু-একদিন বাদে ইংরাজ সরকারও নাসেরকে টাকা দিতে অস্বীকার করলো।

নাসের তখন যুগোশ্লোভিয়ায়। নেহেরু-টিটোর সঙ্গে আলোচনা করছেন। ২০শে জুলাই বিকেলে তিনি কায়রোতে ফিরে এলেন। সেইখানে এসে হুসেনের টেলিগ্রামে জানতে পারলেন যে, আসোয়ান বাঁধ বাঁধবার জন্যে আমেরিকা কোন টাকা দিতে প্রস্তুত নয়। ক্যাবিনেটের বৈঠক সুরু হলো। আলোচনা সুরু হলো, এর পরে কী কর্তব্য। ডালেস যে এমনি রূঢ় জবাব দেবেন এটা ছিলো তার কল্পনার বাইরে।

কায়রোতে ঋণ দেবার ব্যাপার নিয়ে তুমুল সোরগোল শুরু হয়ে গেছে। সবাই বলাবলি করছে এরপর নাসের কী করবেন।

পরের দিন ২৫শে জুলাই। নাসের এক ময়দান মিটিং ডাকলেন। সেই মিটিং-এ তিনি শ্রোতাদের জানালেন যে, দুই একদিনের ভিতর ইজিপ্টের নীতিকে ব্যাখ্যা করবেন।

ডালেসের সিদ্ধান্তে নাসের অপমান বোধ করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, ডালেসের ট্যাক থেকে যে টাকা আদায় করা হবে সেই টাকা দিয়ে তিনি আসোয়ান বাঁধ তৈরি করবেন।

২৬শে জুলাই ১৯৫৬ সালে নাসের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে এক বক্তৃতা দিলেন। এই আলেকজান্দ্রিয়া শহর যেখানে তার বাল্যকাল এবং যৌবন কেটেছে এবং এই শহরে তিনি ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করে মিছিল আন্দোলনে

যোগ দিয়েছেন। আজ তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে সুয়েজ ক্যানালের ইঞ্জিনিয়ার. এবং তৈরি কর্তা ফার্ডিনান্ড দ্য লিসিপসকে গালিগালাজ করতে লাগলেন। আসলে ঐ দ্য লিসিপসকে গালমন্দো করবার কোন ইচ্ছেই নাসেরের ছিলনা। এই দ্য লিসিপস ছিল এক কোড শব্দ অর্থাৎ ইজিপশিয়ান সৈন্যবাহিনীর জন্যে এক ইঙ্গিত, এই ঈঙ্গিত দিয়ে বলা হল, অবিলম্বে সুয়েজ ক্যানাল ছিনিয়ে নাও।

এই বক্তৃতা শেষ হবার আগেই ইজিপশিয়ান সৈন্যবাহিনী ক্যানাল ছিনিয়ে নিল।

এদিকে ডালেস মনের খুশীতে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে বেরিয়েছেন। ২৬শে জুলাই পেরুর লিমা শহরে স্বাধীনতা দিবসে যোগ দেবার জন্যে এলেন।

সেইখানে আমেরিকান রাজদূতের বাড়ীতে যখন বিশ্রাম করছেন তখন হঠাৎ ওয়াশিংটন থেকে এক টেলিফোন এলো। টেলিফোন করছেন হারবার্ট হুভার, স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক বিশিষ্ট কর্মচারী। তিনি খবর দিলেন যে. কায়রোয় এক বক্তৃতায় নাসের ঘোষণা করেছেন সুয়েজ ক্যানেল তত্ত্বাবধানের ভার ইজিপ্ট সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় যাকে বলা হয় রাষ্ট্রীয়করণ।

এই খবরে ডালেস স্তম্ভিত হলেন। টাকা ধার না দেবার যে এই পরিণাম হবে এ কিন্তু তিনি কখনও কল্পনা করেননি।

ভাবতে লাগলেন, কোন সাহসে নাসের সুয়েজ ক্যানেল ছিনিয়ে নিলো।

একটু বাদেই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ডালেসকে টেলিফোন করলেন। ওয়াশিংটনে ফিরে আসার জন্যে ডালেসকে অনুরোধ জানালেন।

নিজের মনে ডালেস কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, টাকা না ধার দেয়াটা বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

এবার তার ভাবনা সুরু হলো এই ভুল শোধরানো যায় কী করে।

* * *

লন্ডন ২৬শে জুলাই।

১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট। প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইডেন আজ ইরাকের সম্রাট ফৈসালের সম্মানার্থে এই বিরাট ভোজের আয়োজন করেছেন। এই ভোজে লন্ডনের সব বড়ো-বড়ো অতিথিরা উপস্থিত হয়েছেন। এমনি সময় প্রধানমন্ত্রী খবর পেলেন যে, নাসের সুয়েজ ক্যানাল বাজেয়াপ্ত করেছেন।

এই সংবাদে ইডেন হতবাক হলেন। বেশ খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। নাসের যে ক্যানেল ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে এ ছিল তার কল্পনার অতীত।

সুয়েজ ক্যানেল শুধু মাত্র জাহাজ চলাচলের সামান্য জলপথ নয়—ইংরেজের জীবন। এর ভেতর দিয়ে জাহাজ ইংরেজের খাবার ও তেল বিদেশ থেকে নিয়ে

আসে। এই ক্যানেলের পথ বন্ধ হলে কী হবে। এ ছাড়া ক্যানাল ছিনিয়ে নেবার ফলে ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ হল। কিন্তু নাসের তার বক্তৃতায় স্পষ্ট বলেছেন যে, ক্যানেলের পথ সব দেশের জন্যই খোলা থাকবে। তাহলে ইংরেজের চিন্তা কী? চিন্তার কারণ আছে—কারণ ক্যানেলের মালিক ছিলো ইংরেজ এবং ফরাসী।

এই সব ভাবনা চিন্তায় ইডেনের সমস্ত ডিনারই মাটি হয়ে গেলো।

ডিনারের পরেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের জরুরী বৈঠক বসলো। আলোচনার বিষয় 'এবার ইংরেজ কী করতে পারে। নাসের ক্যানেল রাষ্ট্রীয়করণ করেছেন এর জবাব ইংরেজ কী দিতে পারে?

মন্ত্রীরা তাদের মতামত জানালেন। বৈঠকে ঠিক হলো যে, এই ব্যাপার নিয়ে ইডেন পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেবেন এবং ইংরেজ সরকারের নীতিকে বিশ্লেষণ করবেন।

অবশ্যি ইংরেজের নীতির ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিলোনা। কারণ সুয়েজ ক্যানেল রাষ্ট্রীয়করণে ইংরেজ বিচলিত হয়েছে এবং এর প্রতিশোধ নেয়া একান্ত আবশ্যক।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এক জরুরী ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছেন। লিমা থেকে তখনও ডালেস ফিরে আসেন নি। টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে, তার অবর্তমানে যেন কোন জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হয়।

ইতিমধ্যে হাউস অব কমন্সে তুমুল উত্তেজনা শুরু হয়েছে। সুয়েজ ক্যানেল রাষ্ট্রীয়করণ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। ইংরাজের ভবিষ্যৎ এই ক্যানেলের উপর নির্ভর করে। পার্লামেন্টের বক্তৃতায় ইডেন নাসেরকে গালমন্দ করলেন। বলা হলো যে, ক্যানেল রাষ্ট্রীয়করণ বে-আইনী। ইডেন এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বিরোধী নেতা গেইট্‌সকিল। তিনি ইডেনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মেলালেন।

আবার ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। এরপর কী করা যায়। ঠিক হলো, আমেরিকার কাছে অনুরোধ করা হবে যে, এই ব্যাপার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে লন্ডনে তাদের প্রতিনিধি পাঠানো হোক।

ইতিমধ্যে ফ্রান্স থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিনো এলেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে আলোচনা হলো। তারপর ইডেন আর পিনো প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে জানালেন যে, নাসেরের কীর্তিকলাপ তারা কখনই বরদাস্ত করবেন না। ক্যানেলের কর্তৃত্ব নাসেরের হাতে গেলে ইংরেজের তেল কোম্পানীগুলোর বিপদ বাড়বে। ইংরেজ সরকার বিশ্বাস করেন না যে, নাসেরের ক্যানেল ছিনিয়ে নেবার কোন ক্ষমতা আছে। মিষ্টি কথায় নাসের ভুলবার পাত্র নন। তার উপর রাজনৈতিক চাপ দিতে হবে। শুধু বিনয় নয় গায়ের জোর দেখাতে হবে।

ইডেন সাহেব এবার আইসেনহাওয়ারকে টেলিফোন করলেন। বললেন,

ক্যানেলের ব্যাপার নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে পুরো আলোচনা করা দরকার। কাউকে লন্ডনে পাঠান। এর জন্যে দরকার হলে লড়াই করতে হবে। আমার সেনাপতিদের আক্রমণ করার নক্‌সা বানাতে বলেছি।

আইসেনহাওয়ার কিন্তু ইংরাজ প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে বিচলিত হননি। তার প্রধান কারণ মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় আমেরিকার সম্পত্তি বিশেষ নেই। কয়েকটা তেলের খনি মাত্র। তাই তিনি বিশেষ উত্তেজিত হলেন না। পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশিষ্ট কর্মচারী রবার্ট মারফীকে লন্ডনে পাঠালেন। ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেইটে জানবার জন্যে। এর বেশী মারফীকে কিছু করতে হবেনা।

* * *

মারফী এলেন লন্ডনে। ইতিমধ্যে পারী থেকে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিনো এসেছেন। মারফী, লয়েড এবং পিনোর ভেতর এবার বিরাট বৈঠক হলো। কি করা যায় এই নিয়ে আলোচনা হলো।

মারফীর বহুদিনের বন্ধু হ্যারল্ড ম্যাকমিলান। তিনি তখন ইংলণ্ডের অর্থমন্ত্রী। একদিন ম্যাকমিলান মারফীকে তার বাড়ীতে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন।

ম্যাকমিলান ডিনার শেষে মারফীকে জানালেন যে, সুয়েজ ক্যানেল ফিরে পাবার জন্যে ইংরেজ যুদ্ধ করতে দ্বিধা বা সংকোচ করবে না। যুদ্ধের নকসা তৈরী করা হচ্ছে।

মারফী কিন্তু এই সংবাদে শঙ্কিত হলেন। ডিনার শেষে আইসেনহাওয়ারকে টেলিগ্রামে জানালেন যে, সুয়েজ ক্যানেলের সমস্যা সহজে মিটবে না। ইংরেজ এরজন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আর এই যুদ্ধের পরিণাম যে কী হবে তা কল্পনা করা অসাধ্য নয়।

পাঁচ ঘন্টা বাদে আইসেনহাওয়ার মারফীকে জানালেন যে, ইংরাজদের সঙ্গে এবিষয় আলোচনা করার জন্যে স্বয়ং ডালেস লন্ডনে আসছেন।

ইতিমধ্যে ইডেন হাউস অব কমন্সে মেম্বারদের জানিয়েছেন যে, লন্ডনের ব্যাঙ্কে ইজিপ্টের যে টাকা ছিলো তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ইডেন একদিন মারফীকে লাঞ্চে ডাকলেন। সেদিনকার লাঞ্চে সেলুইন লয়েড, ম্যাকমিলান ও লর্ড সলসবারী ছিলেন। ইডেন স্পষ্টই বললেন যে, যুদ্ধ ব্যতীত সুয়েজ ক্যানেলের সমস্যার সমাধান হবে না। নাসেরকে শিক্ষা দিতে হবে। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আরো বেশী রাগ; বিশেষ করে আমেরিকার প্রতিনিধি মারফীর উপর। সংবাদপত্রে আলোচনার সারাংশ বেরিয়েছে। পিনো সন্দেহ করেন এই সব মারফীর কান্ড।

এই আলোচনায় কিন্তু মারফী ইংরেজ বা ফরাসীদের বিশেষ উৎসাহ দিতে পারলেন না। কারণ ক্যানেলের জন্যে লড়াই করতে আমেরিকার সঙ্কোচ।

ইতিমধ্যে ডালেস লন্ডনে এসেছেন। প্রথম আলাপ-আলোচনায় তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করলেন। বহু ব্যাপারেই তিনি ইংরাজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত নন। ক্যানেল আক্রমণের ব্যাপারে তো নয়ই। ডালেস তাই প্রস্তাব করলেন যে, ক্যানেলের হাঙ্গামা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোকে নিয়ে এক বৈঠক করা হোক। মোট কথা যুদ্ধ কোন মতেই সম্ভব নয়।

ইডেন ডালেসের প্রস্তাব শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। ক্যানেলের এই হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছেন ডালেস। ইজিপ্টকে টাকা ধার না দেবার এইতো পরিণাম। এই আলোচনার পর ডালেস ইডেনের ভেতর মন কষাকষি সুরু হলো। ইডেন বলেন যে, ইজিপ্ট আজ ক্যানেল ছিনিয়ে নিয়েছে—কাল নেবে তেল কোম্পানী গুলোকে। ইংরাজের যা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে সবই যাবে। ডালেসকে ইডেন স্পষ্টই বল্লেনঃ মুনিক চুক্তিতে আমরা হিটলারের তোষামোদি করেছিলাম। আজ নাসেরের তোষামোদি করতে আমরা প্রস্তুত নই।

বহু তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হলো সুয়েজ ক্যানেল রাষ্ট্রীয়করণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে চব্বিশটি দেশ নিয়ে বৈঠক বসবে।

এই বৈঠক বসলো লন্ডনে। এতে যোগ দিতে এলেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। অস্ট্রেলিয়ার মেনেজিস, ভারতবর্ষ থেকে কৃষ্ণ মেনন।

বৈঠকে ঠিক হলো যে, ক্যানেলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে মেনেজিস কায়রোতে যাবেন।

মেনেজিস নাসেরকে হুমকি দিলেন: বললেনঃ ব্যাপারটা কতো গুরুতর হয়েছে আপনি জানেন না।

আমি জানি—নির্লিপ্ত কণ্ঠে নাসের জবাব দেন। নাসেরের মেনেজিসের হুমকিতে ভয় পেলেন না। ক্যানেল ইজিপ্টের সম্পত্তি, এটা রাষ্ট্রীয়করণ করার পুরো অধিকার ইজিপ্ট সরকারের আছে।

মেনেজিস ব্যর্থ হয়ে লন্ডনে ফিরে এলেন। রেগে কাঁই হলেন এন্থনি ইডেন, ডালেস চিন্তা-ভাবনায় পড়লেন। এর পর কী করা যায়? ইজিপ্টকে টাকা দিতে তিনি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এর যে এই গুরুতর পরিণাম হবে—এ তিনি কখনই কল্পনা করেননি।

ইডেন কিন্তু এরপর আর চুপ থাকতে পারলেন না। ভাবলেন মান সম্মান সবই গেছে, মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গীমলের একই মত। তাই ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে বৈঠক বসলো। চলুন এই বৈঠকের বিবরণীর জন্যে পারীতে যাই!

*　　*　　*

আজকে অভিনয়ের স্থান পারীর সাঁ জেলিসি নয়—শোন নদীর প্রান্তে পররাষ্ট্র দপ্তর কোয়া দ্য অরিসি।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৬ সাল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইডেন এবং তার সহকর্মী সেল্‌উইন লয়েড এসেছেন পারীতে সুয়েজ ক্যানেলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে।

হোতেল মাঁতিনতে নেতাদের বৈঠক বসলো। ইডেন বললেন: ইজিপ্ট আক্রমণ প্রথমে ইসরাইল করবে। আমরা পেছনে থাকবো, ওদের সংগে গেলে সবাই ভাববে আমরা ওদের সাহায্য করছি। না, ইসরাইলের সংগে আমাদের কোন যোগাযোগ আছে এ আমরা কাউকে জানাতে চাইনে।

আমেরিকা কী করবে? ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিনো প্রশ্ন করেন।

লড়াই সুরু হলে আমেরিকা নিশ্চয় আমাদের সমর্থন করবে। রাগ করবে বটে কিন্তু আমাদের এই আক্রমণে বাধা দেবেনা।

নাসের আমাদের তেল বন্ধ করতে পারে। এইটে আমার ভয়।

ইসরাইল আক্রমণ সুরু করার সংগে সংগে নাসের ক্যানেল বন্ধ করে দেবে—গীমলে শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন।

আমেরিকা আমাদের তেল দেবে—ইডেন জবাব দেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী গীমলে, এই আক্রমণের পরিণাম তার অজানা নেই। কিন্তু আজ পেছুবার যো নেই। কারণ তিনি মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার হতে দিতে চাননা। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি জবাব দেন, এই আক্রমণ ছাড়া আর কোন গতি নেই।

ইডেন বলেন: ইসরাইলের আক্রমণের ফলাফলের জন্যে আমি চিন্তা করিনে। একবার আক্রমণ সুরু হলে আমি ইজিপ্টকে আলটিমেটাম পাঠাবো। আমার কোন সন্দেহ নেই, যে, ইজিপ্ট এই আলটিমেটাম অগ্রাহ্য করবে। এই অগ্রাহ্যকে বাহানা করে আমি আক্রমণ সুরু করবো।

ঠিক হলো ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী এবার আক্রমণের পাঁয়তারা কষার জন্যে মাল্টা সাইপ্রাসে জড়ো হবে।

* * *

ইসরাইলের রাজদূত ইতিমধ্যে পারীর বিভিন্ন রাজদূতের দরবারে হানা দিচ্ছেন। ইসরাইলের হাতিয়ার চাই।

ফরাসী সরকার ইসরাইলকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই খবর গেলো ইডেনের কাছে। তিনি খুশী।

এবার কোন ভাবনা নেই। যত দোষ নন্দঘোষ। হাতিয়ার দেবে ফরাসী—আক্রমণ করবে ইসরাইল। এর চাইতে ভালো বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে!

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ণ প্রতিদিন গীমলেকে টেলিফোন করছেন। আক্রমণ কবে সুরু হবে? বেনগুরিয়ণ প্লেন চাইছেন।

একুশে অক্টোবর বেনগুরিয়ণ ভোরবেলা গীমলেকে টেলিফোন করলেন। গীমলের সংগে দেখা করতে চান। ঠিক হলো, পরদিন ছদ্মবেশে সবার অজান্তে

বেনগুরিয়ন পারীতে আসবেন। কাক-পক্ষীকেও জানতে দেওয়া হবে না যে, বেনগুরিয়ন ফ্রান্সে এসেছেন। গীমলে তার সংগে ভিল্লাকুবলে এয়ারপোর্টে গোপনে দেখা করবেন। ভিল্লাকুবলে পারী এবং ভের্সাই শহরের মাঝামাঝি ছোট একটি বিমান বন্দর। সেইখানে ফরাসী নেতা এবং ইসরাইলী নেতার ভেতর বিস্তারিত কথা হলো। বেনগুরিয়ন খবর পেয়েছেন যে, ইজিপ্টের সৈন্য বাহিনী এখনও লড়াইর জন্যে প্রস্তুত নয়। খবরটা আশাপ্রদ। এই সংবাদের পর আর দেরী করা চলে না।

দপ্তরে ফিরে এসে গীমলে এন্থনি ইডেনকে টেলিফোন করলেন। বললেন, সব ঠিক। এই অভিযানের নামকরণ হলো 'হামিলকার'।

আমেরিকায় ডালেস তখনও শলা পরামর্শ করছেন। মীমাংসা করার তার আপ্রাণ চেষ্টা। ইংরেজ ও ফরাসী যে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে এটা ডালেসের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। একদিন আমেরিকার তেল আভিভের মিলিটারী এ্যাটাসী ওয়াশিংটনে এই আক্রমণের খবর পাঠালেন। এই খবর পেয়ে ডালেস রেগে কাঁই। বিস্তারিত খবর জানবার জন্যে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত উইনথ্রপ আলড্রিচ গেলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েড তখন পার্লামেণ্টে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। তাই পরারাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারী ইভন ক্রিক্‌প্যাট্রিকের সঙ্গে মোলাকাৎ করলেন। ক্রিকপ্যাট্রিক অবস্থার একটা পুরো বিবরণী দিলেন। নাসেরকে যে আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে সে খবরও জানান হলো। এক কথায় লড়াইর জন্যে ইংরেজ প্রস্তুত।

এই সংবাদ শুনে উইনথ্রপ আলড্রিচ তো হতভম্ব। আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজ-ফরাসী যে আক্রমণ সুরু করতে পারে এ তিনি কল্পনা করেননি। বিচলিত হয়ে তিনি ওয়াশিংটনে ডালেসের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন।

ডালেস আইসেনহাওয়ার এই সংবাদে বিচলিত হলেন। লড়াই বন্ধ করার জন্যে ইডেনের কাছে আবেদন করা ছাড়া উপায় নেই। অনুনয় বিনয় করে আইসেনহাওয়ার ইডেনের কাছে পত্র দেন। কিন্তু লিখলে কী হবে! ইডেন-গীমলে মনস্থির করে ফেলেছেন। এখন আর মত পাল্টাবার যো নেই। ইসরাইলী সেনাবাহিনী ইজিপ্টের দিকে হানা দিয়েছে। সাইপ্রাস এবং মাল্টা বন্দরে ইংরেজ এবং ফরাসী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। 'অপারেশন হামিলকার' যে কোন মুহূর্তে সুরু হতে পারে। না, ইডেন আইসেনহাওয়ারের অনুরোধ রাখতে পারেন না। ইতিমধ্যে পারী থেকে গীমলে-পিনো আবার এসেছেন। অভিযান বন্ধ করা অসম্ভব এই তাদের মত।

হঠাৎ একদিন আক্রমণ সুরু হয়ে গেলো। প্রথমে হানা দিলো ইসরাইল। বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইংরেজ-ফরাসী জানালো যে, ইসরাইলী আক্রমণ বন্ধ না হলে তাদের সৈন্যবাহিনী ক্যানেল অধিকার করবে। কারণ ক্যানেলের আইন-কানুন

অনুযায়ী এ কাজ করার অধিকার ইংরেজ-ফরাসীদের আছে।

ডালেস ঠিক করলেন যে, সুয়েজ সমস্যা সিকিউরিটি কাউন্সিলে পাঠানো হবে। ইংরাজ-ফরাসী আপ্রাণ চেষ্টা করলো কাউন্সিলের বৈঠক স্থগিত রাখতে। বৈঠকের রায় যতোই দেরী করা যায় ততোই ইংরেজের সুবিধে। কারণ সেই সময়ের মধ্যে সুয়েজ তাদের দখলে চলে আসবে। কাউন্সিলের বহু তর্ক বিতর্কের পর ইংরেজ স্পষ্টই জানালো যে, ক্যানেলের কর্তৃত্ব যদি নাসেরের হাতে থাকে তবে কোন মীমাংসাই সম্ভব নয়। কিন্তু কাউন্সিলের বিপরীত মত। তারা এই আক্রমণের বিরোধী। এ কথা ইংরেজকে খোলাখুলিভাবে বলা হলো। বাধ্য হয়ে ইংরেজকে কাউন্সিলের নির্দেশ শুনতে হলো।

ইতিমধ্যে ইয়োরোপের অপর প্রান্তে যুদ্ধের কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। শুধু মাত্র সুয়েজ ক্যানেলের সমস্যা নয়—হাঙ্গারীর বিপ্লব নিয়ে ডালেস মহাভাবনায় পড়লেন।

*　　　*　　　*

ইংরাজ, ইসরাইলী এবং ফরাসী আক্রমণে কিন্তু নাসের ভেঙ্গে পড়েননি। আরব, এশিয়া, আফ্রিকায় এই আক্রমণ নিয়ে তুমুল আলোড়ন সুরু হলো। এই-সব দেশগুলো ইজিপ্টকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো।

সিরিয়ার বুকের ভেতর দিয়ে গিয়েছে ইরাকী তেলের পাইপ। এই পাইপ গিয়ে পৌঁচেছে লেবাননের সিডান বন্দরে। সিডান খ্যাতনামা বন্দর। প্রাচীনকালে এটা ছিলো গ্রীক ফিনিশিয়দের বন্দর। এইখান থেকে জাহাজে করে তেল যায় ইয়োরোপে।

সিরিয়ায় নাসেরের বহু সমর্থক। তারা জোট করে একদিন এই তেলের পাইপ কেটে দিলো। সমস্ত ইয়োরোপে তেলের দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো।

সুয়েজ ক্যানাল নিয়ে যখন হৈ হুল্লা চলছিল তখন আমেরিকা থেকে রবার্ট এ্যান্ডারসন নামে এক ধনী আমেরিকান সৌদি আরবিয়ার সম্রাট সাউদ একং ক্রাউন প্রিন্স (সাধারণত তিনি হ'ন প্রধান মন্ত্রী এবং ভবিষ্যতে তিনিই রাজার গদিতে বসেন) ফৈসালের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রবার্ট এ্যান্ডারসন ছিলেন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার টেক্সাসে কয়েকটি তেলের কুয়ো ছিল। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাকে সৌদী আরবিয়ায় সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তিনি নাসেরকে ক্যানাল রাষ্ট্রীয়-করণ করা থেকে বিরত করেন। এ্যান্ডারসন আলাপ আলোচনাকালীন সম্রাট সৌদ এবং ক্রাউন প্রিন্সকে বললেন আমরা তেলের বিকল্প অন্য আর একটি শক্তি আবিস্কার করেছি।

এই শক্তির নাম কী? সম্রাট সৌদ জিজ্ঞেস করলেন।

'নিউক্লিয়ার এনার্জি' এ্যান্ডারসন জবাব দিলেন।

এই নিউক্লিয়ার এনার্জি শক্তিটি কী এবং তেলের সঙ্গে এই শক্তির কী সম্পর্ক

তারা বুঝতে পারলেন না। তারা অ্যান্ডারসনের সাবধানবাণীকে হেসে উড়িয়ে দিলেন।

দীর্ঘ একটানা কথা বলে সুলতান এবার একটু দম নেয়। আমরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে সুলতানের কাহিনী শুনছিলাম। এ কাহিনী রূপকথার চাইতেও শ্রুতিমধুর। মধ্যপ্রাচ্য হলো বিপ্লবের আগ্নেয়গিরি। এ আগুন কখনও জ্বলে ওঠে—কখনও নিভে যায়। তাই এই দেশে নিত্যিই সরকারের পরিবর্তন হয়।

রাত প্রায় আড়াইটে। কিন্তু রৌসে অঞ্চল তখনও জন-কোলাহলে মুখরিত। দোকানপাট আলোয় ঝলমল করছে। রাতের নিস্তব্ধতা এই অঞ্চলে এসে এখনও আস্তানা গাড়েনি।

সুলতান আবার বলতে থাকে এবার ইরাকের বিদ্রোহের কথা বলব।

বিদ্রোহ করা মানেই রেডিও স্টেশনে হানা দেওয়া। কারণ ঐখান থেকে দেশবাসীকে জানাতে হবে যে, বিদ্রোহ জয়যুক্ত হয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রেডিও স্টেশন ঘেরাও করলো বিদ্রোহীরা। তারপর ঘোষণা করা হলো যে, ইরাকে নতুন শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছে।

বাগদাদের সব চাইতে বড় রাস্তা রশীদ আলী স্ট্রীটের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। শহরের সবচাইতে জমকালো রাস্তা। সব সময়েই এ রাস্তা লোকে-লোকারণ্য। বাগদাদে গিয়েছেন অথচ রশীদ আলী স্ট্রীট যাননি এ কখনও সম্ভব নয়। এবার বিদ্রোহী সেনারা এসে এই রশীদ আলী স্ট্রীটে জড়ো হলো। তাদের পেছনে হাজার হাজার জনতা ঘুরছে। এই জনতার ভেতর আমিও ছিলাম।

ইতিমধ্যে জনতা গিয়ে হাজির হয়েছে ব্রিটিশ এম্বাসীতে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার হৈ-হল্লা শুরু করলো। ইংরেজের বিরুদ্ধে জনতার বহুদিনকার রাগ। এবার সেই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ তারা প্রকাশ করলো।

কিন্তু এম্বাসীর এক কর্মচারী এসে বাধা দিলো। তার নাম গ্রাহাম। গ্রাহাম ছিলেন পুরো টোরী দলের লোক্। জনতার হাঙ্গামা দেখে তিনি রেগে কাঁই। তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। ব্যস্, আর যায় কোথায়! জনতা এবার গ্রাহামকে পাকড়াও করলো। আর এই সময়ে পাকড়াও করা মানেই হত্যা করা। বিক্ষুব্ধ জনতা এবার ব্রিটিশ দূতাবাসের উপর হানা দেয়। ব্রিটিশ রাজদূত মিশেল হোয়াইট বাধা দেবার চেষ্টা করেন। জনতা তাকে ভয় দেখায়।

শহরের গোলমালের আভাষ কিন্তু নুরী সইদ পেয়েছিলেন। আন্দাজ করতে তার অসুবিধা হয়নি যে, ব্যাপারটা কি! প্রাণের ভয়ে এবার তিনি ছদ্মবেশ পরলেন। আর সেই পোষাক পরে তিনি বাড়ী থেকে পালালেন। তাইগ্রীস নদী পার হয়ে এলেন এক বন্ধুর বাড়ীতে। সেইখানে তিনি আশ্রয় নিলেন।

সেই যাত্রায় নুরী সইদ রক্ষে পেতেন কিন্তু বিভ্রাট ঘটালো তার চাকর। বিদ্রোহী জনতা এসে যখন খোঁজ করলো নুরী সইদ কোথায়, চাকর সেই বন্ধুর

নাম করলো এবং বাড়ীর সন্ধান দিলো। বিদ্রোহীরা এসে এবার সেই বাড়ী হানা দিলো।

মেয়ের ছদ্মবেশ পরেছিলেন নুরী সইদ। কিন্তু সেই ছদ্মবেশ পরেও তিনি কারু নজর এড়াতে পারেননি। ধরা পড়ে গেলেন। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু বিদ্রোহীরা বাধা দিল। লড়াই শুরু হয়ে গেলো। বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করে নুরী সইদ ধরা দিলেন। বিদ্রোহীদের বিচারে তার শাস্তি হলো প্রাণদণ্ড। তাকে শুধু মারা হলো না—রাস্তা দিয়ে তার মৃতদেহ টানা হলো।

কাসেমের হাতে প্রাণ দিলেন ইংরেজ ভক্ত নুরী সইদ। মধ্যপ্রাচ্যের একটা যুগ শেষ হয়ে গেলো।

* * *

ইরাকের নতুন শাসনকর্তা আব্দুল করিম কাসেম।

তার বহুদিনের বন্ধু আরেফ।

আরেফের সাহায্য নিয়েই কাসেম এই বিদ্রোহে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু আরেফ ছিলেন নাসেরের বন্ধু। অথচ কাসেমের সঙ্গে নাসেরের বন্ধুত্ব নেই। নাসেরকে তার বড্ডো ভয়। সদা-সর্বদাই তার ভয় যে, নাসের তার রাজত্বে হাঙ্গামা বাধাবে। কাসেম তাই ইরাকে নাসেরের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমাবার চেষ্টা করলেন।

নুরী সইদের প্রেরণায় ইরাক 'বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টে' যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু কাসেম দেশের শাসনভার হাতে নিয়ে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে এলেন। 'বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের' সমাধি হলো। তাই এবার নতুন নামকরণ হলো 'সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানিজেশন বা সেন্টো'।

কিন্তু ইতিমধ্যে কাসেম-নাসেরের রেষারেষি বেড়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। হঠাৎ একদিন বাজারে গুজব রটলো যে, কাসেম আরেফকে সরাতে চাইছেন। তার প্রধান কারণ আরেফ নাসেরের পরম বন্ধু।

আরেফ হেন লোককে সরানো চাট্টিখানি কথা নয়। সরাবার সবচাইতে ভালো পন্থা হলো কোন দেশের এম্বাসডার করে দেওয়া। জর্মানীতে ইরাকের কোন এম্বাসডার ছিলো না। আরেফকে সেইখানে পাঠালেন কাসেম। কিন্তু আরেফ দেশ ছাড়বার পাত্র নন। কয়েকদিনের পরই তিনি ইরাকে ফিরে এলেন। আরেফকে গ্রেপ্তার করা হলো। শুধুমাত্র গ্রেপ্তার নয় মাগুয়াদীর দরবারে তার বিচার সুরু হলো।

মাগুয়াদীর দরবার ইরাকের ইতিহাসে বিখ্যাত। এই দরবারের বিচারে কেউ ছাড় পায় না। কারণ মাগুয়াদী ছিলেন কাসেমের ডান হাত। কাউকে কাবু করতে হলে কাসেম তাকে মাগুয়াদীর দরবারে পাঠাতেন।

মাগুয়াদী এবার অভিযোগ করলেন যে, আরেফ কাসেমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

করেছেন। এই অভিযোগের ভেতর নতুনত্ব কিছু নেই। আরেফ নাসেরের বন্ধু। নাসেরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যদি চক্রান্ত হয় তবে নিশ্চয়ই আরেফ দোষী।

মাগ্‌রাদীর দরবারে সাক্ষীর অভাব হয় না। সত্যি মিথ্যে গল্প বানাবার জন্যে সব রকমই সাক্ষী মেলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সাক্ষী সাবুদ তৈরী হলো। মাগ্‌রাদীর এক সাগরেদ কোরান হাতে করে বললে : জার্মানীতে যাবার আগের দিন আরেফ গিয়েছিলো কাসেমের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু এই দেখা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো তাকে হত্যা করা।

* * *

আড্ডা জমাবার জন্যে সুলতান আর এক দফা কফির অর্ডার দিলো। এলো টাটকা কফি, ঘুম তাড়াবার দাওয়াই। এক চমকেই ঘুমের নেশা ছুটে গেলো।

আমি কিন্তু উঠবার চেষ্টা করি। বলি : রাত তো কম হলো না সুলতান! চলো, এবার ওঠা যাক।

আমার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। বলে : সে কি হে! রাত আড়াইটে তো রোমের সন্ধ্যা। সবেমাত্র আড্ডা জমে উঠেছে। এখন কী আর এই বৈঠক সমাপ্ত করা যায়! কী বলো ফেরজিলি?

ফেরজিলি সমর্থন করে। বলে : বিক্রমাদিত্য, এই গভীর নিস্তব্ধ রাত দেখে মনে করবেন না যে, মধ্যপ্রাচ্য নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে আছে। যারা এই অঞ্চলের রাজনীতি নিয়ে কাজ কারবার করেন তাদের চোখে ঘুম নেই। সদা-সর্বদাই ভাবছেন কোথায় কী ঘটছে। এমনি না ঘুমিয়ে কতো রাত কাটিয়েছি তার হিসেব নিকেষ নেই। এমনি এক রাতের কাহিনী আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে রাত্রে আমি ঘুমোইনি—জেগেছিলাম। জেগে থাকার কারণ ছিলো। শুনুন—আমার সেই কাহিনী। আপনার ভালো লাগবে······

আমরা সবাই কফির পেয়ালা নিয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম। ফেরজিলি তার গল্প সুরু করলো ······

বাগদাদ শহর। জুলাই মাস। শহরে যেন আগুনের ঝড় বইছে। সেদিন রাতে ঘুম আসছিলো না। তাই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কফিখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। জেগে থাকার আর একটা গৌণ কারণ ছিলো। সেদিন শহরে কানাঘুষো হয়েছে যে, বিপ্লবের ঝড় যে-কোন মুহূর্তে বইতে পারে।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরী সইদের কাহিনী আবার আরো একটু ফেনিয়ে বলতে হবে। ইংরাজের পরম বন্ধু, নাসেরের ঘোরতর শত্রু। 'বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের' বড়ো সমর্থক।

নুরী সইদ কিন্তু সবার চোখের বিষ। ইংরেজের তাবেদারী করতে গিয়ে সবারই অপ্রিয় হয়েছিলেন। বিশেষ করে সৈন্যবাহিনী তাকে দুচোখে দেখতে পারত না।

কিছুদিন আগে জর্ডন আর ইরাকের ভেতর একটু মন কষাকষি হয়ে গেছে।

নুরী সইদ সৈন্যবাহিনীর নেতা কাসেমকে এই হাঙ্গামা দমন করতে পাঠিয়েছেন।

কাসেম কিন্তু নুরী সইদের কথায় কান দিলেন না। বরং ঠিক উল্টো কাজ করলেন। তিনি জর্ডন প্রান্তে গেলেন না। বাগদাদ শহর আক্রমণ করলেন।

আক্রমণের দিন তারিখ সব হিসেব করা হয়েছিলো। দুদিন বাদে ইস্তানবুলে 'বাগদাদ মিলিটারী প্যাক্টের' বৈঠক হবার কথা ছিল। এই বৈঠকে যাবার জন্যে নুরী সইদ তৈরী হচ্ছিলেন। তার সঙ্গে যাবেন সম্রাটের কাকা আবদুল্লা। বহুদিন থেকে ভদ্রলোক ইংরেজের সাহায্য নিয়ে সিরিয়ার সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছিলেন।

১৪ই জুলাই ভোর পাঁচটা। আমাদের কফি হাউসের আড্ডা তখনও ভাঙ্গেনি। রাজনীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।

এমনি সময় বন্দুক এবং মেসিনগানের গুলিতে আমরা নড়ে চড়ে বসলাম। কি ব্যাপার? বাইরে ছুটে গিয়ে দেখি কাসেমের সাঁজোয়া বাহিনী রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করেছে।

সম্রাট ফৈসাল সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। বাথরুমে দাঁড়ি কামাচ্ছিলেন. এমনি সময় বন্দুকের গুলির আওয়াজ তার কানে গেলো। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন, রাজপ্রাসাদ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহী সেনাদল। সৈন্যদের হৈ হুল্লায় চতুর্দিক মুখরিত। সম্রাট আতঙ্কিত হলেন। কিন্তু মনের আতঙ্ক বাইরে প্রকাশ করলেন না।

সম্রাট এবার বন্দুক হাতে করে বারান্দায় দাঁড়ান। সৈন্যদের শান্ত হবার আদেশ দেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে! এই চীৎকার হুল্লায় সম্রাটের কথা কেউ শুনতে পেলো না। বিদ্রোহী সেনাদল এবার দাবী করলো সম্রাট তার গদী ত্যাগ করুক।

হাঙ্গামা থামাবার জন্যে এবার সম্রাট ফৈসাল গুলী চালালেন। হাঙ্গামা থামাতো দূরের কথা—গোলমাল আরো বাড়লো। সৈন্যরা ক্ষেপে গেলো। বিদ্রোহী নেতারা বললো: আত্মসমর্পণ করো, নইলে বিপদ বাড়বে। কিন্তু সম্রাট তাদের কথায় কান দিলেন না। তিনি বন্দুক হাতে করে সৈন্যদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। সৈন্যরাও এবার রুখে দাঁড়ায়। দুপক্ষ থেকে গুলি চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ দখল করলো। সম্রাট ফৈসাল বিদ্রোহী ইরাকী সেনাদের হাতে বন্দী হলেন।

রাজপ্রাসাদের বাগান। এই বাগানে সম্রাট সকালে-বিকালে পায়চারী করতেন। এই বাগানে এনে সম্রাটকে দাঁড় করানো হলো। পাঁচ মিনিটের ভেতর তার বিচার হয়ে গেলো। বিচারে সম্রাটের শাস্তি হলো প্রাণদণ্ড।

এই সাজা দিতে বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। সৈন্যবাহিনীর এক গুলিতে সম্রাট ফৈসালের প্রাণ গেলো। সম্রাটের মৃতদেহ এবার জনতার হাতে তুলে দেয়া হলো। পরিণাম যা হবার তাই। হিংস্র জন্তুর মতো জনতা সেই মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

* * *

ফেরাঙ্গিলি এবার বলল, এদিকে আরেফের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ তৈরী করা হলো। বিচারে সবই মিথ্যে প্রমাণিত হলো কিন্তু তবু দু-একটা ব্যাপারে বলা হলো আরেফ দোষী। তাই আরেফের সাজা হলো প্রাণদণ্ড। কিন্তু কাসেম এই প্রাণদণ্ড মকুব করলেন। আরেফের শাস্তি হলো কারাদণ্ড।

কিন্তু জেলখানায় বসে আরেফ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সন্তর্পণে বাথ পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তার পরবর্তী কাহিনী পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই বিক্রমাদিত্য। দু-এক বছরের মধ্যেই কাসেমের জনপ্রিয়তা কমলো। সেই সুযোগ নিয়ে বাথ পার্টি এবং সৈন্যবাহিনী কাসেমের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরলো। আরেফ তার ক্ষমতা ফিরে পেলেন। শুধু ক্ষমতা ফিরে পাওয়া নয়, আরেফ হলেন ইরাকের হর্তাকর্তা বিধাতা। কী করে আরেফ তার ক্ষমতা ফিরে পেলেন তার পুরো কাহিনী আর একদিন বলা যাবে।

* * *

কাসেমের প্রধান শত্রু ছিলেন রসিদ আলি গিলানী। গিলানীর নাম আপনারা আগেই শুনেছেন। যুদ্ধের সময় গিলানী সবাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ কথা নয়। শেষ অবধি গিলানীর পরাজয় হলো। নুরী সইদ মারা যাবার পর গিলানী ইরাকে ফিরে এলেন।

গিলানী-কাসেমের বন্ধুতা চিরস্থায়ী হয়নি। ছোটখাটো ব্যাপারে নিয়ে প্রায়ই তাদের ঝগড়া হত। ঝগড়ার আর একটা কারণ ছিলো। গিলানী ছিলেন ঘোরতর কম্যুনিস্ট বিরোধী। তিনি প্রকাশ্যে কাসেমের নীতির বিরোধিতা করতেন। এরপর ঝগড়া না হয়ে উপায় নেই। ইরাকে কাসেমের নীতির প্রতিবাদ করার যো নেই। প্রতিবাদ করলেই বিপদে পড়তে হয়। গিলানীরও তাই হলো।

মাগুযাদীর দরবারে গিলানীর বিচার সুরু হলো। বলা হলো, তিনি ইসরাইলের গুপ্তচর। বিচারে গিলানী রেহাই পেলেন বটে, কিছুদিনের মধ্যে আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কাসেমের এক আত্মীয় অভিযোগ করলো যে, গিলানী ইরাকের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। অভিযোগ অবশ্য সাজানো হয়েছিলো এবং এর পেছনে ছিলেন মাগুয়াদী। এবার বিচারে গিলানীর সাজা হলো প্রাণদণ্ড।

আরেফ-গিলানীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েও কাসেমের বিপদ কমলো না। বরং তার বিপদ বাড়লো। একদিন কাসেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝড় দেখা দিলো মসুল শহরে।

মসুল হলো ইরাকের এক ছোট নগরী। কাসেমের বিরোধী নেতারা একদিন রেডিও ষ্টেশনে হানা দিয়ে ঘোষণা করলো যে, কাসেম নাসেরের পরম শত্রু এবং আরব একতার বিরোধী। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কর্ণেল আবদুল ওয়াহেব।

কিন্তু এই বিদ্রোহ হলো ক্ষণস্থায়ী। এই বিদ্রোহ দমন করতে কাসেমের

একটুও বেগ পেতে হয়নি। দুদিনের মধ্যে বিদ্রোহ শান্ত করা হলো।

মসুল হাঙ্গামার কিছুদিন বাদে কিরকুক শহরে আবার হাঙ্গামা শুরু হলো। আরব আর তুর্কীদের নিয়ে এই বিবাদের সূত্রপাত। এই হাঙ্গামায় বিস্তর লোক মারা গেলো। যারা হাঙ্গামা করেছিলো কাসেম তাদের কঠোর শাস্তি দিলেন। তিনি বিরোধী দলের নেতাদের ইরাকের নাগরিক জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করলেন। বিরোধী দলের নেতাদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হলো।

দীর্ঘ তিন বছর বাদে মসুল এবং কিরকুকের প্রতিহিংসা নেওয়া হলো বাগদাদ শহরে। বিপ্লবে কাসেমের মৃত্যু হলো, বাথ পার্টি ক্ষমতা পেলো। যে সব কম্যুনিস্ট নেতারা মসুল এবং কিরকুকে বাথ পার্টি নেতাদের আক্রমণ করেছিলো এবার তাদের শাস্তি দেওয়া হলো। কাসেমের পরম প্রিয় বন্ধু মাগদায়ীর প্রাণদণ্ড হলো। আরেফ আবার ক্ষমতা ফিরে পেলেন একথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই শান্তি ক্ষণিকের। কারণ কিছুদিনের মধ্যে আবার দেশে অরাজকতা দেখা দিলো। শুরু হলো বিপ্লব। বাথ পার্টির হাত থেকে আরেফ সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিলেন।

*   *   *

ফেরাজিল একটু দম নিয়ে নেয়। তারপর বলতে থাকে, মধ্যপ্রাচ্যের এই রাজনৈতিক কাসুন্দী হয়তো আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। কিন্তু তবু যখন সমস্ত ঘটনা বলতে সুরু করেছি তখন ইরাক-দামাস্কাসের বিদ্রোহ এবং কী করে বাথ পার্টি তাদের ক্ষমতা হারালো, তার আভাষ না দিলে আমার এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই আর একটু ধৈর্য ধরে আমার সেই কাহিনী আপনাকে শুনতে হবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদে যখন বিপ্লব হলো আমি তখন বাগদাদে। কাসেম যেদিন ক্ষমতা পেয়েছিলেন সেদিনও আমি বাগদাদে ছিলাম, সে কথা আপনি জানেন। সেইখানে রশীদ আলী স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে যখন মজা দেখছি তখন আমার সংগে সুলতানের পরিচয় হয়, তাই নয় কী? আমার মনে আছে সেদিনটা। শুক্রবার, ছুটির দিন। শান্ত শহর বিদ্রোহী সেনাদের বন্দুকের গুলীতে সচকিত হয়ে উঠলো।

ভীড়ের মধ্যে আমার সংগে সুলতানের পরিচয়। গুলীর শব্দে আমরা দুজনেই ভাবনায় পড়েছি, কী করা যায়! ভাবলাম, একবার শহরটা ভালো করে ঘুরে দেখা যাক। কিন্তু সেদিন প্রাণের ভয়ে আর শহর দেখা হয়নি। না গিয়ে ভালোই করেছিলাম। আফ্লাক আমার বিশেষ বন্ধু। জনতা যদি এ খবর জানতো তাহলে আর রক্ষে ছিলোনা। কারণ সেদিনকার বিক্ষোভ ছিলো বাথ পার্টির বিরুদ্ধে। ফেরাজিল তার কাহিনী শেষ করলো।

*   *   *

সেদিনকার মতো আমাদের আড্ডা ভাঙ্গলো। ফেরাজিলদের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে বিদায় নিলাম। প্রতিশ্রুতি দিলাম একদিন তাদের পার্টির বৈঠকে গিয়ে আড্ডা দেবো। ফেরাজিলি বললো : আমার এক বন্ধু সম্প্রতি আলজেরিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। বেনবেলার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। আসুন আমাদের বৈঠকে। আরব রাজনীতি নিয়ে মুখ খিস্তি করা যাবে। কী বলেন?

আমি হেসে জবাব দিই : নিশ্চয়। বহুদিন থেকেই আমার এ অঞ্চলের ইতিহাস জানবার আগ্রহ অপরিসীম। আপনাদের মুখে যদি কিছু জানতে পারি তাহ'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি ভোর হয়ে এসেছে। রৌসে অঞ্চলও নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। ক্ষণিকের মধ্যে এই অঞ্চল মূকবধির হয়ে যাবে। একটা দিন কেটে গেছে। এলো নতুন দিন, শুরু হলো নতুন জীবন। কিন্তু লিডো রেস্তোরাঁয় যারা রাত কাটান তাদের জীবনে দিন-ক্ষণের পরিবর্তন নেই। একই তালে, একই ছন্দে এই বারোয়ারী আড্ডাখানার জীবন বয়ে যায়। কারণ বেরুতে দিনরাত্রির মধ্যে পার্থক্য নেই। শুধু আছে চব্বিশ ঘণ্টা।

* * *

তারপর বেশ কয়েকটা দিন আমার সঙ্গে মিসেস্ সেনের দেখা হয়নি। হঠাৎ একদিন তিনি আমার আড্ডাখানায় এসে উপস্থিত হলেন।

মিসেস সেনকে দেখে যে আমি বিস্মিত হইনি এমন নয়। কিন্তু সেদিনকার মনের বিস্ময় প্রকাশ করিনি। করবার সুযোগও পাইনি। আমি কিছু বলার আগেই উনি বললেন : আশ্চর্য মানুষ বিক্রমাদিত্য! কী হয়েছে আপনার, বলুন তো! একেবারে অলঙ্ক্যাস্ত মানুষ। সেদিন পার্টি শেষ হবার আগে সেই যে উধাও হয়ে গেলেন তারপর দেখাতো দূরের কথা খবরও পেলাম না। ভাবনা হলো, সুলতানের পাল্লায় পড়ে হয়তো কোন বিপদে পড়েছেন। তাই দেখতে এলাম লোকটা বেঁচে আছে কিনা।

আমি এবার একটু লজ্জা প্রকাশ করি। নিজের ত্রুটি স্বীকার না করে উপায় নেই। মিসেস সেনকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো। ওর জন্যেই তো আমি সুলতান-ফেরাজিলির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

বলি, সত্যিই আমি ভারী দুঃখিত মিসেস সেন। কিন্তু আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। আপনি ডিপ্লোম্যাটের স্ত্রী, পার্টি-ককটেল নিয়ে সদা সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। এই ব্যস্ততার মাঝে আপনাকে কষ্ট দিতে সংকোচ হয়েছে। তবু ভেবেছিলাম, আজকাল গিয়ে আপনাদের খোঁজ করবো। কারণ আমার মধ্যপ্রাচ্যে থাকার মেয়াদ তো ফুরিয়ে এলো।

এবার মিসেস্ সেনের বিস্ময়ের পালা। তিনি জিজ্ঞেস করেন : সে কী, এইতো সেদিন বেয়রুটে এলেন! এতো শিগ্‌গির পালাবার চেষ্টা করছেন কেন?

আমি সামান্য সাংবাদিক, মিসেস সেন। সম্পাদকের নির্দেশে আমার

গতিবিধি ঠিক করতে হয়, পাঠকের রুচি অনুযায়ী আমাকে লিখতে হয়। অন্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে আমি প্রবন্ধ লিখি কিন্তু নিজের স্বাধীনতা থেকে আমি বঞ্চিত। সাংবাদিকের জীবনে এইটে সবচাইতে পরিহাস!

আমার কথা শুনে মিসেস্ সেন একটু গম্ভীর হলেন। এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিলো। এবার তিনি একটা চেয়ারের সামনে গিয়ে বললেন - বসতে পারি?

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি: সত্যি, আমার কী অন্যায়! কথা বলতে বলতে আমি এতো অন্যমনস্ক হয়েছিলাম যে, আপনাকে বসতে পর্যন্ত অনুরোধ করিনি! মাপ করবেন।

মিসেস্ সেন বসলেন।

সামনের টেবিলে বেশ কয়েকটা বই ছড়ানো ছিলো। কবিতা, প্রবন্ধ আর রাজনীতির বই। অষ্টিন ডবসন, জেমস এলরয়, ফ্লেকার, মার্গারেট উডসের কবিতা। মিসেস্ সেন বইগুলো নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বললেন, ফ্লেকারের 'গেট্স অব দামাস্কাস' পড়েছেন?

না,—আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিই।

পড়ুন, আপনার ভালো লাগবে। আপনি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, কবিতা পড়ে আনন্দ পাবেন। যখনই পার্টি বা কাজের অবসরে একটু সময় পাই তখনই আমি কবিতার বই নিয়ে বসি। এই এলাকা নিয়ে ইংরেজ কবিরা তো কম কবিতা রচনা করেন নি! যখনই আমি দামাস্কাসে যাই তখনই আমার 'গেট্স অব দামাস্কাস' কবিতা মনে পড়ে।

···This is the song of the east gate warden
When he locks the great gate and smokes in his garden.

বিক্রমাদিত্য, আপনি সাংবাদিক। সাংবাদিককে আমি হিংসা করি। মাঝে মাঝে কবির কথা মনে হয়। ভাবি, হতেম যদি আরব বেদুইন উড়তো বালি, ছুটতো ঘোড়া, না বিক্রমাদিত্য, আমার জীবনে এ সবই মরীচিকা।

কথা বলতে বলতে মিসেস্ সেনের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তিনি একটু গম্ভীর হয়ে পড়েন। আমার মনে হয়, তিনি যেন কোন বিস্মৃত জীবনের কাহিনী, যার স্মৃতি হয়তো তার জীবন থেকে মুছে যায়নি, তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ মিসেস্ সেন জিজ্ঞেস করলেন: সিগারেট আছে বিক্রমাদিত্য?

আমি কেন্ট সিগারেটের প্যাকেট দিলাম। মিসেস সেন একটা সিগারেট মুখে দিলেন। আমি আগুন ধরিয়ে দিলাম। মুখ থেকে এক ঝলক ধোঁয়া বের করে উনি বললেন: এই তো জীবন বিক্রমাদিত্য! মাত্র বিশ বছর আগে আমার বয়স তখন পনেরো, তখনও ভাবিনি যে, জীবনে একদিন সিগারেট খাবো, মদ খাবো, পরপুরুষের সঙ্গে বসে গল্প করবো। বাংলাদেশের মেয়ে, আমার

চারপাশে ছিলো সমাজের বন্ধন। কতো আইন-কানুন। জীবনে কী করতে পারব না তারই নির্দেশ।

জীবন ছিলো রঙ্গীন ফানুস। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই তিন নীতিকে ভিত্তি করে উঠেছিল আমাদের জীবন। সমাজের শৃঙ্খলার বাইরে যাবার একটুও অধিকার ছিলো না। নেই। ভাবুন না কেন, বাংলাদেশের একটি মেয়ের জীবন। যেই মেয়েটি বড়ো হতে শুরু করলো অমনি উপদেশের এবং নির্দেশের ভেতর সে কঠোর জীবন পালন করতে শুরু করলো। দাদা-বাবা-মা ছাড়া কারু সঙ্গে কথা বলার অধিকার নেই। নিজের ইচ্ছে মতো বই পড়বেন সেই স্বাধীনতা থেকেও আপনি বঞ্চিত। সিনেমা দেখতে যেই গেলো অমনি তার সঙ্গে গেলো অভিভাবকের দল, পুলিশের প্রহরীর মতো। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক করা হচ্ছে। ভালো-মন্দের বিচার হচ্ছে। এই যে শৃঙ্খলতার প্রাচীর, এই যে ব্যক্তি স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠ—এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

মিসেস্ সেন এবার দম নেবার জন্যে একটু চুপ করেন। আমার মনে হলো তিনি যেন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। কপালে ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে, কয়েকটি চুলের গোছা এসে তার চোখের উপর পড়েছে। চোখে-মুখে একটা অস্থিরতার ভাব ফুটে উঠেছে।

মিসেস্ সেন যখন কথা বলছিলেন তখন আমি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

আমি সাংবাদিক, রক্ত মাংসের জীব সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখলে যে তার প্রেমে পড়িনে এমন নয়। মিসস্ সেনের প্রতি যে আমার দুর্বলতা আছে একথা অস্বীকার করব না। কারণ সেদিন আমার চোখে তাঁকে ভালো লেগেছিলো। কিন্তু একটু বাদেই আমি যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। মিসেস সেন পরস্ত্রী। তার উপর দৃষ্টিপাত করাও সমাজের নিষেধ। এমন কী কথা কিংবা ভাবে এ মনোভাব ব্যক্ত করাও অন্যায়। বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা যারা আমার এই বই পড়ছেন তারা কখনই আমাকে এ অপরাধের জন্যে মার্জনা করবেন না। কিন্তু আজ বাংলাদেশেও এমনি ঘটনা তো আকচার হচ্ছে যা আমাদের সমাজের আইনের নিষেধ।

আমি সাংবাদিক, ভবঘুরে—দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই। মানুষের জীবন থেকে, তার সুখ-দুঃখের কাহিনী থেকে আমার উপন্যাসের উপাদান পাই। কিন্তু বিদেশে রোম-পারী বা প্রাহার মানুষের জীবন থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি বাংলাদেশের কলকাতা বা আসানসোলের নাগরিকের ভেতর সেই জীবনকে দেখতে পাইনে কেন?

হয়তো আমার উক্তির আরো একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমস্ত কথাকে ফেনিয়ে বলতে গেলে আপনি বিরক্তি অনুভব করবেন তাই আমার কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করছি।

আমার এই যাযাবর জীবনে দেশে ও বিদেশে বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছি। গল্প করেছি, আড্ডা মেরেছি, কারু বা প্রেমে পড়েছি, কারু সঙ্গে অভিনয় করেছি কিন্তু কাউকে মনে ধরে রাখিনি। কখনই মনে করিনি যে, কোন মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা বললে তাকে ভালোবাসতে হবে কিংবা কারু প্রেমে পড়লেই তাকে বিয়ে করতে হবে। তাই যদি করতে হতো তাহলে আমাকে বহু বিবাহ করতে হতো। এবং বহু বিবাহ প্রচলন নেই বলে আমি অকৃতদার।

আমার বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয় আমার চরিত্র সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ জেগেছে। জানবার নিশ্চয় প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমি কী চরিত্রের কী প্রকৃতির লোক। কিন্তু সে কথা বলবার অধিকার আমার নেই কারণ নীতিপরায়ণ বহু পাঠক আমার এই বই পড়বেন এবং হয়তো আতঙ্কিত হবেন। তাদের আমি কষ্ট দিতে চাইনে।

কিন্তু আপনারা যারা এই বই পড়ে আতঙ্কিত হয়েছেন, আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, আজ আপনারা যদি প্যারী বেরুতের বা রোমের নাগরিক হতেন তাহলে আমার সম্বন্ধে এই অহেতুক মন্তব্য প্রকাশ করতেন না। কারণ এখানে আমি হাজার নাগরিকের একজন। কোন্ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি সেই সম্বন্ধে আপনি অনর্থক চিন্তা করতেন না। আপনি বিশ্বাস করতেন না যে, ছেলে-মেয়ের মধ্যে একমাত্র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কই অপরিহার্য। আমার বান্ধবী কে এবং কোন্ শ্রেণীর, রাস্তার মেয়ে কিনা এই নিয়ে চিন্তা করার সময় আপনার নেই। কারণ এই সমাজে এই হলো গতানুগতিক জীবন। অথচ আপনি বাংলাদেশে বসে আছেন, এটা চিন্তা করতে পারবেন না একী সম্ভব?

সমাজের এই শৃঙ্খলা, এই সুষ্ঠাচার নিয়ে আপনি তো কম বড়াই করেন নি। কিন্তু আজ বিশ্বসংসারে আপনার এই সামাজিক রীতি নিয়ে হিসেব-নিকেশ করুন, দেখবেন, আপনার বড়াই করবার মতো কিছুই নেই।

আমি উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী, ব্যভিচারের সমর্থক নই কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সামাজিক কানুনের সাফাই গেয়ে আমরা বাস্তবজীবনকে এড়িয়ে যাচ্ছি।

এই সব কাসুন্দী আমি ঘাঁটতাম না যদি মিসেস্ সেন আমার সঙ্গে বসে তার অতীত দিনের স্মৃতিকে রোমন্থন না করতেন। কারণ আমি যখন এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি তখন মিসেস সেন বলে চলেছেন: জানেন বিক্রমাদিত্য একটা খেলনার পুতুলের মতো মানুষ হয়েছি। ভাঙবার অধিকার নেই, গড়বার ক্ষমতা নেই। আজ দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু যৌবনে দেশের সীমা পার হওয়া শুধু কল্পনা নয় ধৃষ্টতা বলে মনে হতো। কারণ আমি কখনই বাংলাদেশের সীমাকে অতিক্রম করতে শিখিনি। তাই প্রথম যখন বিদেশে এলাম তখন মনে হলো যেন এক নতুন জগতে এসেছি। সেখানে বাঁধন নেই, নির্দেশ নেই কিন্তু কেউ নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে না। তাই অনেক সময় ভাবি আমরা আজ কোথায়?

সেদিন মিসেস্ সেনের উক্তির প্রতিবাদ করিনি। করার প্রয়োজন মনে করিনি। আমার এই ভবঘুরের জীবনে বহু প্রশ্ন, বহু চিন্তাধারা আমাকে বিচলিত করেছে, মনের ভেতর সংশয় জাগিয়েছে যার কোন সঠিক জবাব পাইনি।

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের প্রতিভা আছে, ঐতিহ্য আছে রুচি আছে, আপনি বাংলাদেশে বসবাস করে আনন্দ পান। কিন্তু তবু দেখবেন যেই বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করে বাইরে এলেন অমনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ আপনি যেখানেই যান না কেন— রোম, লন্ডন, ন্যুইয়র্ক—এমন কি ঘরের পাশে বাগদাদ নগরীতে কিংবা আফ্রিকার বনজঙ্গলে, নায়রোবী, এনটিবিতে, আপনি একজন অপরিচিত মানুষ। আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে এদের চিন্তাধারার মিল নেই। আপনার ভাষা-ভঙ্গী-কানুন সবই পৃথক। দীর্ঘকাল আপনি যে নিয়ম শৃঙ্খলার ভেতর মানুষ হয়েছেন সেই নিয়ম এখানে অচল। আপনার তক্ষুণি মনে হবে আপনি যেন অন্য জগৎ থেকে এসেছেন। দেশে ফিরে যান, নতুনত্বের প্রচলন করুন, বলুন বিদেশে থাকতে এই সব আইন-কানুন রপ্ত করেছিলেন— অমনি চারদিক থেকে রব উঠবে, আপনি সাহেব হয়েছেন, বাঙালীর অবমাননা করেছেন, ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। অর্থাৎ বিশ্ব সংসার এগিয়ে যেতে পারে অথচ আপনার এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই।

ধরুন, আমি সাহিত্যিক, বাংলায় গল্প লিখি কিন্তু আপনি পাঠক হিসেবে কখনই আমার লেখাকে বরদাস্ত করবেন না যদি আমার এই উপন্যাসে বাংলা সমাজের রীতিকে অতিক্রম করে কিছু বর্ণনা করি। অর্থাৎ আমাকে সেই অতীত দিনের নায়ক-নায়িকা, সেই সমাজ নিয়ে গল্প রচনা করতে হবে। সহজ কথায় আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হবে আপনার অতি পরিচিত ব্যক্তি। নায়িকা আপনার রুচির ব্যতিক্রম করবেনা। সমাজের শৃঙ্খলাকে বজায় রেখে আপনি এই পুরাতন কাসুন্দী পড়ে খুসী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলা সমাজ নতুন করে গড়ে উঠছে। বর্তমান বিজ্ঞানযুগের ঢেউ এসে এখনও এই সমাজকে নাড়া দেয়নি যা অন্যান্য দেশকে দিয়েছে। কিন্তু আপনার উপন্যাস কাহিনী আজো পুরাণ প্রথায় রচিত হচ্ছে।

অস্বীকার করবোনা যে, বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের ঢেউ এসেছে, সমাজের অন্যদিক দেখবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু তবু আমি বলবো যে, আজকের সমাজে সাহিত্যে যাকে আপনি নতুন বলে বর্ণনা করছেন, বাইরের জগতে সেটা অতি পুরাতন, মধ্যযুগের জীবনপ্রথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। এককথায় বাঙ্গালী জীবনের গভীরতা চলে যাচ্ছে। জীবনের যে গভীরতা আমাদের ভেতর বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের উদার দৃষ্টি এবং চিন্তাধারা সমাজকে, বাঙ্গালী জীবনকে পরিপুষ্ট করেছিলো আজ সেই চিন্তাধারা বাঙ্গালীর জীবন থেকে শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা জানিনে যে, আমরা কী

চাই এবং কী করে সেই জিনিষ পাবো।

আমার চরিত্রের এই অসম্পূর্ণতা, আমার সমাজের এই অভাবকে আমি বিদেশে এসে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেছি।

দীর্ঘ চার বছর আমি আফ্রিকার বনজংগলে কাটিয়েছি, সেই দেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি নিজেকে বার-বার তাদের সংগে তুলনা করেছি কিন্তু দেখেছি যে, এরা নতুন পৃথিবীর সংগে তাল ফেলে চলেছে। আপনি আর আমি আজো অতীতের বাংলাকে নিয়ে বসে আছি।

আমার এই যুক্তিধারা নিশ্চয় আপনাদের ক্লান্ত করছে। তাই চলুন আবার মিসেস্ সেনের কাহিনীতে ফিরে যাই।

* * *

বলুন বিক্রমাদিত্য, আপনি আমার সংগে একমত কিনা? মিসেস্ সেনের প্রশ্নে হঠাৎ আমার চিন্তার রেশ ভেংগে যায়। একটু হকচকিয়ে বলি: কিসের কথা বলছিলেন? মিসেস সেনের কথায় একটু অভিমানের সুর ছিলো। তিনি এবার একটু রাগ করে বললেন: বারে! এতোক্ষণ যে আপনাকে কতো কথা বললাম তা বুঝি আপনার কানে যায়নি? আশ্চর্য মানুষ! বলছিলাম, আমাদের কথা, বাংগালী মেয়ের জীবন—যারা গোঁড়া সমাজের ভেতর মানুষ হয়েছি—সমাজের শৃংখলা ভাংগতে শংকিত হয়েছি, আজ বিদেশে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তবু নিজের মনে গ্লানি আসেনি, দুঃখ হয়নি, কষ্ট অনুভব করিনি। বরং জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছি নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। বলুন বিক্রমাদিত্য, আপনি এই নীতির সমর্থন করেন?

কোন নীতির মিসেস সেন? সমাজের নীতি ভাংগা—না এই নতুন জীবনকে গ্রহণ করার।

দুটোই। আমি এগিয়ে যেতে চাই বিক্রমাদিত্য। অতীতকে নিয়ে আঁকড়ে থাকতে চাই নে। আমি দেখতে চাই এই পৃথিবীকে, তাকে অনুভব করতে চাই, উপভোগ করতে চাই। বন্ধ গন্ডীর ভেতর আটকে থাকতে চাইনে।

এবার একটু চুপ করে থেকে মিসেস্ সেন বল্লেন: বলুন কী করে এই নতুন জীবনকে গ্রহণ করতে পারি?

মিসেস্ সেনের প্রশ্নের জবাব চট্ করে দিতে পারিনি। কারণ আমি জানি, যে সমাজে মানুষ হয়েছি সেই সমাজের আইন কানুন ভাঙতে গেলে আমাকে বিদ্রোহ করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহী লেখক বা সমাজদ্রোহী নেতা হবার সাহস কোথায় আমার!

আমাকে চুপ থাকতে দেখে মিসেস্ সেন বল্লেন: জানি আপনার মনে সংকোচ হচ্ছে। আপনি সমাজের নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে ভালোবাসেন কিন্তু তার প্রতিবাদ করার সাহস নেই। অর্থাৎ আপনি তাদেরই একজন—

যারা বিয়ে করার আগে পণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয় কিন্তু বিবাহের আসরে শুধু পণ নয় জিনিষ গুণে নেয়। অর্থাৎ আপনি ইজি চেয়ারে বসে উপদেশ দিতে ভালোবাসেন অথচ আপনার উপদেশকে কার্যকরী করার সাহস নেই।

বিক্রমাদিত্য, আজ পৃথিবীর সমস্ত আনাচে-কানাচে, নুাইয়র্ক থেকে মস্কোতে এমন কি আদিম আফ্রিকার বনেজঙ্গলে জাগরণের ঢেউ উঠেছে। সবাই অতীতকে ভেঙ্গে নুতনকে গ্রহণ করছে। পৃথিবীর রুচি পাল্টে যাচ্ছে

মিসেস্ সেনের কথা শেষ হবার আগে আমি হঠাৎ প্রশ্ন করি: বলুন, এই রুচি ভালো কী মন্দো? কুড়ি বছর কিংবা ত্রিশ বছর আগে আপনি যাকে ভালো বলে গ্রহণ করেছিলেন আজ তাকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা হয়না কেন?

মিসেস সেন আমার কথা শুনে হাসেন বলেন কারণ আজকের সংসার আর সেদিনকার জগতের সঙ্গে আজকের জগতের অনেক পার্থক্য. স্মরণ রাখবেন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, পেছনে যাচ্ছিনা। সেদিনকার নতুনত্বের ভেতর আজ আর কোন বিশেষত্ব নেই। পারিপার্শ্বিক জগৎ পাল্টে গেছে। ভালোমন্দো তারই উপর নির্ভর করে। প্রাচীনযুগে যে প্রথা ভালো ছিলো আজ তা বিকল হয়েছে।

আর একটু উদাহরণ দিই। ধরুন বিশ বছর আগে আপনি যে মোটর গাড়ী কিনেছেন, আজকের যুগে সেই গাড়ী চালাতে কী আপনার ভালো লাগবে? না বিক্রমাদিত্য, এ হলো ভাঙ্গা-গড়ার যুগ। আজকাল কিছুরই স্থিতি নেই। তাই কাউকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন না। নতুনকে আসতে দিন—অতীতকে ভুলে যান।

সেদিন মিসেস্ সেন যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, আমি ছিলাম নীরব শ্রোতা। জবাব দেবার চেষ্টা করিনি। ইচ্ছে থাকলেও উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার আগ্রহ দেখাইনি। কারণ আমি মিসেস্ সেনের মতবাদের নীরব সমর্থক ছিলাম।

এবার মিসেস্ সেন বললেন: যাক, তর্কের ফুলঝুরি দিয়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাইনে। শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, জেরুজালেম যাবেন? আমি যাচ্ছি।

যাবার প্রলোভন হলো কিন্তু তবু মত দিতে পারলাম না। কারণ আমার দেশে ফিরবার দিন ঘনিয়ে আসছিলো কিন্তু বহু কাজ তখনও সমাপ্ত হয়নি। তাই যাবার জন্যে ইতস্ততঃ করলাম। বললাম: জেরুজালেমে যাবার ভারী ইচ্ছে কিন্তু সামনের কটা দিনের ভেতর যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। ভাবছি দু-একটা দিনের জন্যে কায়রো যাবো। এই অঞ্চলের রাজনীতির হলিউড হলো কায়রো। বলুন, কায়রোতে একবার দর্শন না দিয়ে দেশে ফিরে যাই কী করে!

মিসেস সেন হাসেন। বলেন: আপনাকে পীড়াপীড়ি করবো না। একা কয়েকটা দিনের জন্যে জেরুজালেমে যাচ্ছিলাম মহিলা সমিতির সম্মেলনে যোগ

দেবার জন্যে। ভাবলাম আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। আপনি রাজনীতির তীর্থস্থানে যাচ্ছেন, আমি যাচ্ছি ধর্মের পবিত্রভূমি ভগবান যীশুর জন্মস্থানে। দেখতে পাচ্ছেন তো, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী কতো পৃথক!

মিসেস্ সেনের কথার কোন প্রতিবাদ করিনি। চুপ করে ছিলাম।

মিসেস্ সেন এবার জিজ্ঞেস করেন: দেশে কবে ফিরছেন?

সপ্তাহ দুইয়ের ভেতর। আমার কাগজের সম্পাদক দেশে ফিরবার জন্যে রোজই তাগিদ দিচ্ছেন। তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমার নেই মিসেস্ সেন। তাই ভাবছি এবার মধ্যপ্রাচ্যের পাততাড়ি গুটিয়ে দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাবো।

তাহলে জেরুজালেম থেকে ফিরে এসে আপনার দেখা পাবো না?

হেসে জবাব দিই, সম্ভবতঃ তাই। মিসেস্ সেনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। একটু গম্ভীর মুখে বললেন: আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ভারী খুসী হয়েছিলুম। আপনি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, শিখেছেন। হয়তো আপনার মতবাদ, আপনার অভিজ্ঞতা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠবে। তাই যেন হয়, এই আমার কামনা বিক্রমাদিত্য। নতুন জীবনস্রোতের সঙ্গে আপনি বাঙ্গালীর পরিচয় করিয়ে দিন। যাক, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে জানিনে। যদি কখনও ভারতবর্ষের বাইরে আসেন তবে একবার খোঁজখবর নেবেন। ঠিকানা তো ভুল হবার যো নেই। ভারতীয় দূতাবাস, সে কায়রো হোক প্যারী হোক বা মাদ্রিদই হোক, কেউ না কেউ বলতে পারবে কোথায় আছি। মোট কথা আমায় ভুলে যাবেন না কিন্তু।

মিসেস্ সেন উঠে দাঁড়ালেন। আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। উনি প্রত্যুত্তর দিলেন।

তারপর শাড়ীর আঁচলটা আরো একটু দেহের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। বললেন: বিদায় বিক্রমাদিত্য। আবার দেখা হবে—

আমি হেসে জবাব দিই: বিদায়।

*　　　　*　　　　*

মিসেস্ সেনের সঙ্গে দেখা করতে আমার বিদেশে যেতে হয়নি। হঠাৎ কলকাতায় একদিন দেখা হয়ে গেলো। আমার মধ্যপ্রাচ্য সফরের প্রায় তিন বছর বাদে আমি কলকাতায় এসেছিলাম কয়েকদিনের জন্যে। একদিন প্রায় বিকেল চারটার সময় আলিপুর বেলভেডিয়ারের সামনে বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ কে জানি পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো।

: বিক্রমাদিত্য!

বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি মিসেস সেন।

উত্তেজনায় বেশ খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারিনি। অপ্রত্যাশিত কাউকে যখন দেখা যায় তখন মুখ যেন মূক হয়ে যায়। বেশ খানিকক্ষণ আমারও

তাই হয়েছিলো।

আপনি ··আপনি এখানে মিসেস্ সেন! আমার কণ্ঠে বিস্ময়ের রেশ।

মিসেস সেন নই বিক্রমাদিত্য। মিস চক্রবর্তী। ওটা আমার পৈতৃক পদবী। সেই পদবীতে আবার ফিরে এসেছি। শুনে অবাক হলেন? কিন্তু সে দীর্ঘ কাহিনী বারান্তরে বলা যাবে।—আপনার কী খবর? আমায় কলকাতায় দেখতে পাবেন নিশ্চয় কল্পনা করেন নি। এইখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এসেছিলাম। রিসার্চের কাজে।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে তিনি হাঁপাতে থাকেন।

কিন্তু আমার মুখের স্তব্ধতা যেন যায় না। বলি: মিসেস্ সেন, মানে মিস চক্রবর্তী। সত্যি কলকাতায় আপনার দেখা পাবো এ আমি ভাবিনি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? জীবনের এতো পরিবর্তন হলো কেন?

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কী এতো কথা বলা যায় বিক্রমাদিত্য?

ট্যাক্সী ডাকবো আমি প্রশ্ন করি।

আজ নয়। আর একদিন। শুধু একটা কথা বলবো—জীবনে পরিবর্তন চেয়েছিলাম, তাই পেয়েছি। যাক, ঐ তিন-বি বাস আসছে। ঐটে আজ আমার বাহক।

কথা শেষ হবার আগেই গাড়ী হুড়মুড় করে চলে এলো। মিসেস সেন বাসে উঠে বসলেন। ভীড়ের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিলেন। আমি তখনও নীচে দাঁড়িয়ে। উনি ঐ ভীড়ের ভেতর থেকে চীৎকার করে বলেন: আবার দেখা হবে।

নিশ্চয়—আমি বলি। সশব্দে বাস ছেড়ে দিলো। বাসের ধোঁয়া এসে আমার মুখের উপর পড়লো। কোন প্রশ্ন করার আগেই গাড়ী বহুদূরে চলে গেছে। হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে, আমি মিসেসে সেনের ঠিকানা জানি নে। জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি। তাড়াহুড়োয় আসল কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

এরপর মিসেস সেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দেখা হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। লোক পরম্পরায় শুনেছি যে, জীবনের গতিবিধি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার বনেনি। তাই কুমারী জীবনে ফিরে আসতে তার দ্বিধা হয়নি। অনুশোচনা করেননি।

আপনাদের সঙ্গে তার কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না। যদি দেখা হয় আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। কারণ আমি মনে করি মিসেস সেন হলেন আজকে নতুন প্রগতির চিহ্ন। আপনারা তার সঙ্গে আলাপ করে হয়তো অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। অন্ততঃ এ আমার ধারণা।

গল্পের শেষ আছে। কারণ পাঠক ক্লান্ত এবং লেখক ভাবধারায় রিক্ত তাই

আজ এইখানে আমাকে আরব বেদুইনের কাহিনীর মাত্রা টানতে হবে। কিন্তু বললেই গল্পের সমাপ্তি করা যায় না। উপসংহার বলে গল্পের একটি অপরিহার্য অংশ আছে যাকে বাদ দেয়া যায় না। আমিও দেবো না।

আমি মিশরের রাজধানী আলকাহেরাতে গিয়েছিলাম। সেখানকার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। নতুন ইজিপ্টের অনেক আভাষ আপনাদের দিয়েছি। আমার আরব বেদুইনের মন চঞ্চল, সদা-সর্বদাই এগিয়ে চলে। পেছনে তাকাবার সময় নেই। তাই আমরাও তার সঙ্গে এগিয়ে চলবো। কিন্তু তবু প্রাচীন মিশরের আভাষ কিছুটা দেয়া প্রয়োজন।

তারপর একদিন আমার যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো। কিন্তু যাবার আগে তিন চারদিনের জন্যে গেলাম আলকাহেরাতে, সেখান থেকে জেরুজালেমে। যীশুখৃষ্টের পবিত্র স্থানেই আমাকে গল্পের ইতি টানতে হবে। কিন্তু গল্প সমাপ্তি করার আগে আলকাহেরার গল্প কিছুটা বলে নিই।

* * *

আলকাহেরা।

অতীতের বহু স্মৃতি বিজড়িত মিশরের রাজধানী। মানব সভ্যতায় অবিস্মরণীয়।

প্লেনের পাইলট আমাদের সতর্ক করে দিলো যে, আমরা মিশরের রাজধানী আলকাহেরাতে এসে পৌঁছোচ্ছি। প্রলুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। চোখের সামনে অতীত যেন আমার কাছে ভেসে ওঠে। এই হলো ক্লিওপেট্রার মিশর, সম্রাট রামেশিসের কায়রো এবং মহাবীর আলেকজান্দারের নগরী, যার স্মৃতিকে অটুট রাখার জন্য সমুদ্রতটে এক নতুন বন্দর গড়ে উঠেছে। এই সেই মিশর যেখানে যুদ্ধ বিজয়ী নেপোলিয়ান সৈন্যদল নিয়ে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। পরাজিত সম্রাটের আতঙ্কে নয় প্রাচীন সভ্যতার তীব্রতায়। ঐ সেই মিশরের পিরামিড যার প্রতি তাকিয়ে সম্রাট নেপোলিয়ন স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন এই মিশর, যার গৌরব গাঁথা শুধু রূপকথায় শুনেছি। এই সেই মিশর, যার ছয় হাজার বছরের সভ্যতা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিশরের সভ্যতা আজকের নয়, প্রায় ছয় হাজার বছরের প্রাচীন। এই সভ্যতা, এই নগরীর ঐশ্বর্য, কতো দেশ, কতো বীরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো তার হিসেব নেই। গ্রীস রোম পারস্য আরব তুর্ক মেমলুক তাদের বিজয় পতাকা উড়িয়েছে এই নগরীতে। কিন্তু কেউ-ই এখানে চিরস্থায়ী হয়নি। স্রোতের মতো কতো সম্রাট এসেছেন তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন তার হিসেব নেই।

মিশরের অতীতের স্মৃতি আজ ম্লান তবু অটুট আছে। যুগের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মিশরের পরিবর্তন হয়নি। অতীতের মিশর ছিলো সভ্যতার

তীর্থস্থান. আজকের মিশর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক রাজধানী।

* * *

মিশর মুসলমান প্রধান দেশ। প্রাচীন ধর্ম আজ আর নেই। সেকালের ভগবানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন হোরাস, রে এবং সর্বশেষে মৃত্যুর ভগবান অসিরিস এবং ইসিস। এদের মধ্যে অসিরিস সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তী আছে তিনি খুব ন্যায়পরায়ণ সম্রাট ছিলেন। অসিরিসের ভাই ছিলেন শেঠ। তিনি অসিরিসকে ভারী হিংসা করতেন চক্রান্ত করে ভাইকে হত্যা করেন এবং তার মৃতদেহের বিভিন্ন টুকরো চারদিক ছড়িয়ে দেন। আবিদস বলে মিশরে একটি জায়গা আছে। সেইখানে অসিরিসের মাথা লুকিয়ে রাখা হয়। অসিরিসের স্ত্রী ইসিস মৃতদেহের বিভিন্ন টুকরো খুঁজে বের করেন। ইসিসের বন্ধু ছিলেন আনুবিস। আনুবিস ছিলেন শেয়াল রাজা, অবশ্য পরে তিনি মৃতদেহ রক্ষায় সম্রাট ছিলেন।

অতীতের প্রাচীন ধর্ম আজ বলতে গেলে মিশর থেকে ম্লান হয়ে গেছে। শুধু ইসলাম বজায় আছে। ইসলামই মিশরের প্রধান ধর্ম। অবশ্য ক্ষীণ দীপশিখার মতো আর একটি প্রাচীন ধর্মাবলম্বীরা আজো মিশরে আছে। সংখ্যায় এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এরা নগন্য। তরবারির সাহায্য নিয়ে ইসলাম এসেছিলো মিশরে। কিন্তু কপ্ট ক্রিশ্চিয়ানরা মুসলমান হতে রাজী হয়নি। এই গররাজির জন্যে তাদের কী কম ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। এদের একঘরে করে রাখা হলো। মুসলমানদের সঙ্গে এদের বিয়ের বালাই নেই। এছাড়া এই দুই সম্প্রদায়ের ভেতর ঝগড়া বিবাদ তো লেগেই আছে। সম্প্রতি নাসেরের আমলে এদের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কপ্ট ছাড়া কিছু ইহুদী এবং নুবিয়ান আজো আছে। নুবিয়ানরা অতীতের বহু ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

* * *

আলকাহেরার বিমানবন্দরের বাইরে এসে ভাবছি এবার কী করা যায়। টুরিস্ট হলে বালাই নেই। সোজা হোটেলে চলে যাও গাইড ঠিক করে। তারপর ক্যামেরা হাতে ঝুলিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াও।

কিন্তু আমি তো টুরিস্ট নই, সাংবাদিক। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান আমার পেশা। বিমানবন্দরে পুলিশের কর্তারা আমার ছাড়পত্রে পেশার বিবরণী দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। উদম মাঠে সাংবাদিককে ছেড়ে দেবার অনেক বিপদ আছে। ঘটনার বিকৃতি ঘটনার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিয়েছি যে, আমার দ্বারা কিছুর বিকৃতি ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই!

কিন্তু হঠাৎ আমি টের পেলাম যে, মিশরের রাজধানীতে আমি পরিত্যক্ত ব্যক্তি নই। আমার বেরুটের অকৃত্রিম বন্ধু প্যাট্রিক সীল বিমানবন্দরের এক প্রান্তে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

প্যাট্রিক সীলের একটু গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন। সীল আমাদেরই সমগোষ্ঠী—লণ্ডন অবজার্ভার এবং ইকনমিস্টের সংবাদদাতা। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য স্পেশালিস্ট কিন্তু সংবাদের সন্ধানে তাকে ঘুরতে হয় না। সংবাদ যেন তারই প্রতীক্ষা করে। সংবাদ যেন তার হাতের মুঠোয়।

মিশরের সভ্যতার উপর প্যাট্রিক সীলের অগাধ জ্ঞান। বেরুটে থাকাকালীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, আমাকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবে। সেই প্রতিশ্রুতি আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু আজ আলকাহেরার বিমানবন্দরের বাইরে তাকে দেখে আমার সেই কথা মনে পড়লো। আলকাহেরাতে প্যাট্রিক এসেছিলো সংবাদের সন্ধানে।

শমিরামি হোটেলে গিয়ে উঠি। এই অঞ্চলে অনাহূত হয়ে এলে হোটেলে স্থান পাওয়া মুশকিল। কিন্তু আলকাহেরাতে আমার থাকার বন্দোবস্ত আগে থেকেই করেছিলো সীল। তাই শমিরামি হোটেলে জায়গা পেতে অসুবিধে হয়নি। গাড়ীতে বসে সীল আমাকে বলে: বিক্রমাদিত্য, নাসেরের মিশরের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। কিন্তু অতীতের মিশর, তার ঐশ্বর্য, তোমার কাছে অপরিচিত। মিশরের এই ঐশ্বর্যকে আরো ভালো করে জানতে হলে বহুদিন সময় লাগবে। কারণ প্রায় ছয় হাজার বৎসর অতীতের সভ্যতা এই মিশর দেশকে ঘিরে আছে।

একটু হেসে সীল আবার বলতে থাকে: জানো বিক্রমাদিত্য, মিশর জয় করতে এসেছিলেন সম্রাট নাঁপোলিও। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো যে, মিশরের সভ্যতা তাকে পরাজিত করেছে।

হোটেলে আস্তানা ঠিক করে আমরা গেলাম শহর ঘুরতে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর সীল আমাকে একটি ছোট বারে নিয়ে গেলো। সেইখানে দুটো ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে সীল মিশরের কাহিনী বলতে লাগলো। তার সেদিনের গল্পের পুরোটা আমার স্মরণ নেই। যেটুকু মনে আছে তাই বলছি।

চলুন, আমরা মেমফিসে যাই।

অতীত মিশরের রাজধানী মেমফিস ক্লিওপেট্রা-রামেশিশের নগরী। মিশরের গৌরব এই মেমফিস নিয়ে, তার পিরামিডকে ঘিরে।

আরব মুসলমান এসে যখন মিশর আক্রমণ করলো তখন রাজধানী মেমফিস থেকে তুলে আলকাহেরাতে আনা হলো। আজ মেমফিস শুধু অতীতের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে।

মিশরের দ্বিতীয় আকর্ষণ হলো পিরামিড। উপন্যাস-ইতিহাসে পিরামিডের কাহিনী পড়েছেন কিন্তু পিরামিড দেখার সৌভাগ্য আপনার হয়নি। এই মেমফিসের চারপাশে পিরামিডগুলি ঘিরে আছে, একটা-দুটো নয় প্রায় ষাটটা।

সম্রাট নাঁপোলিও পিরামিড দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। চীয়পের পিরামিডে উঠে তিনি হিসেব করে দেখলেন যে, এই পিরামিড তৈরী করতে যে মাল-মশলা

লেগেছে সেই মাল দিয়ে সমস্ত ফ্রান্স ঘিরে দশ ফুট উঁচু প্রাচীর তৈরী করা যেতে পারে। নাঁপোলিওর হিসেব কিন্তু অন্য সবাইকে বিস্মিত করেছিলো। পরে খবর নিয়ে দেখা গেলো নাঁপোলিওর উক্তি সত্যি। কারণ চীয়পের পিরামিড প্রায় চারশো আশী ফুট উঁচু। এই পিরামিড তৈরী করতে প্রায় তেইশ লাখ পাথরের দরকার হয়েছে।

তৈরী করতে কম সময় নেয়নি। অনুমান করা হয় এ হলো প্রায় কুড়ি বছরের কাজ। সেকালে তো পিরামিড তৈরী করার জন্যে যন্ত্রপাতি মিলতো না। শ্রমিক দিয়ে এই সব পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।

আপনি জানতে চান পিরামিড কী করে তৈরী হলো আর কেন তৈরী হয়েছিলো। পিরামিডের ইতিহাস নিয়ে তো আর কম গবেষণা হয়নি। বহু জনার বহু মত। অনেকে বলতেন যে, সেকালকার সম্রাটেরা ক্ষমতালোভী ছিলেন। দেশের শাসনতন্ত্র নিজের হাতের মুঠোয় রাখতেন। পিরামিডের কাজকর্মের বাহানা দিয়ে প্রজাদের কাজকর্মে ব্যস্ত রাখা হতো যাতে দেশে শৃঙ্খলা থাকে। আর তখনকার দিনে শ্রমিকের অভাব ছিলো না। প্রতি বছরই নীল নদীতে বন্যা আসতো। সেই সময়ে চাষীরা বেকার হয়ে থাকতো। এই সব চাষীদের শ্রমিকের কাজে ব্যবহার করা হতো।

কিন্তু পিরামিড কেন তৈরী হয়েছিলো? রাজায়-প্রজায় সেকালে বেশ হৃদ্যতা ছিলো। শুধু জীবিত থাকাকালীন এই হৃদ্যতা বজায় রাখা হতো না। চেষ্টা হলো, কী করে মৃত্যুর পর সম্রাটের আত্মাকে জিইয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ যেন অন্য জগৎ থেকেও তার প্রজাদের সুখ-সুবিধা দেখতে পারেন। তাই তাদের দেহকে ওষুধ-পত্তর দিয়ে জিইয়ে রাখা হতো। আর সেই দেহকে ঘিরে এক প্রাসাদ তৈরী করা হতো। এই হলো মিশরের পিরামিড।

পিরামিড তৈরী হবার আগে আর এক ধরনের সমাধিস্তম্ভ ছিলো। এগুলো শুধু ইট দিয়েই তৈরী করা হতো। পাথরের কোন বালাই ছিলো না। এই সমাধি মন্দিরের নাম ছিলো মাসতবা।

কিছুদিন বাদে এই মাসতবার অদল-বদল হলো। ইটের বদলে পাথর ব্যবহার করা হলো। তাই এই সমাধি মন্দিরের নাম হলো পিরামিড।

প্রথম পিরামিড তৈরী হলো সাকারায়। এই পিরামিডের ভেতর সম্রাট জোসারকে সমাধি দেওয়া হয়েছিলো। যিনি এই পিরামিড তৈরী করেছিলেন তার নাম ছিলো ইমহোতেপ। তিনি ছিলেন সম্রাট জোসারের ইঞ্জিনিয়ার। ইমহোতেপ শুধু ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না চিকিৎসা শাস্ত্রেও তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিলো।

এবার কাজ শুরু হলো। মিশরে তখন গোলমালের বালাই নেই। সম্রাটের অগাধ ক্ষমতা। ইটের বদলে পাথর ব্যবহার করা হলো। সিঁড়ি তৈরী হলো। তাই পিরামিডের নামকরণ হলো স্টেপ পিরামিড। এই হলো আদিম

পিরামিড।

স্টেপ পিরামিডের প্রায় সত্তর বছর বাদে গিজায় চীয়পসের পিরামিড তৈরী হলো। বলতে গেলে চীয়পসের পিরামিডই সব চাইতে বড়ো এবং বহুকাল ধরে এই পিরামিড পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম ছিলো।

দৈর্ঘ্য ও আয়তনে চীয়পসের পিরামিডের সমতুল্য দালান পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে আর হয়নি। লম্বায় এই পিরামিড হলো প্রায় ৭৫৫ ফুট এবং উঁচু ৪৮১ ফুট। কিন্তু চীয়পসের পিরামিডের খ্যাতির কারণ তার আয়তন নয়। যে নিপুণতার সঙ্গে এবং দক্ষতা নিয়ে এই পিরামিড তৈরী করা হয়েছে তার সমতুল্য কোন কাজ পৃথিবীতে বহুকাল করা হয়নি।

চীয়পসের পিরামিডের নিকটেই বিখ্যাত স্ফিনিক্সের প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। ফিনিক্স সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কারণ এর মুখ হলো মানুষের এবং দেহ সিংহের। কী করে হলো এবার সেইটে বলছি। স্ফিনিক্স নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কী করে এবং কেন মানুষ এবং সিংহের মূর্তি একত্র হলো, এই নিয়ে মতবাদের অন্ত নেই। কিন্তু প্রাচীন মিশরে সিংহের বেশ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিও ছিলো। পবিত্র মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিলো সিংহের উপর। পিরামিডকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হতো।

সেকালের প্রিয় দেবতার মধ্যে সূর্য দেবতার বেশ কদর ছিলো। সাধারণতঃ জনসাধারণ সূর্যদেবের আরাধনা করতেন। তাই কিছুদিন বাদে একটা নতুন পন্থা আবিষ্কার করা হলো। সূর্যদেবতার মুখ এনে সিংহের গায়ে বসানো হলো সেই থেকে স্ফিনিক্সের উৎপত্তি।

প্রাচীন মিশরের রাজধানী আজ শুধু নামেই বজায় আছে। তার ভগ্নস্তূপ থেকে অতীতের মূর্তিকে টেনে বের করা সহজসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু পিরামিডের গায়ে খোদাই করা কারুকার্য এবং মৃত সম্রাটের জামা-কাপড় ইত্যাদি থেকে সেকালের জীবনের একটা আভাষ পাওয়া যায়। এই সময়ে বহু দেব-দেবীর পূজো করা হতো। এদের মধ্যে আনুবিস, হাটটার, ঈসিস ও আসিরিসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্যদেবতা। তাঁর নাম ছিল রে। সবার বিশ্বাস ছিলো যে রে পূবে আকাশে উঠতেন, পশ্চিম আকাশে অস্ত যেতেন। কিন্তু আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অতিক্রম করার জন্যে তিনি বাহনের ব্যবহার করতেন। নৌকো ছিলো তাঁর বাহন। তাই সেকালের প্রাচীরে এই নৌকোর প্রতীক দেখা যায়।

* * *

পিরামিডের যুগ আরম্ভ হলো—ফারাও সম্রাটদের যবনিকা পতন হলো খৃষ্টজন্ম পাঁচশো বছর আগে। এর কিছুদিন পর খৃষ্টজন্মের তিনশো বছর আগে—দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দার এলেন মিশরে। তার নামাকরণে

রাজধানীর নাম হলো আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া হলো গ্রীক্ সাম্রাজ্যের রাজধানী। তারপর এলেন ক্লিওপেট্রা, মার্ক এন্টনির যুগ—রোমান সভ্যতা এসে মিশরের বুকে আস্তানা গাড়লো। কিন্তু ইসলামের তরবারির আঘাতে সেই সভ্যতাও একদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়লো মিশরে। কত খলিফা এলেন—গেলেন। এলেন, উমাইদ, আব্বাসইদ এবং ফতেমাইদ সম্রাটরা। এলেন মেমলুক—এলেন তুর্কীর বাসিন্দারা।

হঠাৎ একদিন ঝড়ের মতো সৈন্যবাহিনী নিয়ে এলেন নাঁপোলিও।

জুলাই মাসের পয়লা তারিখ—১৭৯৮। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরের সামনে তিনশো জাহাজ এসে নোঙর গাড়লো। মিশরের চতুর্দিকে আতঙ্কের রব উঠলো। নাঁপোলিও এসেছেন মিশর আক্রমণ করতে। মতলব আর কিছু নয়। ইংরেজের ভারতে যাবার পথ বন্ধ করতে হবে।

মিশর আক্রমণ করা নাঁপোলিওর বহুদিনের পরিকল্পনা ছিলো। শুধু সৈন্য-সামন্ত নয়—তার সঙ্গে অনেক গুণী পন্ডিতও নিয়ে এসেছিলেন। মিশর বাসীদের নাঁপোলিও বললেন যে, ইসলাম ধর্মে তাঁর পুরো বিশ্বাস আছে। সে হলো যুদ্ধের ভগবান এবং বিজয়ের ভগবান।

কিন্তু মিশরে নাঁপোলিও বেশীদিন থাকতে পারেন নি। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন যে, নেলসন তার নৌবাহিনীকে ধ্বংস করেছে। তাই তাঁকে ফিরতে হলো।

এবার তুর্কী সম্রাট সুলতান সেলিম মিশর দখল করতে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। এই সৈন্যবাহিনীর এক অখ্যাতনামা সৈনিক মুহম্মদ আলী একদিন সমস্ত মিশর তার হাতের মুঠোয় করলেন।

মুহম্মদ আলী যে মিশরের হর্তাকর্তা বিধাতা হবেন এ কিন্তু কেউ কখনও কল্পনা করেনি। কিইবা তার পরিচয়, কেবা তাকে চেনে। অল্প বয়সে তার বাবা মারা গেলেন—প্রাদেশিক গভর্ণরের অধীনে ট্যাক্স কলেক্টরের কাজ নিলেন মুহম্মদ আলী। প্রজাদের কাছ থেকে পয়সা উসুল করতে তিনি ভারী পটু ছিলেন। যারা ট্যাকসো দিতে গড়িমসি করতেন তাদের মসজিদের ভেতর পেটাতেন। ট্যাকসো দিলে এরা ছাড়া পেতো।

নিজের দক্ষতায় মুহম্মদ আলী মিশরের ক্ষমতা পেলেন। ফরাসীরা মিশর ছেড়ে চলে গেলো। তুর্কী সরকারের প্রতিনিধি হলেন খোবশেভ পাশা। তারই নেকনজরে পড়ে গেলেন মুহম্মদ আলী। ব্যস, আর কথা নেই। দ্রুতগতিতে মুহম্মদ আলীর ভাগ্য পরিবর্তন সুরু হলো। ক্রমে ক্রমে তিনি মিশরে তুর্ক সরকারের প্রতিনিধির পদ পেলেন।

চতুর চূড়ামণি মুহম্মদ আলী। শত্রুকে কী করে ধ্বংস করতে হয় তা তিনি জানতেন। তার সৈন্যবাহিনীর ভেতর কিছু মামলুক অফিসার ছিলো। তিনি

এবার এই মামলুকে অফিসার বাহিনীকে নির্মূল করার চেষ্টা করলেন। তাই একদিন এই অফিসার বাহিনীকে খানাপিনায় নেমতন্ন করলেন। উৎসবের উপলক্ষ আর কিছু নয়—ওহাবীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান হবে সেই উপলক্ষে একটু আনন্দ ফূর্তি করতে হবে। মামলুক অফিসারেরা বেশ সাজগোজ করে এই উৎসবে যোগ দিতে এলেন। বক্তৃতা হলো, গান হলো, নাচ হলো কিন্তু উৎসব শেষে যেই মামলুক অফিসারেরা বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন অমনি তাদের উপর হানা দিলেন মুহম্মদ আলী। প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরতে পারলে না—মিশরের বুক থেকে মামলুকেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

মুহম্মদ আলী শুধু ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন না—তিনি অত্যাচারীও ছিলেন। কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে যে, তার রাজত্বকালীন মিশরে বহু উন্নতি হয়। তিনি স্কুল-কলেজ, নতুন রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল তৈরী করেন।

কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বহু উন্নতি করা হলো। কিন্তু এই আমলে নাগরিকদের কোন স্বাধীনতা ছিলো না। মুহম্মদ আলী সমস্ত মিশরকে তার জমিদারী মনে করতেন। তিনি হিসেব করে দেখলেন যে, তুলোর চাষ করলে বিস্তর টাকা পাওয়া যায়। তাই তার হুকুমে অন্য জিনিষের চাষ বন্ধ হয়ে গেলো। তুলোর চাষ বাড়ানো হলো। আর তুলোর দাম ঠিক করতো লণ্ডনের তুলোর বাজার। ফল হলো যে, মিশরের অর্থনীতি গেলো ইংরেজের হাতে।

চাষের জন্য তিনি অনেক নালা-খাল-বিল বানিয়েছিলেন। কিন্তু এই কাজের জন্যে তিনি কাউকে এক পয়সাও দেননি। কেউ পয়সা চাইলে তার রক্ষে ছিলোনা।

লড়াই কম করেননি মুহম্মদ আলী। ওহাবীদের পরাজিত করেন এবং তার ছেলে ইব্রাহিম পাশা গিয়ে দামাস্কাস দখল করেন। এই লড়াইতে জয়লাভ করে মুহম্মদ আলী শুধু মাত্র মিশরের শাসনকর্তা হলেন না, জেরুজালেম, ত্রিপোলী, আলেপ্পো দামাস্কাস তাঁর অধীনে চলে এলো।

চল্লিশ বছর ধরে মুহম্মদ আলী মিশরের একছত্র অধিপতি ছিলেন। তাকে রুখবার কেউ ছিলো না। তিনি ইংরাজ-ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে মিশরকে নতুন করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। এ কাজে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

কিন্তু মুহম্মদ আলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিশরে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। এরপর যারা মিশরের সিংহাসনে বসলেন তারা সবাই প্রায় অকর্মণ্য।

মিশরের কর্তা তখন আহম্মদ আরবী। অবশ্য তার মনিব ছিল খেদিভ। তারই সময়কালীন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে ইংরেজের নৌবাহিনী এসে নোঙর গাড়লো।

দিনটা স্মরণীয়। নভেম্বর মাসের এগারো তারিখ, ১৮৮২ সাল। বন্দর ঘাটায় একটি আরব ছেলে আর একজন ইংরেজ প্রজার সঙ্গে কাড়ি খেলা নিয়ে তর্ক সুরু হলো। তর্ক থেকে হাতাহাতি। মজা দেখবার জন্যে দর্শকের অভাব নেই।

একটু বাদেই খুনোখুনি সুরু হয়ে গেলো।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে শহরের চতুর্দিকে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়লো। ইংরেজ প্রজাদের শহর থেকে সরানো হলো।

হাঙ্গামা মেটাবার জন্যে এবার মস্তোবড়ো ইংরেজ ফৌজ এলো মিশরে। কর্ণেল আরবীকে ইংরেজ কর্তারা বললেন আত্মসমর্পণ করতে। নইলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু কর্ণেল আরবী ইংরেজের কথায় কান দিলেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে লড়াইর আয়োজন করতে লাগলেন।

ইসমালিয়া সুয়েজ ক্যানেলে ঢুকবার একটি বন্দর। এই বন্দর নিয়ে এবার লড়াই সুরু হলো। কর্ণেল আরবী এইটে হাতের মুঠোয় রাখতে চান। ইংরেজ চায় ইসমালিয়া দখল করতে।

কিন্তু কর্ণেল আরবী তার হিসেবে দুটো ভুল করেছিলেন। প্রথমতঃ ব্রিটিশ ফৌজ যে ঝড়ের বেগে চলে আসবে এটা তিনি কল্পনা করেননি। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনান্দ দা লিসিপস তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ইংরেজ কখনই ক্যানেলের ভেতর ঢুকতে পারবেনা।

কর্ণেল আরবী এইখানে মস্তবড়ো ভুল করলেন। ক্যানেল রক্ষার কোন বন্দোবস্তই তিনি করেননি। পরিণামে ব্রিটিশ ফৌজ এসে ক্যানেল দখল করে বসলো। কর্ণেল আরবী মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে হুকুম দিলেন ক্যানেলের পথ বন্ধ করতে। কিন্তু কর্ণেল আরবীর আদেশ প্রচারিত হবার আগেই ইংরেজ ক্যানেল দখল করে বসেছে। এবার কর্ণেল আরবী ঠিক করলেন যে, ইংরেজের খাবার জল বন্ধ করে দিতে হবে। এই জল বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো তাল আল মাসুতো ক্যানেলকে বন্ধ করা। জল না পেলে ব্রিটিশ ফৌজ শুকিয়ে মরবে।

ফলে মিশরে সুরু হলো অরাজকতা। কিন্তু কিছুদিন বাদেই ইংরেজ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে এলো মিশরে তাদের আস্তানা গাড়তে। কী করে ইংরেজ তার জাল বিস্তার করলো সে কাহিনী না বললে মিশরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এবার ব্রিটিশ ফৌজ তেল এল কবীরের দিকে অগ্রসর হয়। এইখানে দুপক্ষে তুমুল লড়াই হলো। একদিন গভীর রাত্রে, পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণ সুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শেষ হয়ে গেলো। যুদ্ধে জয়লাভ করলেন ব্রিটিশ ফৌজ।

এবার মিশরের ঘাঁটিগুলো ইংরেজ সেনারা দখল করে নিলো। কর্ণেল আরবী কিন্তু পালাবার কোন চেষ্টা করেননি আত্মসমর্পণ করলেন।

বিচারের প্রহসন সুরু হলো এরপর। ইংরেজের রাজনীতির গতানুগতিক নিয়ম ইতিহাসের প্রাচীন প্রথা। কর্ণেল আরবীর মস্তোবড়ো শত্রু ছিলেন মিশরের খেদিভ। তিনি এই লড়াইর বিরোধী ছিলেন। তিনি কর্ণেল আরবীর

সাজা দাবী করলেন। ইংরেজের দরবারে বিচার সুরু হলো, লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার এলো কর্ণেল আরবীকে সমর্থন করতে। কিন্তু বিচারের রায়ের কী পরিণাম কারু অজানা ছিলোনা। প্রথমে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী সেই সাজা মকুব করলেন। সিংহলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো।

যখন তার মৃত্যুদন্ডের হুকুম হলো অমনি চতুর্দিক থেকে সহানুভূতি আসতে লাগলো। কোর্টের বিচারের পর কর্ণেল আরবী যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে। তাই তিনি নীরব নিস্তব্ধ। এমনি সময় এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা এসে তাঁর হাতে একটা লাল গোলাপ দিলেন। এমনি করে শত্রুদের হাত করতে হয়। এই হলো ইংরেজ কানুনের রীতি।

কর্ণেল আরবীর পতনের পর মিশরের হর্তাকর্তা-বিধাতা হলেন ইংরেজ। দেশের টাকা পয়সার হিসেব সবই থাকে ইংরেজের হাতের মুঠোয়। নামমাত্র দেশের শাসনকর্তা খেদিভ। কিন্তু তার পেছনে আছেন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি। তারই হুকুম মতো দেশ চলে। কিছুদিন বাদে মিশরের সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হলো। সুয়েজ ক্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ইংরেজ এক নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করলো

কিন্তু ইতিহাস তো চিরকাল একই ছন্দে বয়ে যায়না। মিশরের ইতিহাসও একদিন পালটে গেলো।

মিশরের কর্তা তখন ফারুক। তার পুরো ইতিহাস তো সবাই জানে না। দেশের ভিতর তখন বিস্তর অশান্তি। কিছুদিন আগে প্যালেস্টাইনের লড়াই হয়ে গেছে। যুদ্ধে মিশরের পরাজয় হয়েছে, অপমান-লাঞ্ছনার সীমা নেই।

প্যালেস্টাইনের লড়াই তখন পুরোদমে চলছে—চারদিকে গোলাগুলি চলছে। মিশরের সৈন্যবাহিনী পিছু হটছে। পেছু হটতে হটতে এক মিশরীয় সৈন্য দেখতে পেলো তার এক নিকট বন্ধু জখম হয়েছে।

বন্ধুর সাহায্যে গেলো সে। আহত বন্ধুটি বলে: জানো, আমার বাঁচবার আশা নেই। কিন্তু জীবনে আমি বড় ভুল করলাম!

কী ভুল—বন্ধু প্রশ্ন করে।

যন্ত্রণায় আহত বন্ধুটির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিলো না। কারণ মৃত্যু তাকে হাতছানি দিচ্ছে। কাতরকণ্ঠে বন্ধুর হাত ধরে বললেঃ গামেল আব্দেল নাসের, মিশরের ভাগ্য যদি পালটাতে চাও তবে জেনে রেখো প্যালেস্টাইনের রণক্ষেত্রে তোমার স্থান নয়। আজ আমাদের সংগ্রামের সবচাইতে বড়ো জায়গা হলো কায়রো এবং মিশর।

সেদিন নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে এই অখ্যাতনামা সৈনিক গামেল আব্দেল নাসের বন্ধুর উপদেশ শুনেছিলেন। বন্ধুর নির্দেশ তিনি ভুলে যাননি। কারণ এর কিছুদিন বাদেই তাকে দেখা গেল কায়রোতে এক সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে।

অখ্যাতনামা সৈনিক গামেল আব্দেল নাসের সম্রাট ফারুকের রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করলেন।

মিশরের বুকে এলো এক নতুন যুগ। এর পরবর্তী ইতিহাস আপনাদের অজানা নেই।

* * *

অতীতের মিশর আমাকে শুধু মুগ্ধ নয়—ক্লান্তও করেছিলো। তাই সামিরামি হোটেল ফিরে এলাম শুধু মাত্র দেহের ক্লান্তি মেটাবার জন্যে নয়—মানসিক অবসাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেও।

আমার কায়রো থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী গন্তব্যস্থল জেরুজালেম। সেখান থেকে নিজের মাতৃভূমি। বন্ধু প্যাট্রিক সীল এবার আমার কাছ থেকে বিদায় নিলো। বেরুটের মধুচক্র তাকে আকর্ষণ করছিলো। আমি জেরুজালেমে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তার অতীত এবং বর্তমানের ইতিহাস আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিলো। বহু প্রাচীন সভ্যতা এবং বর্তমানের রাজনীতিতে বিজড়িত হয়ে আছে জেরুজালেম নগরী। এ নগরী শুধু খৃষ্টধর্মের সভ্যতার কেন্দ্র নয়—এ হলো মানব সভ্যতার আদিম আবাস। তাই জেরুজালেম, বেথেলহাম এবং জরাসের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন দেখবার জন্যে আমার মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলো।

উপন্যাসের প্রারম্ভে থাকে ভূমিকা, যাত্রার আগে থাকে বহু আনুষঙ্গিক পর্ব। এ রীতি পালন না করলে যাত্রা অসম্ভব, ঘর থেকে বেরুবার যো নেই। প্রথমতঃ ভিসার প্রয়োজন, তারপর পরিচয়পত্র। এই সমস্যা নিয়ে যখন সামিরামির বারে চিন্তা করছি তখন কে জানি পেছন থেকে বললেঃ বোঁসোয়ার। নিখুঁত ফরাসী। একটু হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি আমার টেবিলের সামনে এক মধ্যমবয়সীয় ভদ্রলোক। আকৃতি দেখে বোঝাবার যো নেই কোন জাতীয়। টেবিলের সামনের একটা চেয়ার টেনে বললেনঃ বসতে পারি কী?

অনুমতির প্রয়োজন ছিলোনা। আমি জবাব দেবার আগেই উনি টেবিলে বসে পড়েছিলেন। এবার একটু হেসে বললেন: মাপ করবেন, বিরক্ত করলাম। কিন্তু উপায় ছিলোনা। দেখতে পাচ্ছেন তো চারদিকে লোকে গিস-গিস্ করছে। একটুও বসবার জায়গা ছিলোনা। তাই বাধ্য হয়ে এই টেবিলে বসতে হলো।

আমি চুপ করে থাকি। আমার মুখে থাকে মৃদু হাসি। এ হাসি থেকে বোঝবার যো নেই যে, আপত্তি করছি না অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু ভদ্রলোক আমার জবাবের প্রতীক্ষা করেন নি। নিজের মনেই বলতে থাকেনঃ আমার নাম লবো · ক্যাপ্টেন লবো। বাপ পর্তুগীজ, মা স্প্যানিশ, কিন্তু আমি ইংরেজের প্রজা। তাই কায়রোর সামিরামি হোটেলে বসে গল্প করার অধিকার পাচ্ছি।

এবার আমার পালা। বলিঃ আপনি কী করেন?

বেশ একটু জোরেই হেসে ওঠেন ক্যাপ্টেন লবো। বলেন : চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আপনি। চতুর্দিকে এই প্রশ্ন, কী করি? পুলিশ, কাস্টমস, হোটেলের কর্তৃপক্ষ, ম্যায় ট্যাকসী ড্রাইভারেরা জানতে চায় আমার পেশা কী? সবাইকে বলেছি, আমার কাজ হলো এয়ার কোম্পানীর…আমি পাইলট। কিন্তু আপনাকে সত্যি বলছি, আমার পেশা কী…কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয়টা একটু শুনেনি। আপনি নিশ্চয় বিদেশী। আরে মশায়, এই কায়রোর বাসিন্দাদের কাছে কী আর মন খুলে বলতে পারি? হয়তো বেফাঁস কিছু বলে বসবো, তারপর নাসেরের অতিথি হয়ে বাকী জীবনটা কাটাই। থাক, এবার আপনার পরিচয় দিন।

আমি ভারতীয়, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। সবাই আমাকে বিক্রমাদিত্য বলে ডাকে।

গুড লর্ডস, আপনি ইণ্ডিয়ান· কী আশ্চর্য এই তো সেদিন দিল্লী থেকে এলাম।

এবার বলুন আপনার পেশা কী? আমার কণ্ঠে ছিলো কৌতূহলের সুর। জানিনা কেন ভদ্রলোকের পেশা জানবার জন্যে ভারী আগ্রহ ছিলো।

কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে ক্যাপ্টেন লবো বললেন : সবাই জানে আমি পাইলট। কোম্পানীর নামটা নাইবা বললাম। পাইলটের কাজ হলো কভার। কিন্তু আপনাকে সত্যি করে বলছি, আমার আসল কাজ হলো স্মাগলিং। আমি হলাম স্মাগলার।

ক্যাপ্টেন লবোর কথা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমার হাতের হুইস্কীর গ্লাসটা নড়ে গেলো। বেশ খানিকটা হুইস্কী উপচে পড়ে গেলো। এই কাহিনী আমি স্মাগলারের জীবনী নিয়ে সুরু করেছিলাম। আমার কাহিনীর নায়ক ছিলো ভারতীয় স্মাগলার, এবার বিদেশী স্মাগলারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্মিত না হয়ে পারিনি

লবো বলতে থাকে : আমার কথা শুনে নিশ্চয় বিস্মিত হয়েছেন। যাকেই বলেছি যে, আমি স্মাগলার, সেই আমার কথাগুলোকে অবিশ্বাস করেছে। ভেবেছে আমি মদের নেশায় এই কথা বলেছি। মোটেই না, আমি বেশ বহাল তবিয়তে এই পরিচয় আপনাকে দিচ্ছি; ক্যাপ্টেন লবো··ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলার·। আমার চারটা পাশপোর্ট· ইংলিশ, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ এবং ফরাসী। আমার কাজের হেড কোয়ার্টার হলো হংকং-মাকাও।

এবার আমার অনুসন্ধিৎসা বাড়ে। জিজ্ঞেস করি : এখানে কী করছেন? স্মাগলিং?

কী যে বলেন, স্মাগলিং করার যো কী এখানে আছে? আপনাদের এই নাসের স্মাগলিং-এর বাজারটাই নষ্ট করে দিয়েছে। যদিও বা স্মাগল করে নারকোটিক্স বা কিছু নিয়ে এলেন টাকা নেবার যো নেই। আসলে এসেছিলাম

মার্কেট স্টাডি করতে।

এর মানে? আমি একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করি।

মানে অতি সহজ এবং সরল। ব্যবসা করতে হলে বাজার বাজিয়ে দেখতে হয়। কোন বাজারে কী চলে। কোন বাজারে চলে নারকোটিক্স, কোন বাজারে মেয়েমানুষ, কোন বাজারে চলে সোনা। কিন্তু গল্প সুরু করার আগে বলুন, আপনার জন্য কী অফার করতে পারি? অ্যানাদার গ্লাস অফ হুইস্কী…

থ্যাঙ্কস, দেখতেই পাচ্ছেন আমার ড্রিংকস্ এখনও শেষ হয়নি। আমার অর্ধসমাপ্ত গ্লাসটা দেখিয়ে বলি।

ইউ ডোন্ট মাইন্ড, যদি আমি হুইস্কীর অর্ডার দিই।

এই বলে ক্যাপ্টেন লবো ওয়েট্রেসকে ইশারা করলেন।

একটি মেয়ে ছুটে চলে এলো। কিন্তু দেখতে পেলাম যে, ক্যাপ্টেন লবো যেন একটু নিরাশ হয়েছেন। বললেন: মাদমাজোয়াল, আমি ভেবেছিলাম এই টেবিলের ওয়েট্রেস হলো ঐ মেয়েটি, যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টন লবো অন্য একটি মেয়েকে দেখিয়ে বলেন। আমি কাউন্টারের সামনে একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম, বারের স্তিমিত আলোয় বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। মেয়েদের বয়স যাচাই করা শিষ্টাচারে বারণ, তাই তার সৌন্দর্যের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই আপনাদের দিতে পারবো না।

ওয়েট্রেস জবাব দিলো: মেয়েটি অন্য টেবিল তত্ত্বাবধান করছে। আমরা টেবিল পাল্টেছি। বলুন, আপনার কী প্রয়োজন?

এবার হতাশ হয়ে ক্যাপ্টেন লবো বলেন: হুইস্কী-সোডা।

কিছু খাবেন? ওয়েট্রেস আবার প্রশ্ন করে।

না—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন লবো।

অর্ডার নিয়ে ওয়েট্রেস চলে গেলো। বলা বাহুল্য আমাদের ওয়েট্রেসের যৌবন বিগত, দেহ সৌন্দর্যও প্রায় বিলীন হয়ে এসেছে।

ক্যাপ্টেন লবো এবার বলেন, সমস্ত ড্রিংকসই মাটি হয়ে গেলো মশায়। এই কিছুক্ষণ আগে ঐ সুন্দরী মেয়েটি এই টেবিল সার্ভ করছিলো, যেই আমি এসে বসলাম অমনি এক বুড়ী এসে গেলো এই টেবিলে। কী আশ্চর্য বলুন তো! হোটেলের কর্তৃপক্ষ পরিবেশন কী করে করতে হয় জানেনা। এরকমটি কখনও পাবেন না হংকংএ।

আমি চুপ করে থাকি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দূরের মেয়েটি ক্যাপ্টেন লবোকে দেখেই টেবিল পাল্টেছে।

বুঝলেন স্যর, আজ তিনদিন ধরে ঐ মেয়েটির পেছনে ঘুরছি। কিন্তু দুত্তোর ছাই, কোন সুবিধেই করে উঠতে পারছিনে। ওর জন্যে আরো দুটো

দিন এই কায়রোতে রয়ে গেলাম। কি রকম মেয়ে দেখুন তো। একটু সাড়া দেবেনা। খালি এড়িয়ে যেতে চাইছে।

হয়তো আপনার রুচির সঙ্গে বনছে না। বিদেশীর সঙ্গে এরা মিশতে চায় না কিংবা হয়তো মেয়েটি ভদ্রঘরের …

আমার কথা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন লবো বেশ একটু জোরে হেসে ওঠেন। তার হাসির শব্দে বারের অনেকেই আমাদের দিকে তাকালো। লবো বললেন : কী বললেন বিক্রমাদিত্য, ভদ্রঘরের মেয়ে! আরে রামচন্দোর … এ হলো কল-গার্ল। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার ক্যাপ্টেন লবো মেয়ে দেখে চিনবে না যে মেয়ে ভদ্রঘরের মেয়ে, না কল-গার্ল! বহু দেশের, বহু ঘাটের জল খেয়েছি মশায়। মেয়ের চোখ দেখলে কী চরিত্রের বলে দেবো।

ক্যাপ্টেন লবোর বিশ্রী ইঙ্গিতে একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। ইতিমধ্যে লবোর হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে এলো ওয়েট্রেস। লবো তার হাত থেকে গ্লাসটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বললেন : ঐ মেয়েটিকে একটু ডাকবে?

কোন মেয়েটি? ওয়েট্রেস প্রশ্ন করে। তার প্রশ্নের ভেতর একটু রুক্ষতা ছিলো।

যে মেয়েটি তোমার আগে এই টেবিল সার্ভ করছিলো।

কোন বিশেষ মেয়েকে তলব করা এখানে বারণ। ওয়েট্রেস সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চলে যায়।

দেখলেন তো, আমাকে কীভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে? এই ক্যাপ্টেন লবোর হাতের মুঠোয় কতো মেয়েমানুষ আছে অথচ কিনা এক সামান্য মেয়ে আমার অনুরোধকে উপেক্ষা করছে। অনুরোধ মশায়, অনুরোধ. হুকুম নয়। হংকং মাকাওতে হলে ক্যাপ্টেন লবো কাউকে অনুরোধ করেনা, হুকুম দেয়। কায়রো বেরুট আমার গণ্ডীর বাইরে। তাই সব অপমানই সহ্য করতে হয়।

এখানে কীসের মার্কেট যাচাই করতে এসেছেন? বেশ বোকার মতোই আমি এ প্রশ্ন করি।

স্মাগলিং এর। কায়রোতে নয়, বেরুটে। কায়রো এসেছিলাম প্লেন ধরতে কিন্তু ঐ যে মেয়েটি দেখছেন ওর জন্যে আটকা পড়ে গেছি। কী যে করি বুঝতে পারছি না, মনের এমনি দুর্বলতা যে, এর হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না।

আমি এবার আলোচনার প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করি। জিজ্ঞেস করি : বেরুটের বাজার কী রকম দেখলেন?

বড্ডো নোংরা বাজার। একটু অসতর্ক হলেই আপনার গলা কাটা গেলো। বরং বলবো, হংকং-এর বাজার এর চাইতে ভাল। হংকং-এ গিয়েছেন কখনও?

আমি মাথা নাড়ি।

আসুন একবার। ক্যাপ্টেন লবো বললেন। এই আমার পরিচয়-পত্র রইলো। যে-কোন নাইট ক্লাবের রূপসীদের পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করুন ক্যাপ্টেন লবোর কথা, আমার ঠিকানা আপনাকে দেবে। ম্যাসাজ ক্লিনিক, ব্লু সিনেমা সব কিছুতেই আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু আজকাল যে কী রীতি হয়েছে! একটু বাজার যে জাঁকিয়ে বসবেন তার যো নেই। পয়সা যেই একটু বাজাতে লাগলেন অমনি কাগজওয়ালা আপনার নামে লিখতে সুরু করলো। বেরুট দেখলাম এ ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছে। নাইট ক্লাবের কর্তারা কাগজ-ওয়ালাদের বিস্তর পয়সার বিজ্ঞাপন দেন। বাস, কাগজের মুখ বন্ধ। এই তো কিছুদিন আগে আমার ক্লাবের মেয়েদের নিয়ে কতো হৈ হল্লা হয়ে গেলো। ওদের নাম ঠিকানা অবধি ছেপে দিলে কাগজের ব্যাটারা। মিস লোটাস, ১৪ নম্বর কামরা, সিটি হোটেল; মিস বিউটি, অমুক হাসপাতালের নার্স—বাস্ আরো কতো কী। বলুন তো মশায়, এরপর কী আর স্বস্তিতে ব্যবসা করা যায়! তাই ভাবলাম কয়েকটা দিন গা ঢাকা দেওয়া যাক। এলাম মিডল ইস্টে। এবার আপনাকে একটা অপ্রিয় প্রশ্ন করবো। কিছু মনে করবেন না তো?

আমি একটু হেসেই জবাব দিই: কী যে বলেন!

বলুন তো নেহরু সরকারের কী কাণ্ড!

আমি ক্যাপ্টেন লবোর প্রশ্ন শুনে একটু হকচকিয়ে যাই।

কারণ মেয়েমানুষ নাইট-ক্লাবের আলোচনা থেকে এই কথাপ্রসঙ্গ যে ভারত সরকারকে নিয়ে হবে এ ছিলো আমার কল্পনার অতীত।

কেন, কী হলো? আমি জিজ্ঞেস করি।

এই যে সোনার উপর আইন কানুন বসিয়েছেন এটা কী ন্যায় সঙ্গত হয়েছে শুনেছি, আপনাদের দেশের বিস্তর সোনার ব্যবসায়ীরা না খেয়ে মরছে আমরা যারা গোল্ড স্মাগলিং করতাম তাদের কী অবস্থা ভেবে দেখুন!

আপনাদের ব্যবসা নিশ্চয় বন্ধ হয়েছে…

বন্ধ হয়নি, তবে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। আইন কানুন এতো কড়াকড়ি যে, অতি সহজে আজকাল আপনাদের দেশের সঙ্গে ব্যবসা করা যায় না। বিস্তর দেশের সঙ্গে ব্যবসা করেছি কিন্তু আপনাদের দেশের সঙ্গে ব্যবসা করার কী যে ঝক্কি তা আর কী বলবো? আপনাদের চাহিদা হলো সোনা। ডবল দামে সোনা বিক্রী হলো। দিলেন ইন্ডিয়ান ক্যারেন্সী। তারপর সেই টাকা দিয়ে কিনলাম ওপিয়াম…। সেই মাল পাচার করলাম বেরুটে। দ্বিগুণ কি চার-গুণ দামে সেই আফিম বিক্রী হলো বেরুটের বাজারে। এই সব জিনিসের কদর কোথায় জানেন—হংকং এবং লাস ভেগাসে। গিয়েছেন কখনও লাস ভেগাসে। আরে মশায়, আজকাল ঐ তো হলো জুয়ো খেলার স্বর্গ। ছেলে-বুড়োর মধ্যে এই সব নারকোটিকস্ এতো চলেছে যে, একবার আপনাদের দেশ থেকে ঐ আফিম বের করে আনতে পারলেই হলো। পর্তুগীজদের হাতে যতদিন গোয়া

ছিলো কোন ভাবনা ছিলো না। মাল নিয়ে যেতাম পাঞ্জিমে। সেখান থেকে একেবারে আপনাদের দেশে। কিন্তু এখন তো আর সে যুগ নেই। আইনের কড়াকড়ি, পুলিশের ঝামেলা। বলুন তো, এরপর আর ব্যবসা করা যায় কী করে! তাই ভাবছি, এবার ব্যবসার পাততাড়ি গোটাব।

ক্যাপ্টেন লবো চুপ করলেন খানিকক্ষণের জন্যে।

এই সব কাহিনী জানবার আমার আরো আগ্রহ বাড়ে। তাই আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্যে প্রশ্ন করি: এই সব কাজ কী আপনি একাই করেন?

পাগল হয়েছেন! এই সব স্মাগলিং-এর কাজের জন্যে মস্তো বড় সিন্ডিকেট আছে। সিন্ডিকেটের কর্তা হলো বেশ বড়ো রুই, কাতলা। এর মধ্যে আরব শেখেরাও আছেন। আর আপনাকে সত্যি কথা বলবো···ভাবছেন আমি বুঝি এই সিন্ডিকেটের মালিক। পাগল হলেন··আমিও সামান্য কর্মচারী, তবে বড়ো কর্মচারী।

জানেন মশায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ছিলাম পাইলট। লড়াই শেষ হলে হংকং-এর এয়ার কোম্পানীতে কাজ নিলাম। ক্যাটালিনা প্লেন চালাই। তখনও বাজারে জেট প্লেন চালু হয়নি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরপ্রাচ্য মাল নিয়ে আসি। কী মাল জানেন, নারকোটিকস, কিংবা সোনা। একদিন কী কান্ড হলো জানেন? বছরটা আমার আজোও স্পষ্ট মনে আছে। চীনে সবেমাত্র মাও সেতুং-এর সরকার স্থাপিত হয়েছে। আমরা ডি. সি সিক্স প্লেন নিয়ে দমদম থেকে আফিম নিয়ে হংকং-এ যাচ্ছি। যেই বিমান ঘাঁটির কাছে এসেছি, বুঝলেন, একটা ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ফায়ার সিলিন্ডার শট করলাম। প্রথমটাতে কোন কাজ দিলো না। দ্বিতীয় সিলিন্ডারেও কোন উপকার হলো না। তিন ইঞ্জিনে তো বেশী উঁচুতে চলা যায় না। পেট্রোল কিছু ফেলে দিতে হলো কিন্তু তবু হাইট রাখতে পারছিলাম না। হংকং-এর সামনে পাহাড়। তাই এবার আফিম-এর দু-একটা বাক্স ফেলে দিতে হলো। কিন্তু হাইট পেলেও লাভ নেই কারণ প্লেনের ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে। কাজেই ডাঙ্গার কাছে এসে সমুদ্রে বেলী-ল্যান্ডিং করলাম।

সামনেই ডাঙ্গা। ভাবছি কি করি। কিন্তু কিছু ভাববার আগেই চীনে পুলিশ মোটর লঞ্চ নিয়ে হাজির। বুঝতে তাদের অসুবিধে হয়নি যে, আফিমের চোরাকারবার করছিলাম। তখন চীনে সবেমাত্র আফিমের ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছে। চোরাকারবারীর অভিযোগে আমাদের গ্রেপ্তার করা হলো।

পাক্কা দুটো বছর পিকিং-এর জেলে ঘানি টানলাম। তারপর মুক্তি পেয়ে এলাম হংকং। সেইখানে হঠাৎএকদিন কে ফোরটিন দলের সঙ্গে মোলাকাত হলো।

ক্যাপ্টেন লবোর কথা শেষ হবার আগেই আমি প্রশ্ন করি: কে ফোরটিন, সে আবার কী?

সিন্ডিকেটের ছদ্ম নাম। কে ফোরটিন মানে হলো চোদ্দ ক্যারাটের দল!
যাক গে, এবার শুনুন আমার কথা।

একদিন মাকাওর সেন্ট্রাল হোটেলে বসে মদ খাচ্ছি, এমন সময় কে ফোরটিন দলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেলো এই যে সেণ্ট্রাল হোটেলের কথা বললাম, আসলে এটা হোটেল নয়, এ হলো মাকাওর সবচাইতে বড়ো দালান—আর জুয়ো এবং মেয়েমানুষের সরাই। এর বিশেষত্ব কোথায় জানেন? নয় তালার দালান সেণ্ট্রাল হোটেল। নিচের তালায় জুয়ো খেলতে যান তো সস্তাদরের মদ এবং মেয়েমানুষ পাবেন। দোতালায় আর একটু দামী মাল পাওয়া যাবে। এমনি করে যতোই উপরে যাবেন ততোই ভালো মদ আর মেয়েমানুষ পাবেন। সবচাইতে সুন্দরী মেয়ের খোঁজ যদি করেন তবে ছ'তলায় যান— বিস্তর পাবেন। সেই সঙ্গে আছে 'হি লো' জুয়ো খেলা।

ভাবছেন 'হি লো' কী ধরণের জুয়ো। মস্তো বড়ো টেবিল। এর সামনে দু-তিনজন মেয়ে বসে আছে। একজনের হাতে পাশার ঘুঁটি। একটা বন্ধ করা বাক্সর ভেতর ঘুঁটি রাখা হয়। এই ঘুঁটি দিয়ে 'হি-লো খেলা হয়। আপনি যে-কোন সংখ্যার উপর বাজী রাখতে পারেন এই যে 'হি-লো' খেলার কথা বললাম, প্রতিবার ঘুঁটি টেবিলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি একটি ঘন্টা বাজায়। সমস্ত দালানে এই ঘন্টার শব্দ শুনতে পাবেন। নীচের তলার লোকেরাও এই ঘণ্টা শুনে খেলতে আরম্ভ করে। এই ছয় তলার সঙ্গে তাল রেখে সমস্ত সেণ্ট্রাল হোটেলে জুয়ো খেলা চলে।

ভাবছিলাম 'হি লো' খেলবো কি না, এমন সময় একটি মেয়ে এসে আমার টেবিলে বসলো। বললে: বাই মী এ ড্রিঙ্ক। খেলা হলো না।

কিনলাম হুইস্কী। মাকোও এবং হংকং-এর মেয়েরা ভারী লক্ষ্মী। আপনার কাছ থেকে হুইস্কী চাইবে, স্যাম্পাইন চাইবে না। মেয়েটির নাম ধরুন লোটাস। শুধু নামে নয় বিক্রমাদিত্য, দেখতেও। এদের এই অঞ্চলে বলা হয় হোস্টেস। এই সব হোস্টেসদের আয়ের দশভাগ সেন্ট্রাল হোটেলের কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়।

যাক গে, লোটাসের সঙ্গে গল্প সুরু করলাম। আলাপচারীতে জানতে পারলাম যে, মেয়েটি বিধাহিতা কিন্তু ডিভোর্সড।

আমি লড়াইর সময় জ্যোতিষী করতাম। মেয়েটির হাত দেখে বললাম, তুমি বিবাহিতা।

হেসে ফেললো লোটাস। বললে: কী করে জানলে?

আমি জ্যোতিষী। লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারি।

বেশ, আর কিছু বলতে পারো? লোটাস জিজ্ঞেস করে।

তোমার সম্মুখে মস্তো বড়ো বিপদ দেখতে পাচ্ছি। বাই দি ওয়ে…

হকচকিয়ে যায় লোটাস। কণ্ঠস্বর নীচু করে বলে: অতো জোরে

চীৎকার করোনা, সত্যিই আমার সম্মুখে বিপদ। কারণ আমি কে ফোরটিনের মেয়ে।

কে ফোরটিন! বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করি।

মাকাওতে থেকে তুমি কে ফোরটিনের নাম শোননি? আশ্চর্য হয়ে লোটাস জবাব দিলে।

না, আমি হংকং-এ থাকি—জবাব দিলাম।

তাহলে তো কে ফোরটিনের কথা আরো ভালো করে জানা উচিত। কারণ কে ফোরটিনের আড্ডাখানা হলো হংকং-এ। কম্যুনিস্টরা চীনে ক্ষমতা পাবার আগে এর আড্ডা ছিলো ক্যান্টন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম হলো জেনারেল কট সুইওং। ১৯৫০-এ তাকে হংকং থেকে ফরমোসাতে বহিষ্কৃত করা হলো। কিন্তু কট্ সুইওং ধুরন্ধর। ছদ্মবেশে এবং বেনামীতে তিনি হংকং-এ ফিরে এলেন। সেই থেকে হংকং-এ কে ফোরটিনের কাজ সুরু হলো। আমি ওদেরই মেয়ে। লোক ভোলানো আমার পেশা। আজকে আমার ডিউটি হলো তোমাকে পাকড়াও করা।

এবার খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে থাকে ক্যাপ্টেন লবো। তারপর আবার বলতে থাকেন: বুঝলেন বিক্রমাদিত্য, আমি হ'লাম শয়তানের রাজা। লোটাসের কথায় একটুও ভয় পেলম না। বরং স্পষ্ট সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলাম: বেশ, চলো তোমাদের দলের কর্তার সংগে গিয়ে আলাপ করি।

আমার কথা শুনে লোটাস যেন একটু ভয় পেয়ে যায়। একটু শঙ্কিত হয়ে বলে: কী বলছো তুমি! ঐ দলের খপ্পরে পড়ে আজ অবধি কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু বিক্রমাদিত্য, আমি তখন বেকার· একটা দুঃসাহসিকের কাজ খুঁজছিলাম। বুঝলাম, এই কে ফোরটিনের সংগে হাত মেলালে আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে।

লোটাস আমাকে তার দলের নেতাব সংগে পরিচয় করিয়ে দিলো।

মস্তো বড়ো দল এই কে ফোরটিন। এর প্রায় পনেরো হাজার মেম্বর। নারকটিক্স, সোনা এবং মেয়েমানুষের ব্যবসায়ে এরা এক্সপার্ট। একবার যদি এই দলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেন তবে আপনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

কে ফোরটিন পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। বেআইনী ভাবে মাল পাচার করে। আপনি নিশ্চয় কলকাতার বাসিন্দা। তবে শুনুন, একবার কলকাতায় জাহাজে করে সোনা পাচার করেছিলাম। সোনা ক্যাবিনে চমৎকার করে ঢাকা ছিলো। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধেও তো লোক আছে। কে জানি কলকাতার কাস্টমসকে অগ্রিম খবর দিলো। যেই জাহাজ গিয়ে গঙ্গায় হাজির হলো পুলিশ এসে জাহাজ পাকড়াও করলো। জাহাজ কোম্পানীকে এজন্যে বেশ মোটা টাকা দণ্ড দিতে হলো।

কিন্তু যাক, এবার আমার কথা বলি শুনুন, আমার কর্মদক্ষতায় অতি অল্প-

এরা কী শুধু নাসর আর মিশরকে গালমন্দ করে ? আর কিছু বলো না···। আমি জিজ্ঞেস করি।

এবার মেয়েটি একটু জোরে হাসে। বলে : এই যে খদ্দের দেখছেন, এই যারা বসে হুইস্কী গিলছে, কফি খাচ্ছে—এরা বিচিত্র মানুষ। ভাবছেন এরা বুঝি সবাই ব্যবসায়ী বা গণ্যমান্য অতিথি। না, এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন লবো প্রচুর আছে। দূর দূরান্তর থেকে এরা এসেছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর লোক। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন—একটু নির্জনতা দেখলে, খানিকের অবকাশ পেলে এরা আমাদের কাছে এসে প্রেম নিবেদন করে। শুধু ক্যাপ্টেন লবো নন—আরো বহুজন আছেন যাদের চরিত্র, উদ্দেশ্য বাইরে থেকে বুঝবার যো নেই। কিন্তু আমাদের কাছে পেলে এরা অন্য মূর্তি ধরে। এদের প্রেমের ভাষা, ভালোবাসার বুলি বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। এই ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রায়ই বলে, এদের সঙ্গে বেরুব কিনা, লাঞ্চ বা ডিনার খাবো কিনা।

মেয়েটি চুপ করে। আমি একটু নড়ে বড়ে বসি। আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়। কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করার আগেই মেয়েটি আমার টেবিল থেকে অন্যত্র চলে গেলো। তার আর এক খদ্দের এসেছে। তাকে পরিবেশন করতে হবে।

বেশ খানিকক্ষণ আবার আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে হলো। আপনমনে কী ভাবছিলাম আজ তা স্মরণ নেই। হঠাৎ মেয়েটি ফিরে এলো। বললে : একটানা বেশীক্ষণ কারু কাছে দাঁড়াতে পারিনে। আমাকে আরো কয়েকটি টেবিল দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, আজ কয়েকদিন হলো ক্যাপ্টেন লবো আর একটা বুড়ো লোক এমনি করে আমার পেছনে লেগেছে বলবার নয়। প্রতিদিন এসে এরা আমাকে জ্বালাতন করবে। একই কথা, চলো আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে। ক্যাপ্টেন লবো তো আমাকে হংকং-এ নিয়ে যাবেন বলেছেন ! বলে, ওখানে গেলে বড়ো চাকুরী পাবো। লোকটাকে আমার একদম পছন্দ হয় না। প্রতিদিনই ওকে এড়াবার জন্যে একটা না একটা কৈফিয়ৎ দিই। কিন্তু ওর তো নিরাশ হবার কোন লক্ষণই দেখছিনে। প্রায়ই এ দুটো লোক এসে আমার কাছে বিশ্রী ইঙ্গিত করবে। এদের অশ্লীল কথা শুনেও আমাদের চুপ থাকতে হয়। কারণ খদ্দেরকে তো আর চটাতে পারিনে।

বেশ খানিকক্ষণ মেয়েটি একটানা বলে গেছে। আমি কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি। তাই এবার বলি : সবাই কি তোমাদের কাছে প্রেম নিবেদন করে ?

এই প্রশ্নে মেয়েটি একটু হাসলো। তারপর বলল : সবাই নয়, বেশীর ভাগ, বিশেষ করে বুড়োর দল, যাদের দেখলে মনে কোন সন্দেহ জাগে না। এরাই বেশী প্রেম নিবেদন করে। এদের কাছে যেতে আমাদের কোন সঙ্কোচ নেই।

অথচ অল্পবয়সী, আপনার মতো কোন তরুণদের দেখলে আমাদের কুণ্ঠা হয়—মনে ভয় জাগে। ভাবছেন এইসব কথা বুঝি বানিয়ে বলছি। বিশ্বাস না হয়, তাকিয়ে দেখুন ঐ টেবিলের দিকে। বুড়ো ভদ্রলোক কতোক্ষণ ধরে আমার জন্যে বসে আছেন। আমাকে দেখলেই নানা ইঙ্গিত করছেন।

তাকিয়ে দেখি একটু দূরে এক বুড়ো, বয়স অন্তত বছর ষাট হবে, এক গ্লাস হুইস্কী নিয়ে বসে আছে। দূর থেকে বোঝা গেলো না লোকটা কোন দেশের। আমাকে ছেড়ে মেয়েটি এবার সেই বুড়ো খদ্দেরের কাছে গেলো।

*　　　*　　　*

আমার নাম রুকশানা…।

মেয়েলি কণ্ঠস্বরে কে জানি আমাকে এই কয়েকটি কথা বললো। আমি আপন মনে কতো রূপকথা, কতো অলৌকিক কাহিনীর কথা ভাবছিলাম ; কিন্তু এক সঙ্গীতের রেশ এসে যেন আমার চিন্তাধারাকে ছিন্ন করে দিলো।

তাকিয়ে দেখি মেয়েটি আমার টেবিলের কাছে ফিরে এসেছে। তার সুমধুর কণ্ঠস্বর আমাকে আবার সজাগ করে তুললো।

আমার নাম রুকশানা—এবার তার কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট এবং সুমধুর বলে মনে হলো।

আমার নাম বিক্রমাদিত্য—সাহিত্যিক—সাংবাদিক এবং ভবঘুরে। বলতে পারো আমি হলাম বেদুইন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াই সংবাদের লোভে—মানুষের সন্ধানে। মানুষ নিয়ে—তার জীবন ধারা নিয়ে লেখা আমার পেশা। এসেছি আরব বেদুইনের দেশে, মরুভূমির প্রান্তর দেখতে এবং জানতে।

এখানে এসে কী দেখলেন ? রুকশানা আমাকে সলজ্জ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

দেখতে পেলাম, এই বালির দেশে জীবনের ফল্গুধারা বয়ে যায়। এখানে শুধু প্রকৃতির কঠোরতা নয়—তার সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতাও আছে।

কোথায় এই সৌন্দর্য দেখলেন ?—রুকশানা চট্ করে জিজ্ঞেস করলো।

কেন, দেখতে তো পাচ্ছি নিজের চোখের সামনে—।

আমার ইঙ্গিত বুঝতে রুকশানার অসুবিধে হয় না। আমার কথা শুনে লজ্জায় তার মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। তারপর বলে ঃ আপনার এই প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ বিক্রমাদিত্য। অল্পবসী কেউ যখন আমাদের কাছে মিষ্টি কথা বলে, তখন ভারী ভালো লাগে কিন্তু বুড়োদের প্রেমের কথা শুনে কোন আনন্দ পাইনে। ওদের কথাগুলো শুনলে মনে হয় ওরা ভাঁড়ামি বা ন্যাকামি করছে। ঐ যে বুড়ো লোকটি বসে আছে, সে কী বলেছিলো জানেন ? আজ বার বন্ধ হবার পর ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি কিনা ?

আর ক্যাপ্টেন লবো কী বলে গেলেন ?—জিজ্ঞেস করি। আমার কণ্ঠে ছিলো একটু ঠাট্টার সুর। হয়তো আমার কথার রেশ তার কান এড়ায়নি। বললে ঃ ক্যাপ্টেন লবো আমার সঙ্গে কোন কথা বলার সুযোগ পাননি বিক্রমাদিত্য।

দিনের ভেতর আমি কে ফোরটিনের একজন হোমড়া-চোমড়া মেম্বর হলাম।

আমার জীবিকার আভাষ আপনাকে দিয়েছি। জানি হয়তো আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন। কিন্তু যা আপনাকে বলেছি সবই সত্যি··· যদিও আজকাল আর কে ফোর্টিনের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। প্রাণের ভয়ে দল তো আর ছাড়তে পারিনে। কিন্তু আজকে আমার সমস্যা কে ফোরটিন নয় ··দ্যাট্ গার্ল, দ্যাট্ বিউটিফুল গার্ল।

আমি কী জানি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম ক্যাপ্টেন লবো একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অর্ধসমাপ্ত হুইস্কীর গ্লাসটা রেখে বললেন ঃ বিক্রমাদিত্য, এখানে বসে আর গল্প করা যাবে না। একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ইন্টারপোলের লোক। হয়তো আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। না, পুলিশের হাঙ্গামায় কায়রোতে আর থাকা যাবে না! এভাবে আর দিন কাটানো যায় না। যেদিন থেকে হংকং ত্যাগ করে এই অঞ্চলে এসেছি সেইদিন থেকে ইনন্টারপোলের লোক আমার পেছনে লেগেছে। অসম্ভব! এই দুনিয়ায় আর চলাফেরা করা অসম্ভব! এই হোটেলের বারে বসে থাকা যাবে না। শুনুন যদি কখনও হংকং-এ আসেন একবার আমার আস্তানায় আসবেন। মিস লোটাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো···

কথা শেষ না করেই ক্যাপ্টেন লবো টেবিল থেকে উঠে গেলেন। তার মদের গ্লাসটি টেবিলে পড়ে রইলো।

আমি একটু স্তম্ভিত হয়েই নিজের টেবিলে বসে রইলাম। ভাবলাম কী আশ্চর্য লোকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার পরিচয় হয়ে গেলো। তার সঙ্গে সেদিন যদি আলাপ-পরিচয় না হতো তাহলে আজ কী আর এই সব কাহিনী লিখতে পারতাম।

*　　　　*　　　　*

আপনি কী ক্যাপ্টেন লবোর বন্ধু—মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন আমাকে প্রশ্ন করলো।

ক্যাপ্টেন লবো চলে যাবার পর হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে আমি আপন মনে বসেছিলাম। বেশ খানিকক্ষণ অন্য কোনদিকে তাকাইনি, কিন্তু এবার মেয়েলি কণ্ঠস্বর আমাকে সজাগ করলে।

ক্যাপ্টেন লবো! আমি একটু বিস্মিত হয়ে জবাব দিই। শুধু জবাব দিই নয়—তাকিয়ে দেখি, আমাকে কে এই প্রশ্ন করছে।

দেখতে পেলাম সেই সুন্দরী মেয়েটি যার সন্ধানে ক্যাপ্টেন লবো আমার টেবিলে এসে বসেছিলো। ক্যাপ্টেন লবো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এসে আমার টেবিলের কাছে দাঁড়ালো।

আমার হুইস্কী শেষ হয়ে এসেছিলো। মেয়েটিকে ডেকে বললাম, ক্যান আই হ্যাভ অ্যানাদার ড্রিংক?

নিশ্চয়। মেয়েটি একটু বাদে আর একটি হুইস্কী নিয়ে এলো। তারপর মৃদু কণ্ঠ বললে, আপনি ক্যাপ্টেন লবোর বন্ধু···

না, তার সঙ্গে আজ এইখানেই আমার পরিচয়। আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দেবার চেষ্টা করি।

শুনে খুশী হলাম। আজ ক'দিন হলো লোকটা এমনিভাবে জোঁকের মতো আমার পেছনে লেগেছে যে কী করবো ভেবে পাচ্ছিনে। আজ যেই দেখলাম আপনার টেবিলে এসে বসেছে, আমার এক বান্ধবীকে সার্ভ করতে পাঠিয়ে দিলাম। মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছি বলে। কিন্তু না করে উপায় ছিলো না।

তারপর হঠাৎ মেয়েটি প্রশ্ন করে, আপনি ভারতীয় ?

তোমার অনুমান মিথ্যে নয়—আমি একটু সংক্ষিপ্ত জবাবই দিই।

কারানজিয়াকে চেনেন ?

কোন কারানজিয়া ? আমি প্রশ্ন করি।

কারানজিয়া, এই যা জানি। এই কিছুদিন আগে আমাদের দেশের নেতা গামেল আব্দেল নাসেরের সঙ্গে মোলাকাৎ করে গেলেন। কাগজে সেই খবরটা বেরিয়েছিলো। তাই আপনাকে কারানজিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম ··

এবার আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, মেয়েটি ব্লিৎস পত্রিকার সম্পাদক রুসী কারানজিয়ার কথা বলছে। কারণ সম্প্রতি কারানজিয়া কায়রোতে এসেছিলেন। এবার আমি জবাব দিই, বলি, কারানজিয়া নাসেরের ভক্ত।

শুধু কারানজিয়া নয়, আমি শুনেছি ভারতবর্ষের অনেকেই নাসেরের ভক্ত, তাই নয়কী ?

এমনি মিষ্টিভাবে মেয়েটি প্রশ্ন করলে যে, তার কণ্ঠের সুর এবং হৃদ্যতা আমাকে আকৃষ্ট করলো। ভাবলাম মেয়েটির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করা যাক।

মেয়েটি বলতে থাকে, গামেল আব্দেল নাসের আজ এক নতুন মিশর গড়ে তুলছেন। কিন্তু বিদেশীরা নাসেরের বিরোধী, তারা চায়না নাসের তাঁর কাজে সফল হোক।

কী করে জানলে যে বিদেশীরা নাসরের বিরোধী ?—ইচ্ছে করেই আমি এ প্রশ্ন করি। ভাবি মেয়েটি কী জবাব দেয়।

মেয়েটি আমার কথা শুনে একটু হাসলো। তারপর বললে, এই হোটেলের বারে প্রতিদিন কতো বিদেশী আসে। তাদের মুখে তো নাসেরের গালমন্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনে। ওরা এ দেশেরই জলভাত খাচ্ছে আর আমাদের নেতারই নিন্দে করছে। এদের কাছে মিশরের সবকিছু খারাপ। মিশরের কিছুই এরা সহ্য করতে পারে না।

দেখেছি যে অতীত নিয়ে বিচার করে, চিন্তা করে লাভ নেই।

সান্ত্বনা দিই রুকশানাকে। বলি সংসারে ভালোমন্দর বিচার করে লাভ নেই রুকশানা। মানুষের উপরই নির্ভর করে ভালোমন্দ। এই যে সমাজ দেখছো, এই সমাজ মানুষকে ভালো করে আবার খারাপের পথে নিয়েও যায়।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি। রুকশানা এক মনে আমার কথাগুলো শুনছিলো। হয় তো আমার কথা তাকে আকৃষ্ট করেছিলো। তাই কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি বা প্রশ্ন করেনি।

আমি আবার বলতে থাকি—ভালোমন্দ হলো জীবনে অভিনয়। ভালোবাসার প্রহসন, কপটতার অভিনয় করো জীবনে তোমার সুনাম হবে। অভিনয় যদি না করতে পারো, তবে সংসারে তোমার দুর্নাম হবে। তাই ভালোমন্দর প্রশ্ন নিয়ে আমি বিচার করিনি। সবকিছুই হাসিমুখে মেনে নিই।

উপদেশ দেওয়া বাঙ্গালীর চিরন্তন অভ্যাস। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। নিজের বক্তৃতার ঢং দেখে বুঝতে পারি যে, আমি অকৃত্রিম বাঙ্গালী।

খানিকক্ষণ বাদে আবার বলতে থাকি: আমাদের মনের সংকীর্ণতা কতো গভীর জানো রুকশানা? পরাজয়কে আমরা কখনও হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারিনে। এই হলো আমাদের মনের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা।

এবার রুকশানা জবাব দিলো। এতোক্ষণ সে ছিলো নীরব শ্রোতা, এবার মৃদু হেসে আমার কথার জবাব দেয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, হাসলে রুকশানাকে ভারী সুন্দর দেখায়!

রুকশানা বললে: বিক্রমাদিত্য, তোমার কথা শুনতে আমার ভারী ভালো লাগছে! কথাগুলো শুনতে আমি একটুও ক্লান্তি বোধ করিনি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি ও আমার মতো উদাসীন। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনদিনই আমার চিন্তা হয়নি। ভালোমন্দর বিচার করিনি। আমার জীবনে অভিজ্ঞতাও কম হয়নি কিন্তু আমার সেই অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগেনি।

বড়ো হবো, এই ছিলো আমার সবচাইতে বড়ো আশা আকাঙ্ক্ষা। বড়ো হবার চেষ্টা যে করিনি এমন নয়। কিন্তু মেয়েদের জীবনে বড়ো হবার বাধা বিপত্তি অনেক। বড়ো হবার বাধা কোথায় জানো? প্রলোভন। যখনই কিছু করতে চাই তখনই প্রলোভন এসে বাধা দেয়। তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয়। জীবনে কী হতে চাইছি আর কী হচ্ছি। ভেবেছিলাম হবো স্টেনোগ্রাফার, দশটা পাঁচটা অফিস করবো। কিন্তু বাস্তব জীবনে কী হলাম—হোটেল-বারের ওয়েট্রেস। লিপস্টিক মেখে হাসিমুখে খদ্দেরদের খুশী করার চেষ্টা করি। এই ব্যর্থতাই হলো আমাদের জীবনের সবচাইতে বড়ো অভিনয়। জীবনের আসলটা ভুলে গিয়ে নকলটা শিখেছি।

বিক্রমাদিত্য, সুন্দরী নারী পুরুষের সবচাইতে বড়ো প্রলোভন। এই যে

আমার দেহের সৌন্দর্য দেখছো, এই তো আমার একমাত্র সম্বল, এই হলো আমার একমাত্র পুঁজি। বিক্রমাদিত্য, পুরুষ ভালোবাসতে চায় তার কারণ বাস্তব জীবনের হাত থেকে সে রেহাই পেতে চায়। আমরা নারী, ভালোবাসা আমাদের কাছে কৌতূহল। ভালোবেসে আমরা জীবনের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি। কিন্তু দুনিয়ার এই হলো নিয়ম, পুরুষ কখনই তার ক্লান্তিকে দূর করতে পারে না, নারীর জীবনের রহস্যের সমাধান হয় না। তাই জীবনে নারী পুরুষ উভয়েই হয় অসুখী।

জীবনে কাউকে কখনও ভালোবাসিনি বিক্রমাদিত্য। ভালোবেসে অনর্থ ঘটাতে চাইনি। কারণ আমার বড় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই যে বড়ো হবার আশা-আকাঙ্ক্ষা, এর ইন্ধন যুগিয়েছেন আমার মা। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই মনে হয় আমার জীবনের স্বপ্ন কী হবে, আকাঙ্ক্ষা কী সার্থক হবে?

সংসারের দায়িত্ব তো সহজ কথা নয়। বহু কষ্ট করে আমাকে সংসার টানতে হয়। বড়ো এক ভাই ছিলো, হঠাৎ একদিন মারা গেলো। অর্থ পুঁজি কিছুই রেখে যায় নি, কিন্তু বউ ছেলে মেয়ে সহ মস্তো বড়ো একটা পরিবার রেখে গেছে। আজ সমস্ত সংসার আমাকেই দেখতে হয়।

পয়সা রোজগারের সন্ধানে সদা সর্বদাই ঘুরি। আসে প্রলোভন। আমার বান্ধবীরা বহু উপায়ে পয়সা রোজগার করে। তাদের প্রাচুর্য দেখে লোভ হয়। আজ অবধি জীবনে যে অন্যায় করিনি এমন নয়। কিন্তু তবু সদা-সর্বদাই সতর্ক থাকি, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি।

রুকশানার কথায় বাধা দিই। মনে কৌতূহল হয়। রুকশানা ওয়েট্রেসের কাজ নিলো কেন? তাই প্রশ্ন করি: এই সামান্য ওয়েট্রেসের কাজ করো কেন? এই কাজে কোন সম্মান নেই, আছে শুধু গ্লানি। এমন কিছু কাজ করো যাতে প্রলোভন নেই।

আমার কথা শুনে রুকশানা হাসে। তারপর মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়: ভাবছো ওয়েট্রেসের কাজ করে পয়সা রোজগার করি। মোটেই তা নয়। আমার আসল রোজগার হলো খদ্দেরের টীপস্। এইখানেই তো সুন্দর মুখের জয়-জয়কার। তাই আমার সহকর্মীরা আমাকে হিংসে করে। আড়ালে যে নিন্দে করে না এমন নয়। বারের কাজটা আমার পাকাপোক্ত হয় নি। এখনও এই কাজে শিক্ষানবিশী করছি।

রুকশানা চুপ করলো। কী বলবো ভেবে পাইনে। আমি সময় কাটাবার জন্যে একটা সিগারেট ধরাই। আমার মনে হয়, আমার গল্পের রসদ ফুরিয়ে গেছে।

রুকশানা আমার কাছে কী চায়? বহুবার এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিলো। তার দেহের মাদকতা, সুমধুর কণ্ঠস্বর, আমার অনুসন্ধিৎসাকে

তাকে আমি আজ পর্যন্ত কোন আমল দিইনি এবং দেবো বলে মনে করিনা। বুড়ো লোকটাকেও সেই জবাবই দিয়েছি। রুকশানার এই জবাবে আমি একটু লজ্জা পাই। নিজেকে সংশোধন করে বলি : না, এমনি ঠাট্টা করে বলছিলাম। সিরিয়াসলি বলিনি।

এবার আমার টেবিলের আরো একটু কাছে এসে রুকশানা বলে : প্রতিদিন অনেকেই আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে। সবার কাছেই কী ধরা দিতে হয়!

ধরো আমি যদি তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলি—বেশ একটু সাহস নিয়েই আমি এ কথাগুলো বললাম।

আজ নয়, আজ আমি ক্লান্ত। রুকশানা আমাকে অপ্রত্যাশিত জবাব দিলো।

রুকশানার জবাবে আমি প্রথমটায় একটু বিস্মিত হলেও একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। তার চোখের চঞ্চলতা আমাকে একটু অস্থির করে তুলেছিলো, যা কোন ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

রুকশানা এবার একটু দূরে চলে গেলো। বললে : বারের ম্যানেজার এইদিকে আসছেন। এক খদ্দেরের কাছে বেশীক্ষণ থাকা নিষেধ। একটু বাদেই আমি ফিরে আসবো।

হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে আমি আবার চুপ-চাপ বসে থাকি। আবার চিন্তা শুরু হলো. এবার কিন্তু রাজনীতি নিয়ে নয়, রুকশানাকে নিয়ে।

আমি বিক্রমাদিত্য, মানব চরিত্রের জহুরী, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আমার পেশা। আজ বেদুইনের দেশে এসে হঠাৎ এক আরব নারীকে দেখে আমি কেন তার রূপে মুগ্ধ হলাম, এর জবাব লেখক বিক্রমাদিত্য কখনই দিতে পারবে না! সবাইকে দেখেই আমার জীবন তো উতলা হয় না, আজ রুকশানার সান্নিধ্য পাবার জন্যে এতো আগ্রহ কেন? লায়লাকে আমার ভালো লেগেছিলো কিন্তু তাকে তো নিজের মনে ধরে রাখিনি।

বাঙ্গালী ভাবুক—তাই প্রেমিক। ভেবে দেখুন, আপনার জীবনে আপনি কতোবার প্রেমে পড়েছেন। বইতে-উপন্যাসে কতো নায়ক নায়িকাকে ভালোবেসেছেন তার হিসেব আপনি নিশ্চয় রাখেন নি। শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়ে আপনি দেবদাস হবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন—কিংবা পার্বতী হবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। কিন্তু পারেন নি। তার প্রধান কারণ বাস্তব জীবন এবং উপন্যাস-রঙ্গমঞ্চের জীবন পৃথক।

অন্যের প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে আমি কতোজনকে উপদেশ দিয়েছি, ভালোমন্দ বলেছি কিন্তু আজ নিজেই যখন প্রেমের ফাঁদে পা দিলাম তখন এর কী কৈফিয়ৎ দিতে পারি!

এর কোন কৈফিয়ৎ নেই, সবার জীবনেই একদিন না একদিন প্রেমের সমস্যা এসে দাঁড়ায়। সেই মোহের হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আজ

আমিও সেই মোহে আটকে পড়েছি। কিন্তু এই মোহের হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাইনি। কারণ সেদিনকার প্রেম বা মোহ যাই বলুন আমার ভারী ভালো লেগেছিলো।

রুকশানা একটু বাদে ফিরে এলো। বললে : কাল বারোটার সময় আসবেন জু-গার্ডেনে। আবার দেখা পাবেন।

*　　　*　　　*

আমি হলাম কল-গার্ল, বিক্রমাদিত্য, আপনাদের দেশের ভাষায় এর কী নাম জানিনে কিন্তু এই অঞ্চলে সবাই জানে যে, আমি পয়সার বদলে প্রেম বিক্রী করি। তাইতো অতো প্রেমিক আসে প্রতিদিন আমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে।

পরের দিন ঠিক বারোটার সময় জু-গার্ডেনে বসে রুকশানা আমাকে এই কথাগুলো বলছিলো। প্রথম বেশ খানিক বিস্মিত হয়েছিলাম। এতো সহজ স্পষ্ট ভাষায় আত্মপরিচয় আজ অবধি কেউ আমাকে দেয়নি। এ পরিচয়ের ভেতর কোন গ্লানি বা কুণ্ঠা ছিলো না বরং গরিমা ছিলো। আমি হঠাৎ ভাবলাম রুকশানা আমাকে তার এই পরিচয় দিল কেন? ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, জানবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা হলো।

···আমি কল-গার্ল জেনে ও আমার সঙ্গে কথা বলতে নিশ্চয় কোন কুণ্ঠা হবে না বিক্রমাদিত্য·

এবার রুকশানা একটু জোরেই প্রশ্ন করলো।

না, বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আমি জবাব দিই। বরং বলতে পারো যতো সহজে তুমি নিজের পরিচয় দিয়েছ সেইটুকু জেনে খুশী হয়েছি। তোমাকে আরো ভালো করে জানবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে।

কেন, কল-গার্লের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবেন এই বলে ··রুকশানার কথার ভেতর একটু শ্লেষ ছিলো।

রুকশানার এই জবাবে আমি একটু বিরক্তি অনুভব করলাম। তাই একটু রুক্ষ স্বরে জবাব দিই : না, মেয়েমানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সময় এবং ধৈর্যের—দুটোরই আমার অভাব। আমি তোমার সরলতা দেখে আকৃষ্ট হয়েছি।

রাগ করলেন? রুকশানা আমার বিরক্তি বুঝতে পারে। তারপর বলে : জানেন বিক্রমাদিত্য, জীবনে তো কখনোই কল-গার্ল হতে চাইনি, কখনোই চাইনি এইভাবে জীবনের ভরণ-পোষণ করতে। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হলো আর কৈ? শৈশবে একটা রঙ্গীন নেশায় বেঁচেছিলাম। বড়ো হয়ে দেখলাম সবই স্বপ্ন। তারপর এলো যৌবন, আর সেই সঙ্গে এলো প্রলোভন। সেই প্রলোভনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছি। কতোবার সেই প্রলোভনকে এড়িয়ে গেছি! দু-একবার যে অন্যায় করিনি এমন নয়, কিন্তু পরে ভেবে

যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি।

রুকশানার সঙ্গে আমার ক্ষণিকের পরিচয়। তবু সে যেন আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিলো। আমার এই কাহিনীর পাঠক-পাঠিকার ভেতর কারু জীবনে যদি এই মনের দুর্বলতা এসে থাকে তাহলে তিনি আমার মনের কথা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং আমার প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। তাদের প্রতি এই কথা নিবেদন করে এইখানেই রুকশানার কাহিনীর ছেদ টানতে হলো।

* * *

না, ভুল বলেছি। রুকশানার কাহিনী শেষ হয়নি। কারণ কী সেই কারণ, সেইটে বলার জন্যে আমাকে এই কাহিনীর পুনরুত্থাপন করতে হলো।

বিকেল বেলা যথাসময়ে কায়রোর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছিলাম। বিভিন্ন প্লেনের তীব্র গর্জনে বিমান বন্দর মুখরিত। কায়রোর বিমান বন্দর মধ্যপ্রাচ্যের সবচাইতে বড়ো।

সেদিন কায়রো বিমান বন্দর থেকে বিদায় নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। রুকশানার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো আমার মনে কোন খেদ থাকতোনা। একবার ইচ্ছে হলো আরো কটাদিন এখানে থেকে যাই। কিন্তু আমি মুসাফির, বিনা-নুমতিতে এই অঞ্চলে আমার থাকা সম্ভব নয়।

এবার যাত্রার নির্দেশ শুনতে পেলাম। আমার প্লেনের দিকে এগিয়ে যাই। লোকে লোকারণ্য। যাত্রীর চাইতে দর্শকের সমাগমই বেশী। সবাই ব্যস্ত। প্লেনের গ্যাংওয়ের কাছে এসে যখন ছাড়পত্র দেখাচ্ছি, তখন পেছন থেকে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকলো—বিক্রমাদিত্য!

বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকাই। সুদূর এই কায়রো নগরীতে আমি কারও পরিচিত হতে পারি ভেবে পাইনে।

কণ্ঠস্বর মেয়েলি! তাই আমার বিস্ময় একটু বেশীই হয়েছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম, রুকশানার কণ্ঠস্বর। বেশ একটু আগ্রহ নিয়ে পেছনে তাকাই। কিন্তু কোথায় রুকশানা! এয়ার কোম্পানীর হোস্টেস আমার নাম ধরে ডাকছে।

আপনি বিক্রমাদিত্য? এয়ার হোস্টেস কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, আপনার কী প্রয়োজন? আমি প্রশ্ন না করে পারিনে।

আপনার নামে একখানা চিঠি আছে—এয়ার হোস্টেস বললে।

আমার চিঠি! প্লেনের গ্যাংগওয়েতে দাঁড়িয়ে কারু চিঠি পড়তে হবে এ ছিলো আমার কল্পনার অতীত। এয়ার হোস্টেসের হাত থেকে চিঠিটা নিলাম। কিন্তু সেই ভীড়ের ভেতর চিঠি পড়ার ধৈর্য বা উৎসাহ আমার ছিলো না। তাই চিঠি হাতে করে প্লেনের ভেতর এলাম।

সেদিন প্লেনে বহু যাত্রী ছিলো। জায়গা খুঁজে নিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়েছিল। একটু বাদে যাত্রার সতর্কবাণী জ্বলে উঠলো। ব্যস্ত হয়ে সিটে গিয়ে বসলাম।

মুহূর্তের মধ্যেই তীব্র গর্জন করে আমার প্লেন আকাশে উঠে গেলো। চিঠি-খানার কথা মনে পড়লো। পকেট থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে সুরু করি।

বিশ্রী মেয়েলি হাতের ইংরেজীতে লেখা পত্র। অসংখ্য বানান ভুল। ব্যাকরণের কোন বালাই নেই। বলা বাহুল্য এ চিঠির লেখিকা রুকশানা।

এই চিঠি পড়তে আমার হাত বা বুক কাঁপেনি এমন নয়। পড়বার আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা আমার যথেষ্ট হয়েছিলো।

কী লিখেছে রুকশানা—নিশ্চয় একথা জানবার আগ্রহ আপনাদের হচ্ছে। এই চিঠির বক্তব্য জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু চিঠির ভাষা আজ আমার সঠিক স্মরণ নেই—বক্তব্য মনে আছে। যেটুকু মনে আছে তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী এইখানে দিচ্ছি।

রুকশানা লিখেছে—বিক্রমাদিত্য, আমি কল-গার্ল। সমাজের কাছে সবার কাছে এইটেই আমার একমাত্র পরিচয়। সবাই বলে, আমার দেবার শক্তি আছে—পাবার ক্ষমতা নেই। কারণ আমি দেহ পসারিণী। আমার হৃদয় নেই—এই হলো জনশ্রুতি। কিন্তু বিক্রমাদিত্য, এ যে ভুল—শুধু ভুল নয়, মিথ্যে কথা। জীবনে আমি শুধু লোককে আনন্দ দিইনি—আনন্দ পাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ আমাকে কিছু দেয়নি—শুধু চেয়েছে আমার দেহ—হৃদয় নয়। কতোবার পণ করেছি যে, নিজেকে আর পরের কাছে বিক্রী করব না—তবু প্রলোভন সংবরণ করতে পারিনি। কতোবার এই প্রলোভনের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছি। সেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে যে, ভালো মন্দ নিয়ে বিচার করে লাভ নেই। সংসারে কী ভালো—কী খারাপ, এর পরীক্ষা করতে নেই। জানো বিক্রমাদিত্য, কতো ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ লোক এসে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে! যখনই তাদের কথা মনে হয় তখনই ভাবি মেয়েদের কাছে পুরুষ কতো দুর্বল! তাই সমাজের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। একদিন যাদের আমি শ্রদ্ধা করতাম—আজ তাদের করিনে।

ভাবছো এতো সব কথা বিস্তৃত করে লিখছি কেন? আমি সাহিত্যিক নই—গল্প বলা বা লেখা আমার পেশা নয়। আমি সামান্য নারী—পুরুষের প্রলোভন জগতের আকর্ষণ। আমি মায়া-মোহ। তাই আমি যখন ভালো-বাসার অভিনয় করি তখন আমার সেই অভিনয়ে তুমি বিস্মিত হয়ো না বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমাদিত্য, যখন তুমি আমার এই চিঠি পড়বে—তখন আমি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে কিছুদিন বাদে হয়তো তুমি আমাকে ভুলে যাবে—কিংবা ভুলবার চেষ্টা করবে! কিন্তু আমি তোমায় ভুলতে পারবো কী? হয়তো একদিন তোমাকে আমায় ভুলতে হবে. কারণ তুমি বিদেশী—সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারের মুসাফির। দিন কেটে বছর যাবে—সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্মৃতিও আমার কাছে বিলীন হয়ে আসবে। কিন্তু সহজে

আরো তীব্র করে তুলল। ইচ্ছে হলো রুকশানাকে আরো ভালো করে জানবার। কী করে আমার এই কৌতূহলকে মেটাতে পারি তাই বসে ভাবতে লাগলাম।

আমি যাযাবর, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াই। আমার ভবঘুরের জীবনে বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছি। তাদের ভালোবেসেছি, প্রেম করেছি, কিন্তু নারীর চরিত্র আজো আমার কাছে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে! নারী আমার কাছে রহস্যময়ী। রুকশানাও তাই।

সমাজের জীবন বহু আইন-কানুনে। বাঁধা। এই শৃঙ্খলার বাইরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই অপরিচিতা কোন নারীর সঙ্গে আলাপ করতে হলে সমাজের শৃঙ্খলাকে মেনে চলতে হয়। কিন্তু সেদিন কল-গার্ল রুকশানাকে কোন প্রশ্ন করতে আমার কোন সংকোচ হয়নি বা সমাজের রুচিতে বাধেনি।

একটু সাহস নিয়েই রুকশানাকে জিজ্ঞেস করিঃ একটা প্রশ্ন করতে পারি কী?

আমার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখে রুকশানা যেন একটু হকচকিয়ে যায়। হয়তো আমার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা বৈচিত্র্য ছিলো যা তাকে বিস্মিত করেছিলো। তাই কিছুটা সময় চুপ থেকে রুকশানা বললেঃ শুনি তোমার প্রশ্ন?

তুমি বিয়ে করবে রুকশানা?

আমার এই প্রশ্ন রুকশানাকে শুধু বিস্মিত নয় গম্ভীর করে তুললো। তারপর বললেঃ বিক্রমাদিত্য, তোমার প্রশ্ন অতি সহজ এবং সরল। কিন্তু অতো সহজে আমি তো তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারব না বিয়ে আজ অবধি করিনি তার কারণ বিয়ে আমার জীবনের সমস্যার সমাধান করবে না। বিয়ের প্রতি যে লোভ নেই এমন কথা বলবো না, কিন্তু জীবনের ফাঁদে আমি আটকা পড়তে চাইনে।

রুকশানার কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি। বলিঃ বিয়ে জীবনের সমস্যাকে বাড়ায় না, সমাধান করে।

হয়তো অন্যের জীবনে বিয়ে মানুষকে সুখী করে, কিন্তু আমার জীবনে বিয়ে অনর্থ আনবে বিক্রমাদিত্য।

আমি মেয়ে মহলের বক্তা নই তাই চট্ করে রুকশানার কথার জবাব দিতে পারিনি। বিশেষ করে এই ধরনের আলোচনায় আমি অপটু। তাই আমার কথার ভেতর জড়তা ছিলো। অতএব এ আলোচনা আর বাড়ালাম না। চুপ করে গেলাম।

সময় বয়ে গেল দ্রুত লয়ে। ক্রমে ক্রমে জু-গার্ডেনও নির্জন হয়ে এলো। রুকশানা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। উঠবার চেষ্টা করে।

জিজ্ঞেস করিঃ একটা কথা বলবো? রাখবে আমার একটা অনুরোধ?

শুনি তোমার অনুরোধ ? রুকশানা শিশু সুলভ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

তোমার অর্থের প্রয়োজন। আমি তোমায় টাকা দেবো। আমার টাকা নেবে ? আমি জিজ্ঞেস করি।

ভেবেছিলাম রুকশানা আমার কাছ থেকে টাকা নিতে সংকোচ বোধ করবে, কিন্তু আমার টাকা নিতে সেদিন তার কোন দ্বিধা হয়নি। বরং হেসেই জবাব দেয়ঃ নেবো তোমার টাকা। টাকা নিতে আমার কোন লজ্জা নেই কারণ আমার অর্থের প্রয়োজন। বরং মনের এই আনন্দ যে, এই টাকা রোজগার করতে আমায় কোন হীন উপায় অবলম্বন করতে হয়নি।

একটা দশ ইজিপ্সিয়ান পাউণ্ড বের করে রুকশানার হাতে দিলাম।

রুকশানা বলল ঃ এবার ওঠা যাক্। আমি বড় ক্লান্ত বিক্রমাদিত্য। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে এসেছি। বাড়ীর কাজকর্ম সবই পড়ে আছে। ফিরে গিয়ে সেগুলো করতে হবে। তারপর বিকেলে বারের ডিউটি।

আবার কখন তোমার দেখা পাবো ? আমার কণ্ঠে ছিলো অনুরোধের সুর।

চুপ করে থাকে রুকশানা। কোন জবাব দিলো না। তাই আমি আবার প্রশ্ন করি ঃ আজ বিকেলে বারে আসবে ?

আজ বিকেলে নয়। কাল সকাল দশটার সময় এই জু-গার্ডেনে এসো, দেখা হবে। কিন্তু তুমি আর কদিন কায়রোতে থাকবে বিক্রমাদিত্য ?

মাত্র কাল বিকেল অবধি। তারপর জেরুজালেম এবং সেখান থেকে দেশে ফিরবো।

আরো ক'টাদিন এখানে থাকোনা কেন ? রুকশানা আমাকে অনুরোধ করলো। এই প্রশ্ন শুনে আমি রুকশানার মুখের দিকে তাকাই। বলি ঃ এ সম্ভব নয় রুকশানা। আমাকে শিগ্‌গিরই দেশে ফিরতে হবে। দেশে ফিরবার —

বেশ, তাহলে এসো কাল সকালে। আবার দেখা হবে।

দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রুকশানা চলে গেল।

* * *

বলা বাহুল্য পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে জু-গার্ডেনে গেলাম। কিন্তু কোথায় রুকশানা ? সময় বয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনের অস্থিরতা বাড়তে লাগলো। কখন রুকশানা আসবে। কিন্তু রুকশানা এলো কি ? আমার মনের ভেতর বহু প্রশ্ন এসে জড়ো হলো। সব প্রশ্ন সব কৌতূহলের জবাব এখনও খুঁজে পাইনি। একবার ভাবলাম হয়তো রুকশানা কোন কাজে আটকে পড়েছে কিংবা তার কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক দেরী করে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। সেদিন রুকশানা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। অস্বীকার করবো না যে, রুকশানাকে দেখার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো আমার মনের এই দুর্বলতার কোন

বাঙালি পাঠকের চান নিটোল গল্প।

কারণ? শরিফ আহমেদ একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন।

কারণ, আমি ইতিহাস-রাজনীতি নিয়ে গল্প লিখি।

এই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে লিখুন না কিছু? বেশ উৎসাহী হয়ে শফিক আহমেদ বললেন।

একটা বড়ো উপন্যাস লিখতে সুরু করেছি, কিন্তু শেষ করতে পারছি কৈ? এই আরব বেদুইনের কাহিনী নিয়ে তো লেখা সহজ কথা নয়। এছাড়া রাজনীতি-ধর্ম আর।

আমার কথা শেষ হবার আগেই শফিক আহমেদ বলেন: আর কী?

বেলি ড্যান্সার, নাইট ক্লাব এবং গোল্ড স্মাগলিং-এর এনতার কাহিনী।

এইসব ব্যাপারে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে? এবার বেশ ভ্রাতৃ সুলভ কণ্ঠে শফিক আহেমদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

কিছুটা অভিজ্ঞতা কিছুটা পরের মুখে শোনা।

এবার শফিক আহেমেদ একটু গম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকেন: জানেন বিক্রমাদিত্য! এই যে মধ্যপ্রাচ্য দেখছেন এ হলো বিচিত্র এলাকা। এখানে শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, হারুণ-অল-রশিদের আরব্যোপন্যাস নয়, বর্তমানের বিস্ময় এইখানে দেখতে পাবেন। এই অঞ্চল শুধু মেয়ে-মানুষ এবং নাইট ক্লাব নিয়ে নয়, এ হলো আরব জাতীয়তাবাদের ঘাঁটি।

আমি মানুষের জহুরী। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, গল্পের আসর জমাতে শফিক দক্ষ। তাই একটু নড়ে-চড়ে বসি। ইতিমধ্যে এয়ার হোস্টেস এসে প্রশ্ন করে: কী খাবেন?

'হুইস্কী অনদি রকস' মিলবে কী? আমার অর্ডার নিয়ে এয়ার হোস্টেস চলে গেলো।

শফিক আহমেদ জিজ্ঞেস করেন: আপনি ক্রীশ্চান?

না, হিন্দু। তবে সর্বভুক এবং সব জিনিষেই আমার আসক্তি আছে।

আমি মুসলমান। তাই ড্রিংক করিনে। পান করা ধর্মের বারণ। যাক্, আপনাকে বলছিলাম মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনী। স্ট্রেঞ্জ ল্যান্ড! এখানে সবই পাবেন। তিনটি বড়ো ধর্মের উত্থান হয়েছে এই এলাকায়। তারপর রাজনীতি। জটিল রাজনীতি এ অঞ্চলের। এবং সর্বশেষে জীবন দর্শন।

জীবন দর্শন! আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের সুর।

হ্যাঁ, জীবন দর্শন। ওমর খৈয়াম পড়েছেন নিশ্চয়? আমাদের জীবনকে ভিত্তি করেই ওমর খৈয়াম তার কাব্য রচনা করেছেন। এবার আপনার কথা শোনা যাক্। কী দেখলেন এই অঞ্চলে?

ইতিমধ্যে হুইস্কী অন দি রক্স এলো। আমি গল্প জমাবার জন্যে একটু

নড়ে-চড়ে বসলাম। রুকশানার চিঠি পকেটে ভরে নিই। তারপর মৃদুকণ্ঠে জবাব দিই : এই অঞ্চলের সব দেখেছি বা জেনেছি, একথা কখনই বলবো না। মিডল ইস্টের সবজান্তা বা অথরিটি আমি হইনি। শুধু লোক দেখার জন্যে বা তাদের কাহিনী শোনার জন্যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শফিক আহমেদ আমার কথা শুনে মৃদু হাসেন। হয়তো আমার কথা তার বিশ্বাস হয় না। তারপর বলেন : বিক্রমাদিত্য, আপনি সাহিত্যিক হতে পারেন কিন্তু সাংবাদিক আপনি নন।

কেন? আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

কারণ, সাংবাদিকের পেশা তো লেখা নয়, প্রশ্ন করা, তর্ক করা। যাক্ বলুন এবার, এই যে মধ্যপ্রাচ্যের সৌন্দর্য বা রূপ, যাই বলুন—এ কী আপনাকে মুগ্ধ করেছে?

আমি একটু ইতস্তত করি। চট্ করে মুখে কোন জবাব আসে না। তাই বলি : আপনার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারলাম না।

শফিক আহমেদ এক ঝলক হেসে ওঠেন। বলেন : মধ্যপ্রাচ্যের আসল রূপ কী জানেন? তেল, মশায় তেল! এতো রূপ নয় এ যে রূপা! এই তেল নিয়েই মশায় এই অঞ্চলে যতো ঝঞ্ঝাট। গোটা অঞ্চল দেখছেন, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এ ছিলো মরুপ্রান্তর। তারপর একদিন এই বালির বুক থেকে বেরুলো কালো জল। আর সেদিন থেকে এই বালির দেশ হলো সোনার মরুভূমি। তেলের খনি এই অঞ্চলের অবগুণ্ঠন খুলে দিলে। আর মাটির বুক থেকে যেই তেল বেরুলো অমনি শকুনির কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেলো। জমি-জমা ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া সুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হলো বিবাদ-কলহ। বেশ ছিলাম মশায়, এই অঞ্চলে সুখে শান্তিতে। কোন হাঙ্গামা ছিলো না। দিন আনি, দিন খাই। কিন্তু তেল কোম্পানীর কর্তারা আর সুখে-শান্তিতে থাকতে দিলেন কৈ? তাদের তত্ত্বাবধানে, হুমকিতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেলো। আর তেল কোম্পানীর কাজ-কর্ম শুরু হলো তো, তৈরী হলো সামরিক বিমান ঘাঁটি। বিদেশ থেকে এলো বিস্তর সৈন্য-সামন্ত।

শফিক আহমেদ এবার এবার একটু চুপ করেন। তিনি কফি নিয়েছিলেন। কফির পেয়ালায় সামান্য চুমুক দিয়ে বললেন : বিক্রমাদিত্য, তিন নিয়ে এই মধ্যপ্রাচ্য···। তেল, সামরিক ঘাঁটি এবং ··। শফিক আহমেদের কথা শেষ হবার আগেই আমি তার কথায় বাধা দিই। প্রশ্ন করি : তৃতীয় জিনিষটা কী?

শফিক আহমেদ কণ্ঠস্বর নিচু করে বলেন : ইসারাইল। জানেন মশায়, এই তেল হলো আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের রূপসী কন্যা—আরব সুন্দরী। এই সুন্দরীকে ঘিরে সামরিক ঘাঁটি এবং ইসরাইলের ব্যূহ রচনা করা হয়েছে। এই অঞ্চলে যতো হাঙ্গামা ঝগড়া বিবাদ দেখছেন, সবই হলো এই তেল নিয়ে। এই সব তেলের খনি হলো আরবদেশের, কিন্তু এর আসল মালিক হলো ইংরেজ, ফরাসী

তোমাকে আমি ভুলতে পারব না। কারণ তুমি ছাড়া জীবনে কেউ আমাকে নারীর বেদীতে বসায়নি—কেউ আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়নি। আগেই বলেছি সবার কাছে আমি হলাম কল-গার্ল।

তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ক্ষণিকের। কিন্তু তবু মনে হয়েছে এ যেন বহুদিনের বন্ধুত্ব! তাই আজ আমার মনে হয়, তোমার এই বন্ধুত্বকে কী আমি কোনদিন ভুলতে পারব? না, এ সম্ভব নয়।

তুমি পুরুষ বিক্রমাদিত্য, জগৎময় ঘুরে বেড়াবে। কান্না হাসির স্রোতে তোমার জীবন বয়ে যাবে। জীবনে কী পেলে—কী হারালে, হয়তো তার হিসেব নিকেষ করবে না। কিন্তু আমি সামান্য নারী—জীবনকে সহজে ভুলতে পারিনে।

বহুদিনের মনের পুঞ্জীভূত কথা আজ আমি লিখলাম। আমার হৃদয়ের এই কথা বলবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনোই বলবার অবকাশ পাইনি। আজ বলবার অবকাশ মিললো। তাই আমার কথার এই ঝর্ণাধারায় বিরক্তি অনুভব করো না। তোমাকে যা বলেছি সবই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। নারীর অভিজ্ঞতায় কৌতূহল আছে, পুরুষের অভিজ্ঞতায় থাকে জ্ঞান। আমার এই জীবন কাহিনী পড়ে যদি তোমার কৌতূহল হয় তবেই আমি সুখী হবো।

এবার আমার চিঠি সমাপ্ত করতে হবে। শেষ করার আগে আর একটা কথা বলে নিই। তোমার স্মরণ আছে নিশ্চয় সেদিন জু-গার্ডেনে তুমি আমাকে দশ পাউন্ড দিয়েছিলে। আমি জানি তুমি কেন আমায় এই টাকা দিয়েছিলে। দয়া-অনুকম্পা···সামান্য কল-গার্লের পারিশ্রমিক। সেদিন তোমার হাত থেকে টাকা নিতে আমার কোন সংকোচ হয়নি। কিন্তু তারপরই হঠাৎ আমার মনে হলো এ কাজ আমি কেন করলাম! আমি তোমায় ভালোবাসি বিক্রমাদিত্য। দেহের পরিবর্তে টাকা নিতে আমায় কোনদিনই কুণ্ঠা হয়নি, কিন্তু টাকা নিয়ে আমি ভালোবাসার ব্যবসা করতে চাইনে। তাই তোমার টাকা আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। এই চিঠির সঙ্গে টাকা ফেরৎ পাঠালাম! যদি কোন অন্যায় করে থাকি তবে আমাকে মাপ করো। রুকশানাকে একদিন তুমি ভুলে যাবে, কিন্তু কায়রোর স্মৃতি নিশ্চয় মনে থাকবে। তাই জীবনে কখনও যদি কায়রোর কথা মনে হয়, নীল নদীর স্রোতের তরঙ্গ যদি তোমার দৃষ্টিপটে ভেসে ওঠে, তবে একবার রুকশানাকে স্মরণ করো··বিদায় বিক্রমাদিত্য··

একমনে রুকশানার চিঠি পড়ছিলাম। একবার নয়, বহুবার এই চিঠি পড়েছি। তার ভাষা এবং বক্তব্য যেন আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

কায়রোকে আমি কোনদিনই ভুলিনি। আমার কাছে এই শহরকে মনে রাখার কারণ পিরামিড নয়, রুকশানা। পিরামিডের স্মৃতি আমার কাছে

ঝাপসা হয়ে এসেছে, কিন্তু রুকশানার কথা আজও আমার মনে রঙিন হয়ে আছে।

আপনি বাঙ্গালী পাঠক/পাঠিকা। আপনি কী কখনও রুকশানাকে ভুলতে পারবেন?

* * *

তারপর জেরুজালেম।

সেই জেরুজালেম, যার কাহিনী আপনি ইতিহাসে গল্প-উপন্যাসে পড়েছেন বহুদিনের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম নগরী আজও অতীতের গৌরব নিয়ে বেঁচে আছে।

কোথায় যাবেন? আমার এক সহযাত্রীর প্রশ্নে আমি একটু চমকে উঠি। রুকশানার চিঠি পড়তে পড়তে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম অন্যদিকে বা বাইরে তাকাবার কোন অবকাশ হয়নি। সহযাত্রীর প্রশ্নে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো।

জেরুজালেম, আমি বেশ উদাসীন হয়েই জবাব দিই।

জেরুজালেম! আমার প্রশ্নকর্তার কণ্ঠে এবার শুধু বিস্ময় নয় একটু উত্তেজনাও ছিলো। এই প্রশ্ন করেই তিনি হেসে ওঠেন। তারপর বলেন: বলুন 'আল কুদসে' যাচ্ছেন। আপনারা ইংরাজী ভাষায় যাকে বলেন জেরুজালেম —আরবী ভাষায় আমরা বলি 'আল কুদস'।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক এবার থেমে যান। তারপর একটু লজ্জিত কণ্ঠে বলেন: দেখুন কী অন্যায় করেছি। আমার আত্ম-পরিচয় দিই নি অথচ আপনার সঙ্গে গল্প করতে সুরু করেছি। আমি হলাম প্যালেস্টাইনের একজন বাসিন্দা—বর্তমানে শরণার্থী। রাজনীতি আমার ধর্ম, বক্তৃতা আমার পেশা। আমার বিস্তর ভারতীয় বন্ধু আছে। তাই আপনার সঙ্গে যেচেই আলাপ করলুম। আমার নাম শফিক আহমেদ।

এবার একটু সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করি: কিন্তু আপনার আসল পেশা কী সেকথা তো বললেন না?

যাদের নেশা হলো রাজনীতি, তাদের আসল পেশা কী জানেন—ওকালতি। আপনি?

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ভবঘুরে।

সাংবাদিকেরা ভবঘুরে হয় জানি। কিন্তু সাহিত্যিকেরা যাযাবর হয় একথা তা আমার জানা ছিলো না।

কিন্তু তার প্রমাণ তো আজ পেলেন—আমি একটু হেসে জবাব দিই।

শফিক আহমেদ প্রশ্ন করেন: কী লেখেন আপনি?

উপন্যাস এবং গল্প। লিখি বটে, কিন্তু আমার বই পাঠকেরা পড়েন না। প্রকাশকদের মস্তো বড়ো অভিযোগ যে, বাজারে আমার বই বিক্রী হয় না।

এবং আমেরিকা। তাই তেল নিয়ে এদের নিত্যই স্বার্থের সংঘর্ষ হয়।

জানেন বিক্রমাদিত্য, বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করা সহজ কথা নয়। তাই আরবদেশের প্রথম কর্তব্য হলো নিজেদের ভেতর একতা বজায় রাখা। আর একতা রাখা তো সহজ কথা নয়! আমাদের ভাষা এবং ধর্ম এক হলে কী হবে, আমাদের চিন্তাধারা পৃথক। আমরা এক ভাষায় কথা বলি—অন্য ধারায় চিন্তা করি। লেবাননে গিয়েছেন কখনও? সেই দেশে সমাজের প্রতি স্তরে-স্তরে ফরাসী চিন্তাধারা দানা বেঁধে আছে। ইরাকে যান, দেখতে পাবেন সবাই ইংরাজী বকছে। কিন্তু তবু আমরা নিত্য আরব একতার জন্যে সংগ্রাম করছি। আমাদের এই একতার সবচাইতে বড়ো বাধা কী জানেন? বিদেশী শক্তি।

শফিক আহমেদ একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবার তার কথায় আমি বাধা দিই। কারণ এই অঞ্চলে এসে আরব একতার শ্লোগান শুনে আমিও একটু বিরক্তি অনুভব করছিলাম। বলি: আরব একতা যদি সত্যিই আপনারা চান তাহ'লে এতো হাঙ্গামা কেন? যে কোন দিনতো আপনারা একত্র হতে পারেন। বিদেশী শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এতোই কঠিন!

আমার এই প্রশ্নের ভেতর একটু বিরক্তির ঝাঁজ ছিলো। আমার কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বেসুরো লাগলো। শফিক্ আহমেদও আমার কথা শুনে বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। কিন্তু মুহূর্তের ভেতর নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর জবাব দিলেন: বিক্রমাদিত্য, ইসলাম ধর্মের ভেতর কোন সমাজের স্তর নেই বটে, কিন্তু আরব জাতির ভিতর পার্থক্য আছে—বিভেদ আছে। এ অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদ গিয়েছে বটে সাম্যবাদ প্রচলন হয়নি। সম্প্রতি সিরিয়া, মিশর এবং আলজেরিয়ায় এই নীতির প্রচলন হয়েছে, কিন্তু দানা বাঁধেনি। ধনী সম্প্রদায় সওদাগরের দল আজো এখানে কায়েমী হয়ে বসে আছে।

আগেই বলেছি তিন নিয়ে মিডল ইস্ট। তাই এই অঞ্চলের কাহিনী বলতে হলে প্রথম থেকে আমার গল্প বলা দরকার। প্রথমে শুনুন, এই ইসরাইলের কাহিনী। ঐ যে আল কুদ্স শহরে যাচ্ছেন, ঐ আল কুদ্স বা জেরুজালেম নগরী নিয়ে ইসরাইলের কাহিনী। দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে এই শহর। একটা আরবদেশের অংশ, অপরটি হলো ইসরাইলের। এই ইসরাইল নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের যতো হাঙ্গামা। শুনুন, তাহলে ইসরাইলের পুরো ফিরিস্তি।

*　　　*　　　*

দু-হাজার বছর আগের জেরুজালেম নগরী। আজকের আলকুদ্স আর সেদিনকার শহরের ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য ছিলো। আজ আমান থেকে জেরুজালেম যাবেন, পাক্কা একঘণ্টা লাগবে সফর করতে। কিন্তু অতীতে এই পথ অতিক্রম করতে মাস কেটে বছর লাগতো। আজ বেথেলহামে যাবেন তো

একঘণ্টা লাগবে—কিন্তু যীশু যখন বেঁচে ছিলেন তখন বেথেলহাম থেকে জেরুজালেম আসতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগতো। কালের করাল গ্রাসে, সময়ের হেরফেরে এই দেশের ভেতর কতো অদল বদল হয়ে গেছে তার হিসেব নিকেশ নেই।

যীশুর জন্মের বহুদিন আগে—বহুদিন মানে দু'হাজার বছর আগে এই শহরে দামাস্কাস থেকে একদল মুসাফির এসে আস্তানা গাড়লো। এরা হলো হিব্রু সম্প্রদায়। সেদিনকার কথা ভেবে দেখুন। পাহাড় বনবাদাড় ভেঙ্গে এতো দূরে এসে বাড়ী করা তো চাট্টিখানি কথা নয়! একটু দূরেই 'মৃত্যুর সাগর'—ইংরেজী ভাষায় আপনারা যাকে বলেন 'ডেড সী'। লোনা জল, এতো ভারী যে ডুববার কোন সম্ভাবনা নেই। এই জলে আপনি গা ভাসিয়ে দিন—ভাসতে থাকবেন। এই সাগরের উপর দিয়ে পাখী অবধি উড়ে যায় না। তাইতো এর নাম হয়েছে 'মৃত্যুর সাগর'।

এই মৃত্যুর সাগর পার হয়ে জবল আমান অতিক্রম করে হিব্রুরা এসে জেরুজালেমে জাঁকিয়ে বসলো। এই দলের নেতা হলেন আব্রাহাম। এরা ইসরাইলীর বংশধর বলে এদের নাম হলো ইসরাইলি।

লেবাননের আদি বাসিন্দা হলো ফিনিসিনিয়ান। এরা সাতসমুদ্দুর ঘুরে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। কিন্তু এদের সঙ্গে ইসরাইলিদের কোন বনিবনা ছিলো না। পরে আর একদল এলো, তাদের নাম ছিলো ফিলিষ্টিন। এই নাম থেকে প্যালেস্টাইনের নাম হয়েছে।

এই হিব্রুদের কাহিনী নিয়েই বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'। আপনার কাছে সম্রাট ডেভিড বা সলোমনের নাম তো অজানা নয়। এদের ভগবান মেশিয়া। এরা বিশ্বাস করেন ভগবান আবার এই সংসারে ফিরে আসবেন। এদের ধর্ম হলো জুডাইজম।

এই হিব্রুদের ধর্ম নিয়ে কতো গল্প, ইতিহাস এবং রাজনীতি হয়েছে তার হিসেব নিকেশ নেই। আজ এইসব পুরানো কাসুন্দী ঘেটে লাভ নেই। শুধু জুডাইজম নিয়ে যে রাজনীতি হয়েছে তারই বিবরণী দেবো।

* * *

সম্রাট সলোমন মারা গেলেন, তারপর প্যালেস্টাইনকে দুটো অংশে ভাগ করা হলো। একটা অংশের নাম হলো সামারিয়া। অন্য হিস্যার নাম জুডা। সামারিয়া সাম্রাজ্য ছিলো ক্ষণস্থায়ী। কিছুদিন বাদে এই রাজ্য আসিরিয়ান রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

বছর ঘুরে শতাব্দী গেলো। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হলো সাম্রাজ্য-ইতিহাসের হেরফের। একদিন ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাডনেজার এসে জুডা আক্রমণ করলেন। নেবুকাডনেজারের আক্রমণে জুডা ধ্বংস হয়ে গেলো।

তারপর দীর্ঘকাল জেরুজালেম নগরী ছিলো পরাধীনতার শৃঙ্খলে।

এই জেরুজালেমের বুকের উপর দিয়ে কম হাঙ্গামা যায়নি। কিছুদিন বাদে এই নগরীর উপর রোমান সম্রাটদের নেকনজর পড়লো। রোমান সম্রাট তার দলবল নিয়ে জেরুজালেম নগরী আক্রমণ করলেন।

তারপর এই জেরুজালেমের বুকের উপর দিয়ে কতো ঝড় বয়ে গেলো। এক সম্রাট আসেন, গড়েন রাজ্য—কিন্তু অন্যের আক্রমণে তার রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায়।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের প্রসার সুরু হয়েছে। সেই ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে বিখ্যাত আরব সম্রাট সালাদীন জেরুজালেম আক্রমণ করলেন।

সালাদীনের শাসন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কারণ এই সময়েই জেরুজালেমে সুরু হলো ধর্মযুদ্ধ। যুদ্ধের পরিণাম আপনার অজানা নয় বিক্রমাদিত্য!

* * *

চলুন এবার জেরুজালেম নগরীতে। জেরুজালেম নগরী আজোও পৃথিবীর বিস্ময়। ছোট রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলুন। এই সেই বিখ্যাত রাস্তা ভিয়ার্দলর চো। এই রাস্তার উপর দিয়ে যীশু তার ক্রুশ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সঁপিল রাস্তা ভিয়ার্দলর চো। একজনার বেশী দুজনার হাঁটার যো নেই। তবু এই সরু রাস্তা দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে। যাচ্ছে দুধওয়ালা, মাছওয়ালা - হরেক রকম জিনিসের ফেরিওয়ালা। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার যো নেই। দুধারের দোকান পসারীরা জোঁকের মতো সবাইকে ছেঁকে ধরছে। জিনিষ কিনুন বা না কিনুন একবার দোকানে ঢু মেরে যান। এখানে দাম দস্তুরের বালাই নেই—কারণ এ হলো ট্যুরিস্টের স্বর্গরাজ্য।

পৃথিবী বিখ্যাত ভিয়ার্দলর চো। দু হাজার বছর আগে একদিন-প্রহরী বেষ্টিত হয়ে যীশু এই পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। জেরুজালেম নগরী তখন রোমান সম্রাটদের অধীনে। স্থানীয় শাসনকর্তা হলেন পনসাস্ পাইলট।

পনসাস্ পাইলটের দরবারে হিব্রু সম্প্রদায় যীশুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন। টাওয়ার অব এ্যান্টনীওতে যীশুর বিচার হলো। কিন্তু বিচার করতে গিয়ে পনসাস্ পাইলট বেশ সমস্যায় পড়লেন। তিনি জানেন, যীশু নির্দোষী, কিন্তু হিব্রুদের মতের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন না। তবু একবার জনতার কাছে আবেদন করলেন যে, যীশুর পরিবর্তে বারাবাস নামে আর এক অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হোক।

কিন্তু জনতা এই রায়কে স্বীকার করে নিতে পারলনা। অতএব বিচার সুরু হলো। বিচার নয়, প্রহসন সুরু হলো। আর বিচারে সাব্যস্ত হলো যে, যীশুর প্রাণদন্ড হবে। একটা ক্রুশ মাথায় বয়ে নিয়ে যাবেন যীশু। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। তারপর একটা ছোট পাহাড়ে ক্রুশে আটকানো হবে।

বেশ ভারী ছিলো ক্রুশ। এটা বয়ে নিয়ে যেতে তার কম কষ্ট হয়নি। পথ

দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছিলেন। কেউ তাকে সাহায্য করেনি। বরং সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে কিংবা ঠাট্টা টিটকারী করেছে।

এই ভিয়াদ'লর চোর যে কয়েকটি জায়গায় যীশু থেমেছিলেন, তার প্রতিটি জায়গায় একটি করে ছোট চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। কোন স্থানের নাম হমো, কোনটার নাম সেন্ট ভেরোনিকো। একটি স্থানের সামনে দাঁড়িয়ে মেরী তার সন্তানের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করেছিলেন।

এই ভিয়াদ'লর চো দিয়ে হাঁটলে পর আপনি সোজা চলে আসবেন হোলী সেপেলকার গির্জায়। এই গির্জার জমিতে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো।

যীশু মারা যাবার পর বহু বছর অবধি কেউ এই জায়গার নিশানা রাখেনি। প্রায় তিনশ বছর বাদে একদিন সম্রাট কনস্টানটাইনের মা সেন্ট হেলেনা এলেন জেরুজালেম নগরীতে। তিনি এসে ক্রুশবিদ্ধের জায়গার সন্ধান সুরু করলেন। অনেক সন্ধানের পর এই জায়গা আবিষ্কার করা হলো। তৈরী হলো সম্রাট কনস্টানটাইনের আদেশে হোলী সেপেলকারের গির্জা।

তারপর এলো পারস্য সম্রাটদের যুগ। একদিন তারা সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই গির্জা আক্রমণ করলো। গির্জা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। কিছুদিন বাদে গ্রীক ক্রীশ্চানরা এইখানে এসে নতুন করে গির্জা তুললেন।

ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসার সুরু হয়েছে। একদিন এই ধর্মের বাণী নিয়ে খলিফা ওমর এলেন এই শহরে। জেরুজালেম দখল করতে তার কম বেগ পেতে হয়নি।

ওমর যখন শহরে এসে ঢুকলেন তখন নামাজ পড়ার সময় হয়ে গেছে সেনাপতিরা প্রস্তাব করলেন যে, গির্জার ভেতরে গিয়ে নামাজ পড়া যাক। কিন্তু ওমর প্রতিবাদ করেন। তিনি জানেন একবার ঐখানে গিয়ে নামাজ পড়লে চিরকালের জন্যে ঐ গির্জা হবে মসজিদ। তিনি কারু ধর্মে হাত দিতে চান না তাই সবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। হোলী সেপেলকার গির্জার সামনে ছিলে একটা বড়ো মাঠে। সেই মাঠ বসে ওমর নামাজ পড়লেন। আজ সেই মাঠের উপর তৈরী হয়েছে বিখ্যাত আল আকসা মসজিদ।

হোলী সেপেলকারের গির্জা আজ খৃষ্টধর্মের সব চাইতো বড় তীর্থস্থান। এ গির্জাতো শুধু রোমান ক্যাথলিকদের গির্জা নয়, আসিরিয়ান, প্রটেস্টান্টদের এ হলো পবিত্র স্থান।

সেকালে এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়দের ভেতর গির্জার কর্তৃত্ব নিয়ে মারামারি হতো। তাই সম্রাট সালাদীন এই গীর্জার কর্তৃত্ব দিলেন এক মুসলমান প্রহরী হাতে। গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তারই উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। আজে এই প্রথা চালু আছে।

তীব্র আর্তনাদ করে প্লেন এসে জেরুজালেমের বিমান বন্দরে থামলো শফিক আহমেদের গল্পে বাধা পড়লো। হেসে আমাকে বললেঃ আ

এইখানে আমাদের কাহিনীর জের টানতে হলো। আপনি জেরুজালেম এলেন, ঘুরে দেখুন অনেক কিছু জানবার-দেখবার আছে।

আমি ন্যাশনাল প্যালেস হোটেলে থাকবো। কখনও যদি সময় করে উঠতে পারেন আসবেন, গল্প করা যাবে।

এই অল্পকালের ভেতর আমার শফিক আহমেদের সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিলো। কেন তাকে ভালো লেগেছিলো জানিনে। জেরুজালেমের ভূমি স্পর্শ করার আগে অতীতের জেরুজালেমের কাহিনী আমাকে বিস্মিত করেছিলো। তাই শফিক আহমেদকে আমি সহজে ভুলতে পারিনি।

* * *

জেরুজালেমে এসে কী দেখবেন বলুন? ভিয়াদলর চো-র কাহিনী শুনলেন। আর একদিন বেথেলহামের গল্প বলা যাবে। এ ছাড়া জেরিকো, আরো কতো কী দেখার আছে! কিন্তু এতো সবই অতীতের বিস্মরণী। এবার বর্তমানের কাহিনী কিছু বলা যাক।

চলুন, আমরা মান্দেলবুম গেটের কাছে যাই। এখান থেকে ইসরাইলের সহর দেখতে পাবেন! রাস্তার একপ্রান্তে জর্ডন অপর প্রান্তে ইসরাইল। চারদিকে পড়ে আছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ভাঙ্গা বাড়ী। আজও এই সব বাড়ী জনমানবহীন। দুই দেশের দুই প্রান্তে সশস্ত্র সৈনা পাহারা দিচ্ছে। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হলে এই মান্দেলবুম গেট দিয়ে যেতে হয়। একবার আরব প্রান্ত থেকে ইসরাইল গেলে এই অঞ্চলে আর ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনি ইসরাইলে গিয়েছেন এ কথা আরব সরকার জানতে পারলে কোন কালেই আপনি আর আরবদেশে ফিরে আসতে পারবেন না। যদি আপনার পাশপোর্টে ইসরাইলের নাম লেখা থাকে তাহলেও আরবদেশে আপনার প্রবেশ নিষেধ।

আপনি ভাবছেন, এত হাঙ্গামা করে কে যায়? যাত্রীর অভাব নেই—এনতার লোক আরব প্রান্ত থেকে ইসরাইলে যাচ্ছে। সেখান থেকে লন্ডন বা নিউইয়র্কে। এ ছাড়া প্রতি বছর বড়দিনের সময় তীর্থ করতে ইসরাইলী খৃস্টানরা জেরুজালেমে আসে।

এই ইসরাইল নিয়ে এতো হাঙ্গামা কেন, একথা জানবার জন্যে আপনার নিশ্চয় দুর্বার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তবে শুনুন আমার সেই গল্প।

ইসরাইল হলো ইহুদীদের দেশ। আগে এর নাম ছিলো প্যালেস্টাইন। হাজার বছর ধরে এই প্যালেস্টাইনে বাস করতো আরব সম্প্রদায়। কিন্তু আরো আগে এই অঞ্চলে ছিলো হিব্রুদের বসবাস। পৃথিবীর চতুর্দিকে ইহুদীরা ছড়িয়ে আছে। বহু স্বনামখ্যাত মনীষী ইহুদী। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, ধনকুবের রথচাইল্ডের নামও আপনার অজ্ঞাত নয়। কিংবদন্তী আছে যে, কার্লমার্কসও ইহুদী ছিলেন, কিন্তু

পরবর্তী জীবনে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

আরব-ইসরাইলী সমস্যার কারণ ইহুদী ধর্ম নয়—জিয়নিজম। জিয়নিজম কোন ধর্ম নয়. রাজনৈতিক মতবাদ। এই রাজনৈতিক মতবাদ শুরু হলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। যেখানেই ইহুদীরা যায় সেইখানেই তাদের নিয়ে হাঙ্গামা। তাই ইহুদীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা গবেষণা শুরু করলো। লিও পিনসকার নামে এক ইহুদী ডাক্তার ছিলেন। তিনি এই জিয়নিজম মতবাদ প্রচার করেন। তখন কিন্তু কেউ কল্পনা করেননি যে, একদিন প্যালেস্টাইন হবে ইহুদীদের দেশ—আর প্যালেস্টাইনের সমস্যা নিয়ে পৃথিবীময় হাঙ্গামা সুরু হবে।

তারপর এলেন থিওডর হেরজল, অষ্ট্রিয়ান ইহুদী; জিয়নিজম মতবাদ বলতে গেলে তিনিই প্রচার করেন।

বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে জিয়নিয়ম মতবাদ প্রচার সুরু হয়েছে। ইহুদীদের জন্যে ভিন্ন দেশ চাই—এই হলো ইহুদীদের দাবী। এই মতবাদ চালু করার জন্যে সংঘ তৈরী হল। ১৮৭০ সালে এই সংঘের প্রথম বৈঠক হলো। সংঘের প্রচেষ্টায় জাফাতে এগ্রিকালচার স্কুল স্থাপিত হলো।

এ হলো বহুদিন আগের কথা। আরব আর ইহুদীদের ভেতর তখন কোন ঝগড়া-বিবাদ ছিলো না। ইহুদীদের এই সংঘ নিয়ে কেউ কোন বাদ-প্রতিবাদ করেনি।

ইতিমধ্যে নিত্যং প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা বাড়ছে। ইহুদী সংঘ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদী প্যালেস্টাইনে ডেকে আনছেন। এই আগমনের পশ্চাতে ছিলেন থিওডর হেরজল। তারই চেষ্টায় কিছুদিনের ভেতর এই সংঘ তৎপর হয়ে উঠলো। প্রায়ই সংঘের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠক হয়। প্রস্তাব আর দাবী দাওয়া পাশ হলো—আর এই প্রস্তাবে বলা হলো যে, পৃথিবীর ইহুদীদের জন্যে একটা পৃথক দেশ চাই।

কিন্তু মিটিং বৈঠক দাবী-দাওয়া করলেই দেশ পাওয়া যায় না। পৃথক দেশ পেতে হলে বিস্তর চেষ্টা করতে হয়! আর একজন দুজনের চেষ্টায় এই দেশ গঠন করা যায় না। হাজার হাজার ইহুদীদের নিয়ে এক নতুন দেশ—নতুন শাসনতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। আর এই দেশ কোথায় মিলবে? বহুদিন—শুধু বহুদিন নয়, বহুযুগ ধরে আরব সম্প্রদায় প্যালেস্টাইনে বসবাস করছে। এই বাসিন্দাদের সরিয়ে তো আর প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জায়গা করে দেওয়া যায় না!

এই নতুন দেশ নিয়ে ইহুদী সংঘের ভেতর বিস্তর তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনা হলো। অনেক চিন্তা ভাবনা করে এবার হেরজল গেলেন বৃটিশ সরকারের দরবারে। ইংরেজের নীতির প্রতি হেরজল এবং তার কর্মীদের বিশ্বাস আছে। ইহুদীদের জন্যে এক পৃথক দেশ চাই। এই হলো তাদের

দাবী। আর সেই দাবী পেশ করা হলো ব্রিটিশ সরকারের কাছে।

ব্রিটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তখন অষ্টিন চেম্বারলিন। তিনি হেরজল এবং তার সহকর্মীদের দাবী-দাওয়া ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর অনেক চিন্তা ভাবনার পর বললেন, ব্রিটিশ সরকার কেনিয়া দেশ ইহুদীদের জন্যে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

চেম্বারলিনের প্রস্তাব শুনে ইহুদীরা হতভম্ব। হাজার হোক ইহুদীরাও সাহেব। আফ্রিকার দুর্গম বনজঙ্গলে বাস করা তাদের কল্পনার বাইরে। ইয়োরোপের মোহ কথনই তারা কাটাতে পারে না। অতএব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের প্রস্তাব বাতিল করা হলো।

* * *

এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। আরম্ভ হলো ইংরেজ জর্মানী লড়াই।

মধ্যপ্রাচ্যে জর্মানীর বিস্তর প্রভাব। ইংরেজ কর্তারা এই ভেবে বেশ একটু বিচলিত হলেন। জর্মানদের সঙ্গে লড়াই করতে হলে বন্ধুর প্রয়োজন। অতএব ইংরেজ আরবদের চটাতে রাজী নয়। ইংরেজ কর্তারা বন্ধুর সন্ধানে বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে লাগলেন।

তখন মক্কার শাসনকর্তা শেরিফ হুসেন। তিনি হলেন আরবদের নেতা। তার সঙ্গে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার হেনরী ম্যাকমোহন এসে দেখা করলেন। তার কাছে স্যার হেনরী এক গোপন চুক্তির প্রস্তাব করলেন। এই চুক্তির সর্তে বলা হলো যে, আরবদেশ তুর্কীর শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে। কারণ তুর্কী হলো জর্মানীর বন্ধু। তুর্কীকে ব্যতিব্যস্ত করা মানে জর্মানীকে নাজেহাল করা।

শেরিফ হুসেনকে ইংরেজ প্রতিশ্রুতি দিল যে, এই সাহায্যের পরিবর্তে আরবদের বৃহৎ আরবদেশ গঠন করার অধিকার এবং স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া নবে। ঠিক হলো, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, জর্ডন, লেবানন এবং ইরাক নিয়ে এই বৃহৎ আরবদেশ গঠন করা হবে।

শেরিফ হুসেনের সঙ্গে গোপন চুক্তি হলো বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ কর্তারা আর এক দাবার চাল খেললেন। মধ্যপ্রাচ্যের হিস্যা নিয়ে আর এক ভাগ বাঁটোয়ারা হলো। ইংরেজ ফরাসীর ভেতর এক গোপন চুক্তি হলো। এই চুক্তির সর্ত হলো যে, আরবদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। এক অংশের মালিক হবে ইংরেজ—অপর ভাগের অংশীদার হবে ফরাসী। এই গোপন চুক্তির নাম হলো 'সাইকস্ পিকো এগ্রিমেন্ট'। আর এই চুক্তির শর্ত হলো ম্যাকমোহন চুক্তির ঠিক উলটো।

প্রথম লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদের দাবী-দাওয়া বাড়তে লাগলো। এবার ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হলেন ডাঃ ওয়াইজম্যান। ব্রিটিশ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি ধর্না দিলেন। দাবী ইহুদীদের জন্যে পৃথক দেশ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বালফুর। তিনি ওয়াইজম্যানকে সমর্থন করলেন। শুধু সমর্থন নয়, প্রস্তাব করলেন যে, ইহুদীদের জন্যে পৃথক দেশ দেওয়া হবে। এই পৃথক দেশ গড়ে তুলতে ব্রিটিশ সরকার ইহুদীদের সাহায্য করবেন।

বালফুরের সমর্থন এবং সেই প্রসংগে যে বিবৃতি তিনি দিয়েছিলেন সেই বিবৃতি আরব দেশগুলোর ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনে প্রতি মাসে—প্রতি বছরে নতুন করে ইহুদীদের আগমন হচ্ছে। এ আগমনে বাধা দেবার কেউ নেই। আরবরা নিস্তব্ধ—আর ইংরেজ-আমেরিকান কর্তারা এদের প্যালেস্টাইনে বসবাস করার জন্যে উস্কানি দিচ্ছেন।

* * *

মাস কেটে বছর যায়। এলো ১৯৩৪ সাল।

জর্মানীতে নাৎসী দলের অভ্যুদয় হলো। এই দলের নেতা হলেন এডলফ হিটলার। তিনি হলেন ঘোরতর ইহুদী বিশ্বেষী। প্রতিদিন কিছু না কিছু অজুহাতে ইহুদীকে জর্মানী থেকে বের করে দিচ্ছেন। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আস্তানা গাড়ছে। কেউবা যাচ্ছে আমেরিকায়, কেউবা লন্ডনে কেউবা প্যালেস্টাইনে। ইংরেজ তখন প্যালেস্টাইন শাসন করছেন। ইহুদীদের আগমনে ইংরেজ কর্তারা কোন বাধা দিলেন না। বরং প্যালেস্টাইনে বসবাস করবার জন্যে বিস্তর প্রলোভন দিতে লাগলেন। অতএব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে প্যালেস্টাইনে বিস্তর ইহুদী এসে আস্তানা গাড়লো।

কিন্তু এই লড়াই ইংরেজদের একটু বিব্রত করলো। কারণ লড়াইর জন্যে তেলের প্রয়োজন। আর সে তেল আসে আরবদেশ থেকে। এইসব আরব-দেশগুলোকে চটানো মানে তেলের সাপ্লাই বন্ধ হওয়া। ইরাক-কুয়েৎ থেকে ভূমধ্যসাগরের বন্দর ত্রিপোলী সইদা বন্দরে এই তেল আনা হয়। ইচ্ছে করলে আরব নেতারা এই তেলের পাইপ কেটে দিতে পারে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলে যে, আরবদের চটানো ঠিক হবে না। অতএব প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন বন্ধ করা হলো। কারণ ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে আনাগোনা করতে দিলে আরব সম্প্রদায় চটতে পারে। কিন্তু লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পুরানো নাটকের পুনরাবৃত্তি সুরু হলো। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান প্রস্তাব করলেন যে, প্যালেস্টাইনে আরো দশ হাজার ইহুদী আসতে দেওয়া হোক। ইংরেজ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলো বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের আগমনে কোন বাধা দিলো না।

প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা এবার নিজেদের স্বার্থকে কায়েমী করার জন্যে হাতিয়ার নিলো। ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে এই হাতিয়ার এলো। শুধু হাতিয়ার নয়, ইহুদীদের প্রচেষ্টায় এক সৈন্যবাহিনী গঠিত হলো। এই সৈন্য-বাহিনীর নামকরণ হলো হাগানা। এছাড়া আরো দুটো সশস্ত্র দল তৈরী হলো। এদের নাম হলো ইরগুন জভাই লুমি এবং অন্যদলের নাম হলো স্টর্ম গ্যাংগ।

ক্রমে ক্রমে আরব-ইহুদী বিবাদ বেশ জোরালো হয়ে উঠলো। দুপক্ষই লড়াই করতে প্রস্তুত। হাতিয়ারের অভাব নেই, গরম-গরম বক্তৃতা বিবৃতি রোজই নেতারা দিচ্ছেন। বেগতিক দেখে এই সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসের দপ্তরে পেশ করা হলো।

ইহুদীদের বক্তব্য, প্যালেস্টাইন তাদের মাতৃভূমি। আজকে নয় বহুদিন থেকে, বাইবেলের প্রারম্ভে ইহুদীরা এই দেশে বসবাস করতেন। আরবদের বক্তব্য, দু'হাজার বছর ধরে এই দেশে তারা বসবাস করছে এই অঞ্চলের সবাই আরব। ইহুদীরা উড়ে এসে বসেছে।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বৈঠক বসলো, বিস্তর আলোচনা হলো। তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই, কিন্তু মীমাংসার নাম গন্ধও নেই। আরবদের প্রতিনিধি হলেন হজ আমিন। তাঁর দাবী প্যালেস্টাইন আরবদের মাতৃভূমি। বেগতিক দেখে ইংরেজ জানালো ইউনাইটেড নেশনসের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ সরকার তাদের সৈন্যবাহিনী প্যালেস্টাইন থেকে সরিয়ে নেবে। এর পরিণামে যদি দুপক্ষের ভেতর লড়াই সুরু হয় হোক, ইংরেজ বাধা দেবে না।

ইংরেজের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ইহুদীদের বিস্তর সুবিধে করে দিলো। কারণ তাদের হাতিয়ার আর অর্থের অভাব নেই। সবচাইতে বড়ো সুবিধে যে, তাদের ভেতর দলাদলি নেই। কিন্তু আরবদের ভেতর ঝগড়ার অন্ত নেই। তারপর অর্থ ও সৈন্যবাহিনী নেই বললেই চলে।

ইউনাইটেড নেশনসের বৈঠকে ঠিক হলো যে, প্যালেস্টাইনকে দুটো অংশে ভাগ করা হবে। এই দেশ ভাগ নিয়ে আলোচনা করার জন্যে বিশেষ কমিটি বসলো। কমিটির কর্তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, দুটো অংশের ভেতর কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকবে না বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আরবদের ভাগে পড়লো সাড়ে চার হাজার বর্গমাইল অথচ মোট আরব সংখ্যা হলো প্রায় আট লাখ। ইহুদীদের ভাগে পড়লো পাঁচ হাজার বর্গ মাইল। তাদের লোকসংখ্যা হলো পাঁচ লাখ ইহুদী এবং চার লাখ আরব।

ইতিমধ্যে ইংরেজ ঘোষণা করলো যে, ১৯৪৮ সালের পয়লা আগস্ট থেকে ইংরেজ প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে যাবে। ব্যাস্, আর কথা নেই। হাঙ্গামা বাড়লো। আরবরা ইউনাইটেড নেশনসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলো। এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার জন্যে দামাস্কাসে আরব লীগের বিশেষ বৈঠক বসলো। কারণ সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হচ্ছে। নিত্যই আরবরা ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে আসছে। প্যালেস্টাইনে সুখে শান্তিতে বাস করার উপায় নেই। আরব নেতারা এবার ঠিক করলেন যে, ইহুদীদের নতুন রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

এদিকে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করে ইহুদীরা ঘর সংসার গুছিয়ে নিতে

লাগলো। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নতুন ইসরাইল সরকারকে স্বীকার করে নিলো। এ হলো ইহুদীদের রাজনৈতিক জয়। এবার আরব-ইসরাইলী লড়াই বেশ ভালো করে সুরু হলো। হাঙ্গামা মেটাবার জন্যে ইউনাইটেড নেশনস্ আবার মধ্যস্থতা করতে এলেন।

সন্ধি হলো কিন্তু আরব-ইসরাইলীর ভেতর কোন মিতালি হলো না।

* * *

আরব-ইসরাইলী লড়াই বেশীর ভাগ হয়েছিলো পুরনো জেরুজালেম নগরীতে। এই হলো হোলী সেপেলকর মাউন্ট অলিভসের নগরী। লড়াইতে পুরনো মসজিদ গির্জাও রেহাই পায়নি। মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আকাসা লড়াইতে অনেকটা ভেঙ্গে গেলো।

জেরুজালেম তখন জর্ডনের সম্রাট আবদুল্লার অধীনে। জর্ডনও ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো, কিন্তু শেষ অবধি পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

জর্ডনের প্রধানসেনাপতি ইংরেজ, নাম গ্লাবপাশা। সৈন্যবাহিনী ও আরব লিজিয়ন সামরিক কর্তৃপক্ষরা বলতে গেলে ইংরেজ স্যান্ডহার্স্ট স্কুলের শিক্ষায় পরিপুষ্ট।

জর্ডনের চতুর্দিকে যখন ইসরাইলী সৈন্যবাহিনী ঘিরে আছে, আতঙ্কিত হয়ে সম্রাট আবদুল্লা গ্লাব পাশাকে তলব করলেন। জেরুজালেমের ভবিষ্যৎ তাকে চিন্তিত করে তুলেছে। ইসরাইলী সৈন্যবাহিনী যে-কোন মুহূর্তে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী দখল করতে পারে। এই সম্বন্ধে সম্রাট গ্লাব পাশার মন্তব্য শুনতে চান।

গ্লাবপাশা সম্রাটকে আশ্বাস দিলেন। ভয়ের কারণ নেই। ইংরেজ সেনারা যতোদিন জর্ডনে আছেন ততোদিন আর ভয় কিসের? কিন্তু কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ সরকার আবার দাবার চাল খেললেন। আমেরিকা ইংরেজের কাছে দাবী করেছে আরব লিজিয়ন থেকে ইংরেজ সেনাদের সরিয়ে নেওয়া হোক। অতএব ইংরেজদের চলে আসতে বলা হলো। এমনকি গ্লাব পাশাকেও ব্রিটিশ সরকার ফিরে আসার হুকুম দিলেন। কিন্তু গ্লাবপাশা সেদিন লন্ডনের কর্তাদের আদেশ মানেন নি। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে, কয়েক বছর বাদেই একদিন জর্ডন সরকারের নির্দেশানুযায়ী চব্বিশ ঘন্টার ভেতর গ্লাব পাশাকে আমান ত্যাগ করতে হলো।

ইংরেজ সেনাদের চলে যেতে দেখে সম্রাট আবদুল্লা একটু বিচলিত হলেন। ইসরাইলী সৈনাদের চাল-চলন তার পছন্দ হয়নি! মিশরের সম্রাট ফারুকের কাছে সাহায্য চাওয়া হলো। কিন্তু ফারুক তাকে নিরাশ করলেন। সৌদি আরবিয়ার সম্রাটের সঙ্গে শলাপরামর্শ করা হলো। কিন্তু আবদুল্লা বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। সম্রাট আবদুল্লা এবার এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। আর এই দুঃসাহসের জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হলো।

সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন জেরুজালেমের গভর্নর। নাম আবদুল্লা আল তাল। তারই সাহায্য নিয়ে সম্রাট গোপনে গোপনে ইসরাইলীদের সঙ্গে গোপন চুক্তির কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। কিন্তু ইসরাইলীরা তখন যুদ্ধে জয়ী হয়ে আনন্দে মশগুল। গোপন সন্ধি করতে তারা প্রস্তুত নন অতএব সম্রাট আবদুল্লার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। বরং এর পরিণাম হলো আরো খারাপ।

একদিন ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলো যে, জর্ডনের সম্রাট আবদুল্লা তাদের সঙ্গে গোপন চুক্তির আলোচনা করছে। সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর আবদুল্লা আল তালও এই গোপন শলাপরামর্শের কথা প্রকাশ করলো।

এই কথা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশগুলোর ভেতর হৈ-চৈ সুরু হলো। সম্রাট আবদুল্লা যে সবার অজ্ঞাতসারে গোপন চুক্তির আলোচনা করতে পারে এ ছিলো আরব নেতাদের কল্পনার বাইরে।

* * *

দিনটা ছিলো বুধবার—১৯৫১ সাল।

সম্রাট আবদুল্লা জেরুজালেম নগরী পরিদর্শন করতে যাবেন, তাই একটু ব্যস্ত ছিলেন। ভোর বেলায় আমেরিকান এম্বাসডার এসে তার সঙ্গে মোলাকাৎ করে গেছেন। যাবার আগে বারবার অনুরোধ করেছেন, জেরুজালেম পরিদর্শন বাতিল করা হোক। কিন্তু সম্রাট আবদুল্লা কারু উপদেশ শুনতে প্রস্তুত নন।

যাবার আগে সম্রাট তার নাতি হুসেনকে (বর্তমান জর্ডনের সম্রাট হুসেন) ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন : যাবে আমার সঙ্গে ?

হুসেন বিস্মিত, হতবাক। প্রথমটায় বুঝতে পারেননি কোথায় যেতে হবে। সম্রাট এবার জেরুজালেম যাত্রার ব্যাখ্যা করে বললেন।

হুসেনকে নিয়ে সম্রাট আবদুল্লা গেলেন জেরুজালেমে। যাবার পথে নাবকুসে খানিকটা জিরিয়ে নিলেন।

জেরুজালেমে এসেই গেলেন আল-আকসা মসজিদে। সম্রাটের দর্শন পাবার জন্যে বিস্তর ভীড় হয়েছে। এই ভীড় ঠেলে সম্রাট গেলেন মসজিদের ভেতর। যেই মসজিদের ভেতর পা দিয়েছেন অমনি একটা লোক এসে তার সামনে দাঁড়ালো। কেউ কোন প্রশ্ন বা বাধা দেবার আগেই পটাপট চললো গুলি।

এক শরণার্থীর হাতে প্রাণ দিলেন জর্ডনের সম্রাট আবদুল্লা। জর্ডন-প্যালেস্টাইনের ইতিহাসে এক নতুন যুগ এলো।

* * *

আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো·· হয়তো আরব বেদুইনের কাহিনীর ছেদ এইখানে টানতে পারতাম, কিন্তু হারুণ অল রশীদের রাজ্যে শাহজাদা এবং শাহজাদী একশো এক রাত গল্প করেছেন। তাই ইচ্ছে থাকলেও

আমার এই কাহিনীর সমাপ্তি এইখানে করতে পারছিনে।

ভবঘুরের কাহিনী, অলস মন্থর গতিতে বয়ে চলে। আমার এই কাহিনীও তাই আর একটু ধৈর্য ধরে আপনাদের পড়তে হবে।

এসেছিলাম মরুভূমির দেশে—ভেবেছিলাম, বালির সমুদ্র আর বেদুইনের জীবন নিয়ে আমার এই রূপকথা লিখবো। কিন্তু এই দুর্গম মরু প্রান্তরে জীবনের আর একটা স্তর কখনো যে দেখতে পাবো এ কল্পনা করিনি।

জেরুজালেম নগরী থেকে একদিন পেত্রা নগরীতে এলাম। লজ্জাবতী লাল ও লালের রাজ্য পেত্রা আজ শুধু দর্শকের আকর্ষণ নয়, বিস্ময়ও বটে। পেত্রা আর জেরুজালেমে অনেক পার্থক্য। শুধুমাত্র দূরত্বে নয়, সৌন্দর্যেও।

সেদিন আমি পেত্রাকে তার সৌন্দর্যের জন্যে মনে ধরে রাখিনি। কী কারণে পেত্রা আমার মনের ভেতর গেঁথে ছিলো আজ সেইটে বলছি।

সেই গল্প ফাঁদতে গেলে পেত্রার খানিকটা বিবরণী আমাকে দিতে হবে।

পেত্রা ছিলো অতীতের মুসাফিরদের পান্থশালা। দামাস্কাস কিংবা মিশরে যাবেন, পেত্রায় কটা দিন জিরিয়ে নিন। এদিকে আবিসিনিয়া অপরপ্রান্তে এডেন—শেবার রাণীর সাম্রাজ্য, নিত্য পেত্রায় এসে মুসাফিরদের বৈঠক বসে। আর সেকালে বৈঠক মানে গুলতানি গল্প নয়—ব্যবসা। সস্তা জিনিষের কারবার নয়, দামী-দামী মণি-মুক্তার বেচাকেনার ব্যাপার। রেশম চালান যাবে চীন থেকে ইয়োরোপে। যাবার পথ পেত্রা। এইখানে সওদা করার বিস্তর কারণ ছিলো। কারণ মরুভূমির বুকে পেত্রা ছিলো একমাত্র মরুদ্যান। সম্রাট সলোমন বলুন, শেবার রাণীর কথাই ধরুন, সবাই এই পেত্রাতে এসে জিরিয়ে নিতেন।

এই পেত্রার আদিম অধিবাসী হলো নাবতাইন। দীর্ঘকাল নাবতাইন সম্প্রদায় এই পেত্রার বুকে বসে রাজত্ব করে গেছেন। তারপর হলো গ্রীক সাম্রাজ্যের উত্থান। পেত্রা এলো গ্রীক সম্রাটদের আওতায়। তারপর শুরু হলো রোমের জয় জয়কার। এই সময়ে রোমান সেনাপতি আর সওদাগরেরা এসে ঠাঁই নিতেন পেত্রায়। তাই পেত্রার বুকে উঠলো গ্রীক মন্দির আর রোমান দালান।

দূরপ্রাচ্যে যাবার জন্যে দূরত্ব কমানো চাই। তাই রোমান সওদাগরেরা পেত্রা ছেড়ে পালমিরার দিকে নজর দিলেন। পেত্রার খ্যাতি কমতে লাগলো। ধীরে ধীরে পেত্রা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেলো।

ক্রুসেডের আমলে আবার পেত্রার খ্যাতি ফিরে এলো। কিন্তু সম্রাট সালাদীন এই নগরী ছিনিয়ে নেবার পর পেত্রার প্রতি আর কেউ নজর দেয়নি।

ফারাওর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি পেত্রার রূপসুধা পান করছিলাম। এই পেত্রা, আজকের নগরী নয়—হাজার, দু-হাজার, তিন-চার হাজার বছর অতীতের এক বিস্মরণী। এই নগরীর বুকে আজোও অতীতের ঐশ্বর্য অটুট

আছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা এখানে দানা বাঁধতে পারেনি। কারণ, আজকের পেত্রা শুধু ট্যুরিস্টের নগরী।

আপনি ভারতবাসী ?—কে যেন পেছন থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখি একটি অল্পবয়সী মেয়ে। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিলো আরব ললনা। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমাকে একটু সন্দিগ্ধ করে তুললো।

হ্যাঁ, আমি সংক্ষিপ্ত জবাব দিই।

আপনি আরবী ভাষা জানেন ?—আবার সুধামিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন হলো।

হ্যাঁ, কেন বলুন তো ? আমার কণ্ঠস্বরে কৌতূহল ছিলো।

আমার পেছনে অনেকক্ষণ ধরে একটা লোক ঘুরছে। বলছে, ট্যুরিস্ট গাইড। যতোই বলছি যে, আমার গাইডের প্রয়োজন নেই, লোকটা ততোই আমাকে আঁকড়ে ধরছে। একটু বিপদে পড়েছি। বাধ্য হয়ে আপনার শরণাপন্ন হতে হলো।—একটু করুণ দৃষ্টিতে মেয়েটি আমার দিকে তাকায়।

মেয়েটির সঙ্গে যে লোকটি ছিলো এবার আমি তার দিকে তাকাই। লোকটি গাইড, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার বেশভূষা, চাল-চলন দেখলেই কোন সন্দেহ থাকে না যে, এ হলো গাইড। তবু মেয়েটিকে আশ্বাস দেবার জন্যে আমি আরবী ভাষায় প্রশ্ন করি: সু বিদ্যাক।

গাইড, ট্যুরিস্ট গাইড। লোকটা জবাব দেয়।

আনা মা বিদ্য গাইড। শুক্রন ··। আমার মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে লোকটা চলে গেলো।

মেয়েটি বললে: বাঁচালেন! জোঁকের মতো লোকটা আমার পেছনে ঘুরছিলো। এই নির্জন প্রান্তে, এই ধরনের লোক দেখলে কার না ভয় হয় বলুন ?

তাহলে এখানে একা আসেন কেন ? একটু কর্কশ কণ্ঠেই আমি প্রশ্ন করি।

আসি কেন ? আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি গম্ভীর হয়ে পড়ে।

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করি। ভাবি হয়তো এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হয়নি। সৌজন্যের বাইরে। তাই কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করি। বলি: আমি ভারতীয়, কী করে আন্দাজ করলেন ?

কারণ আমিও ভারতীয়···সহজ, সংক্ষিপ্ত জবাব এলো। ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয়কে চেনা কী কঠিন কাজ! বলুন না ?

না, চেনা মোটেই কঠিন নয়। আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হলো।

এবার আমি চলে যাবার উপক্রম করি। মেয়েটি হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারে। একটু মিষ্টি হেসে বলে: আপনাকে বিরক্ত করছি। মাপ করবেন—কিন্তু বিদেশে ভারতীয় দেখলে যেচেই আলাপ করি। আপনি কোথায় যাবেন ?

আমান। আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

আমি জেরুজালেমে ফিরবো। প্রথমে ডেড সী, তারপর জেরুজালেম। কিন্তু সব চাইতে পেত্রা আমার ভালো লাগে।

কারণ? আমি এই প্রশ্ন না করে পারলাম না। নিশ্চয় অতীত সম্বন্ধে আপনার অগাধ কৌতূহল।

না আমি বর্তমান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। যাক, আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনে। আপনার সাহায্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। —সহজ স্পষ্ট জবাব। মেয়েটি যাবার উপক্রম করে।

মেয়েটির জবাব আমাকে নিস্তেজ করলো। কারণ এরপর কোন কথা চলে না। তাই চিন্তা সুরু করি এর পর কী বলা যায়। এতো সহজে আমাদের আলোচনায় ভাঁটা পড়বে এ আমি কল্পনা করিনি।

আপনি ব্যবসায়ী? চলে যাবার আগে মেয়েটি আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করে।

না, সাংবাদিক, ভবঘুরে, জবাব দিই।

মাপ করবেন, যাবার আগে আপনার নাম জানবার ভারী কৌতূহল হলো।

জবাব দিয়েই ভাবতে লাগলাম এবার আমার প্রশ্ন করার পালা। কিন্তু আমি কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মেয়েটি বলে ঃ আমার নাম ইভন পেরেরা —নমস্কার। হয়তো ভবিষ্যতে আবার কোনদিন দেখা হবে।

এই সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ইভন পেরেরা চলে গেলো।

আমি ফারাওর স্তম্ভের কাছে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

* * *

ইভন পেরেরার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। পেত্রা থেকে সোজা ফিরে এলাম বেরুট নগরীতে। তারপর দেশে ফিরবার আয়োজন সুরু হলো।

আমি যে দেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হইনি এমন নয়। কিন্তু ফিরবার আর একটা কারণ ছিলো। পত্রিকার সম্পাদক আমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না। তাই প্রতিদিন দেশে ফিরে যাবার তাগিদ দিচ্ছিলেন।

দীর্ঘদিন বাদে আবার বেরুট বিমানবন্দরে ফিরে এলাম। আজ সাংবাদিক হিসেবে নয়—যাত্রী হিসেবে। বেরুট থেকে বিদায় নিতে যে আমার কষ্ট হয়নি এমন নয়। পরদেশী হয়েও এদেশের প্রতি আমার মায়া মমতা হয়েছিলো। তবু দেশের আকর্ষণ যেন আমার কাছে প্রবল প্রকট।

তীব্র আর্তনাদ করে বোম্বাইর প্লেন এসে বিমানবন্দরে নামলো। দীর্ঘ এক বছর আগে একদিন অপরিচিত মুসাফির সাংবাদিকের তকমা পরে আমি এসেছিলাম মধ্যপ্রাচ্যের বিলাস কেন্দ্র বেরুট নগরীতে। এই নগরীর রহস্য-এই অঞ্চলের ইতিহাস তখনও আমার কাছে অজ্ঞাত ছিলো। লায়লা, মালকানি

রুকশানা, সুলতান, কল্যাণী সেন ছিলো মধ্যপ্রাচ্যের এই রহস্যের অন্তরালে। তারপর অকস্মাৎ একদিন এরা এলো জীবনের পর্দায়, মনে হলো একটু বাদেই এরা আমার জীবনের স্মৃতিপট থেকে বিলীন হয়ে যাবে। আমি আবার হবো ভারতীয় নাগরিক।

প্লেন প্রস্তুত। আরব সুন্দরীর সমধুর কণ্ঠস্বর আমার চিন্তার রেশ ভেঙ্গে দেয়।

দীর্ঘদিন আগে মরহবা ধ্বনি বিমানবন্দরে শুনতে হয়েছিলো। আজ শুনতে হলো বিদায়ের বাণী।

দল বেঁধে এবার প্লেনে উঠলাম। যাত্রার ঘোষণা শুনতে পেলাম। সতর্ক-বাণী শোনা গেলো। একটু দোলা দিয়ে প্লেন আকাশে উড়ল। খানিকবাদে বেরুট নগরীর আলোকমালা জলের বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেলো। আমি মৃদুস্বরে আপন মনে বললাম : বিদায় বেরুট!

* * *

গল্পের শেষ হলো।

না, হয়নি—এখনও কাহিনীর উপসংহার বাকী আছে।

আপন মনে বসে ভাবছিলাম আরব বেদুইনের কথা। কতো অতীতের স্মৃতি আমার মনে জেগে উঠলো। ব্যাবিলন, জিনেৎ, বিবলস, বালবেক, বাগদাদ, পালমিরা, আর আলেপ্পের ছবি আমার মনে ভেসে উঠলো। এক মুহূর্তের মধ্যে অতীত মিলিয়ে গেলো।

কফি প্লীজ—। আমার চিন্তাধারা ভেঙ্গে যায়। বার্তা শুনে নয়—কণ্ঠস্বর শুনে! বহু পরিচিত সুমধুর সঙ্গীতের রেশ যেন আমার কানে ভেসে এলো। এ কণ্ঠস্বর কোথায় শুনেছি কোথায় · ভাবতে থাকি।

অন্যমনস্ক হয়েই প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে তাকালাম। প্লেনের অস্পষ্ট আলোয় যাকে দেখতে পেলাম সে আর কেউ নয়, ইভন পেরেরা—পেত্রায় যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো।

আপনি! ইভন পেরেরার কণ্ঠস্বরে ছিলো বিস্ময়।

একটু হতভম্ব হয়েই আমি সেদিন তাকে কী জবাব দিয়েছিলাম আজ আমার স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু আমার সেই অসংলগ্ন জবাব সেদিন শুধু ইভন পেরেরাকে আশ্চর্য করেনি আমার সহযাত্রীকেও হতবাক করেছিলো।

কফি বিতরণ করে ইভন পেরেরা চলে গেলো। একটু বাদেই প্লেনের আলো স্তিমিত হয়ে এলো। যাত্রীরা তাদের সিটে গা এলিয়ে দিলো। আমি আমার নিজের চিন্তাসাগরে ডুব দিলাম। কিন্তু ইভন পেরেরার ডাক আমাকে সজাগ করে তুললো।

বিক্রমাদিত্য, পেছনের সিট একদম খালি যাচ্ছে। আসবেন এই সিটে? আপনার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানো যাবে। আমাদের তো ঘুমুনো নিষেধ।

ইভন পেরেরার নির্দেশ মেনে নিলাম। সেদিন প্লেনে বেশী যাত্রী ছিলোনা।

তাই পেছনের দুটো সিট এক করে নিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম। একটু বাদে ইভন পেরেরা এসে আমার সিটের পাশে বসলো।

আমি যে এয়ার হোস্টেস্ এ কথা নিশ্চয় আপনি কখনও কল্পনা করেননি।

ভাববার অবকাশ পেলাম কোথায়? সেদিন তো আমরা শুধু নাম বিনিময় করেছিলাম, পরিচয় তো দেওয়া হয়নি।

আমি কে, একথা জানবার ইচ্ছে আপনার কখনও হয়নি? ইভন পেরেরা বলে।

ইচ্ছে থাকলেও কোন অপরিচিতা নারীকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা শোভন কি না এ বিষয়ে আমার শুধু দ্বিধা নয়—সংশয় ছিলো।

আমি ইভন পেরেরা, এয়ার হোস্টেস.; ভারতীয় যাত্রীর কাছে এই একমাত্র পরিচয়, কিন্তু কোন নারীর শুধু এই মাত্র পরিচয় নয়।

নারীর পরিচয় তার দেহ সৌন্দর্যে, তার মুখের ভাষায় নয়—আমি জবাব দিই।

ইভন পেরেরা আমার কথা শুনে একটু লজ্জা পায়। কিন্তু তার এই সংকোচ ক্ষণিকের। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে: আপনি আরব দেশেই থাকেন?

না, আমি ভবঘুরে, সাংবাদিক।

উপন্যাস লেখেন, না কাগজের রিপোর্টার?

আমার কোন পরিচয় আপনাকে সন্তুষ্ট করবে? আমি হেসে জবাব দিই।

যেটায় আপনার পারদর্শিতা আছে তারই পরিচয় দিন।

বুঝলাম তর্ক বিতর্কে ইভন পেরেরার সমকক্ষ আমি নই। তাই কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করি। বলি: এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি এয়ার হোস্টেস্ কিন্তু হঠাৎ পেত্রায় গিয়েছিলেন কেন?

পেত্রায় লোকে যায় কেন?

অতীতের পেত্রার সৌন্দর্য দেখতে।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো ইভন পেরেরা। তারপর বললো: আপনি লেখক বিক্রমাদিত্য, গল্পের প্লট পেলে উপন্যাস রচনা করবেন?

নির্ভর করে সেই প্লট ভালো কী মন্দ তার ওপর।

বেশ, এবার বলুন আপনি আপনার দেশকে ভালোবাসেন?

ইভন পেরেরার এই প্রশ্ন আমাকে হতবাক করলো। আমাদের আলোচনার মোড় হঠাৎ যে এভাবে ঘুরবে আমি কল্পনা করিনি। বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করি। জিজ্ঞেস করতে পারি, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

আজ বহুদিন ধরে দেশ-বিদেশে ঘুরছি বিক্রমাদিত্য। এয়ার হোস্টেস্, দেশ-বিদেশে ঘোরা আমার কাজ। বলতে গেলে দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেছে। এদিক-ওদিকে কতো ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপচারী হয়! দেশ নিয়ে আলোচনা করি। সবাই আমাকে বিদেশে ঘুরতে দেখে হিংসে

করে। বলে, আমি ভগাবতী। কারণ নিতান্তই যারা অভাগা তারাই দেশে থাকে। বলুন তো এই উক্তি সত্যি কিনা ?

আমি চুপ করে থাকি। দেশ সম্বন্ধে সবাই অভিযোগ করে। দুর্নীতি, হাহাকার সমস্ত মিলিয়ে দেশের ভেতর যেন বিষের ধোঁয়া উঠেছে। জীবনের স্রোত ক্রমেই মন্থর হয়ে আসছে। দেশের বাইরে এসে সবাই দেশের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু আমিও কী এই আবহাওয়া থেকে রেহাই পেতে চাই ? ভাবনায় পড়ি। ইভন পেরেরার প্রশ্নের কী জবাব দেবো।

দেশকে আমি ভালোবাসি মিস পেরেরা। যতোদিন দেশে ছিলাম ততোদিন আমার এই ভালোবাসা গভীর ছিলোনা। কিন্তু দেশের বাইরে এসে আমার ভালোবাসা যেন আরোও তীব্র হয়েছে।

জানেন বিক্রমাদিত্য—ইভন পেরেরা বলে, ঐ পেত্রার ধ্বংসস্তূপের কাছে আমি সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিলাম যে, আমি ভারতবাসী। সেদিন আমার কানে কানে কে যেন বলেছিলো যে, আমার দেশ দুর্ভাগা নয়। আমার অতীত আছে, শুধুমাত্র অতীত নয় আমার ঐতিহ্যও আছে। কিন্তু সেদিন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম আমি অতীত চাইনে—আমি চাই ভবিষ্যৎ। প্রাচীন ঐশ্বর্য নিয়ে আমার কোন বাদানুবাদ নেই, আমার জিজ্ঞাসা হলো বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে।

ইভন পেরেরার কথাগুলো আমি নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। বাইরে প্লেনের তীব্র গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। যাত্রীদের চোখ তখন নিদ্রায় ক্লান্ত হয়ে এসেছে। শুধুমাত্র ইভন পেরেরার মৃদুকণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছিলো।

ইভন পেরেরা বলতে লাগলো : বিক্রমাদিত্য, আপনি ঔপন্যাসিক তাই আজ আপনাকে এতো কথা বলছি। কিন্তু জানেন তো প্রতি গল্পের, প্রতি উপন্যাসের ভূমিকা থাকে। আমার এই কাহিনীরও আছে। কিন্তু সেই কাহিনীর ভূমিকা বলবার জন্যে আবার আমাকে পেত্রায় ফিরে যেতে হবে। পেত্রার কাহিনী শুনতে নিশ্চয় আপনি বিরক্তি বোধ করবেন না ! চলুন, পেত্রা থেকে আমার এই কাহিনী সুরু করি।

ইভন পেরেরা একটু চুপ করে আবার বলতে সুরু করে।

* * *

পেত্রা, জেরাস, রাসসামরা সবই তো মধ্যপ্রাচ্যের অতীতের বিস্ময়। বহুদিন ধরে পেত্রা দেখার আমার ভারী শখ ছিলো। হঠাৎ একদিন যাবার মৌকা মিলে গেলো। কী করে সেইটে বলছি।

আমার মা জর্মান কিন্তু আমার বাবা ভারতীয়। দুজনেই ভারতবর্ষে থাকেন। কিন্তু ভাষা শিখবার জন্যে আমি গিয়েছিলাম পারীতে। শখ ছিলো ভাষা শিখে ইউনাইটেড নেশনসে ইণ্টারপ্রেটারের চাকুরী নেবো। কিন্তু দেখতে

পাচ্ছেন তো ভাগ্যের কী প্রহসন! কী হতে চেয়েছিলাম কী হয়েছি। কেন এয়ার হোস্টেস্ হলাম, সে কথাও খুলে বলা দরকার।

একদিন পারীতে বুলেভার স্যাঁ জারমার এক ছোট কফি হাউসে বসে আছি। এমনি সময় এক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। ক্লাস না থাকলেই এই কফি হাউসে বসে আমি সময় কাটাতাম। সেদিনও বসেছিলাম। ভারতীয় ছাত্রটির সঙ্গে আমার পরিচয় আকস্মিক। দোকানীর সঙ্গে পয়সা নিয়ে ঝগড়া চলছিলো। ঝগড়ার কারণ আর কিছু নয়, দু-পক্ষই কেউ কারু ভাষা বুঝতে পারছে না। অতএব তর্জমা করার জন্যে যেচে গেলাম দোকানীর কাছে। ছেলেটিকে বুঝিয়ে বললাম দোকানী কতো চায়।

ছেলেটির নাম রতন মধুকর। আলাপ-পরিচয় হলো। রতন মধুকর লণ্ডনে থাকে, ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ যে করবে এ বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় সন্দেহ ছিলো না। কারণ রতন মধুকর শুধু মেধাবী কৃতি ছাত্র ছিলো না, দেশে ডাক্তারীও করতো। বড়ো দু-একটা ডিগ্রী নিতে লণ্ডন এসেছে।

তারপর ক'টা দিন আমি রতন মধুকরের সঙ্গেই ঘুরেছি। ত্রোকাদারো, আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফস্যাক্রে, কোর, নতরদাম, ল্যুভর, প্যালে দ্য জুস্তিস, সব ঘুরে দেখা হলো। রতন মধুকর আমাকে তার ছাত্রজীবনের কাহিনী বলল। এম বি, পাশ করে পুণাতে প্র্যাকটিস করছিলো। হাতে কিছু পয়সা করে লণ্ডনে এসেছে এফ. আর. সি এস করতে। ছ'মাস বাদে তার ফাইন্যাল। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তার আস্থা আছে। তাই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে তার সন্দেহ নেই।

বহু আলোচনার মধ্যে আমার নিজের জীবনের কিছুটা আভাস তাকে দিয়েছি। বলেছি যে, আমি ইউনাইটেড নেশন্‌স চাকুরী করবো। একদিন ঠাট্টাচ্ছলে রতন মধুকর জিজ্ঞেস করলে : দেশে ফিরবে না?

দেশ? আমার জবাবের ভেতর শুধু বিস্ময় নয় বিদ্রূপও ছিলো।

হ্যাঁ, ভারতবর্ষে। তোমার বাবা-মা দেশেই তো আছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু কী জন্যে যাবো বলো? কাগজে পড়ি দেশে সব কিছুরই হাহাকার। সুখে শান্তিতে বসবাস করবার যো নেই। কারণ সরকারের আইনের কড়াকড়ি। উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা বরং সবকিছুরই অবনতি হচ্ছে। আমি জীবনকে উপভোগ করতে চাই। আর জীবনকে যদি উপভোগ করতে না পারলাম তাহলে স্বাধীন হয়েছি কেন? তুমি তো অনেকদিন যাবৎ দেশের বাইরে আছো, তুমিই বলোনা কেন, লণ্ডন, পারীর বাসিন্দারা তো স্বাধীন। এই জন্যেই তো এরা জীবনকে উপভোগ করতে পারছে! অথচ শুনেছি দেশে স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলবার যো নেই।

রতন মধুকর সেদিন আমার কথার কোন জবাব দেয়নি। শুধু মৃদু হেসে

বলেছিলো : তুমি ভারতবাসী এইটেতো তোমার সবচাইতে বড়ো পরিচয়। শুধু পরিচয় নয়, আনন্দ। সেদিন এ বিষয় নিয়ে বেশী আলোচনা হয়নি। কারণ এই আলোচনা করতে করতে আমরা এসে ল্যুভরে পৌঁছলাম। রতন ছবি দেখতে ভালোবাসে। রাফায়েল, টিসিয়ান, রুবেনস, ভ্যানগগ, গগাঁর ছবি দেখে সারাটা দিন কাটালাম।

*　　　*　　　*

তারপর একটানা ছ'মাস কেটে গেলো। এই ছ'মাসের ভেতর রতনের সঙ্গে আমার বহু চিঠির আদান-প্রদান হয়েছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছি। সব চিঠির কথা আমার স্মরণ নেই শুধু একখানা চিঠির উপসংহারে ছিলো রতন মধুকর আমাকে বিয়ে করতে চায়।

রতনের প্রস্তাবে আমি বিস্মিত হইনি। বরং এই ধরনের প্রস্তাব আমি আশা করেছিলাম। তাই এর জবাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম যে রতন খুব কৃতিত্বের সঙ্গে এফ আর সি. এস পাশ করেছে। আর শুধু পাশ নয়, গাজাতে খুব ভালো একটা চাকুরী পেয়েছে। এই খবরে আমি সত্যিই আনন্দিত হলাম।

এই সংবাদ আমার জীবনে পরিবর্তন আনলো। ল্যাংগুয়েজ স্কুল ছেড়ে দিয়ে আমি একটা চাকুরী নিলাম। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশ ঘুরে একটা কোম্পানীর জিনিসের পাব্লিসিটি করতে হবে। কোম্পানীই যাতায়াত থাকা-খাওয়ার খরচ দেবে।

রতন মাসের চাকুরী—আর নতুন দেশ দেখা হবে তাই সানন্দে চাকুরী গ্রহণ করলাম। কারণ রতন লিখেছিলো যে, কিছুদিনের জন্যে দেশে যাবে। সেখান থেকে বেরুট হয়ে গাজা যাবে। বেরুটে আমি তার সঙ্গে দেখা করবো। সেখান থেকে আমিও গাজা যাবো।

*　　　*　　　*

বাগদাদ সিরিয়া হয়ে একদিন বেরুটে এলাম। রতনও দুমাস দেশে কাটিয়ে বেরুটে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। সঙ্গে একটা সুখবর এনেছিলো। আমাদের এই বিয়েতে তার বাবা-মার কোন আপত্তি নেই।

দিন চারেক বেরুটে কাটিয়ে একদিন আমরা জেরুজালেমে এলাম। সেখান থেকে পেত্রা, আর এই পেত্রা থেকে আমার গল্পের সূত্রপাত।

*　　　*　　　*

একদিন চার্বোত্তিয়ানের সমাধি মন্দিরের সামনে দু'জনে বসে আছি। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভেতর আলোচনা হচ্ছিলো। হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাজাতে তুমি কবে যাবে রতন?

আমার প্রশ্ন শুনে রতন মৃদু হাসলো। রতন অল্পভাষী—কোন প্রশ্নের জবাবকে এড়িয়ে যেতে চাইলে শুধু মৃদু হাসে। আমি বুঝতে পারলাম যে,

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে রতন প্রস্তুত নয়। তাই আমি আবার দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি : গাজাতে কবে যাবে?

গাজায় যাবো—একথা তো কখন বলিনি।

জবাব শুনে আমি বিস্মিত, হতবাক। চাকুরী নিয়ে রতন গাজায় যাচ্ছে, এই কথা সে আমাকে লন্ডন থেকে লিখেছিলো। সেই চিঠির কথা আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

আমার কথার জবাবে বললো : গাজাতে আমি যাবো না ইভন। আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাবো।

ভারতবর্ষে! ইউ মীন ইন্ডিয়া আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

হ্যাঁ, ইন্ডিয়া, মাই মাদারল্যান্ড।

তুমি পাগল হয়েছ রতন। বিদেশে অমন ভালো চাকুরী পেয়ে কেউ দেশে ফিরে যেতে চায়!

তোমার মতো মূর্খ ছাড়া সবাই দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল।

রতন, সত্যিই তুমি মূর্খ। মাপ করো, আজ তোমাকে এই রূঢ় কথা আমাকে বলতে হলো। তোমার মনে আমি কোন আঘাত দিতে চাইনি। আমি স্পষ্টবাদী। তোমার অবিবেচনাকে আমি কখনই সমর্থন করতে পারছিনে।

কথা বলতে বলতে আমি চুপ করি। রতন চুপ করে আমার কথাগুলো শুনছিলো। কোন বাদ-প্রতিবাদ করেনি। হয়তো প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ দেশে ফিরবার জন্যে তার মন দৃঢ়সংকল্প।

আমি আপন মনে বলতে থাকি : তুমি দেশপ্রেমিক, কিন্তু তোমার এই দেশ প্রেমের কোন যুক্তি নেই। দেশ তোমাকে মর্যাদা দেবেনা—অর্থ দেবেনা। তারপর সেখানে অন্যায় ব্যাভিচার প্রতিদিনই বাড়ছে।

কিন্তু তবু আমাকে দেশে ফিরতে হবে। জানো ইভন, কতো দেশ—কতো জায়গায় গিয়েছি। সবার কাছে শুনেছি এককথা। আমরা স্বাধীনতার অপচয় করেছি—দেশে দুর্নীতির প্রসার করেছি। এই নিন্দে প্রচার করছেন আমার দেশের ভাইয়েরা। তারপর বিদেশীদের সংবাদপত্র খুলে দেখো, শুধু দেখতে পাবে দেশকে গালমন্দ দিয়ে লেখা। এই সব শুনলে পড়লে মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও যেন ব্যাভিচার নেই, অন্যায় নেই। আমাদের দোষ ত্রুটীকে অস্বীকার করিনে, কিন্তু দেশ বিদেশ ঘুরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এরপর কথনই আমার দেশকে গালমন্দ দিতে পারিনে। উদাহরণ চাও, প্রচুর দৃষ্টান্ত দিতে পারি। কিন্তু সেকথা বলে তোমার মনকে ক্লান্ত করতে চাইনে। শুধু তোমাকে এই কথা বলবো ইভন, দেশ আমার খারাপ নয়, আমরাই দেশকে বিদেশের কাছে হেয় করেছি।

রতন এবার একটু থামে। কিন্তু তার জবাব শুনে একটু বিরক্তি বোধ

করি। একটু কর্কশ কণ্ঠেই জবাব দিইঃ রতন, তুমি আমার দেশবাসীর তাদেরই একজন, যারা নিজের মন্দ শুনতে পারেনা। তোমরা চাও আত্মপ্রশংসা। দীর্ঘ সতেরো বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু উন্নতি আজও আমরা করতে পারিনি। আমাদের দুঃখ ঘোচেনি ···

আমার কথা শেষ হবার আগেই রতন বলেঃ তার কারণ আমরা কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। আমরা বাঁধন শৃঙ্খলার ভেতর থাকতে রাজী নই, দেশের দুঃখ কষ্টকে যদি আমরা হাসিমুখে বরণ করতাম, যে কষ্ট যুদ্ধের শেষে ইংরেজ-জর্মান করেছিলো, তাহ'লে আজ আমাদের এই দুর্দশা হতো না।

আমি রতনের কথাটা লুফে নিই। বলিঃ কিন্তু জর্মানীতে বা ইংল্যাণ্ডে দুর্নীতি ছিলোনা।

আমার জবাব শুনে রতন একটুও বিরক্তি বোধ করে না। বরং মৃদু হেসে জবাব দেয়ঃ হ্যাঁ, দুর্নীতি ছিলোনা। আর নীতিগ্রস্ত হয়নি, কারণ দেশবাসীদের ভেতর ডিসিপ্লিন ছিলো। যাক, এ নিয়ে তর্ক করবো না। শুধু এইটুকু বলবো, দেশের বাইরে যতোই নিজের মাতৃভূমির নিন্দে শুনছি ততোই দেশে ফিরে যাবার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ইভন, আমি তাই ঠিক করেছি দেশে ফিরবো।

কিন্তু আমি দেশে ফিরতে চাইনে।

তাহলে আজ তোমার কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে। কারণ পৃথক মতাবলম্বী হয়ে কখনই ঘর সংসার করতে পারিনে। আমি দেশকে ভালবাসি ···

রতনের কথা শেষ হবার আগেই আমি প্রতিবাদ করে বলিঃ তুমি কী বলতে চাও আমি দেশকে ভালবাসি নে?

আগুনের বাইরে থেকে আগুনের তাপ কতো বোঝা যায় না। তোমরা লণ্ডন পারী ইয়র্কে থেকে ভারতবর্ষ এবং ভারতের নীতি, সমাজ, সরকার নিয়ে আলোচনা করো—তোমরা যারা দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে বর্তমানের ভারতকে গালমন্দ করতে চাও, আমি বলবো তোমরা কাপুরুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জর্মানীর বিমান আক্রমণে লণ্ডন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো কিংবা লড়াই শেষে যখন জার্মানীর পরাজয় হলো, কই কেউতো তখন নিজের দেশকে গালমন্দ করেনি। হিটলার কতো অন্যায় করে গেছেন কিন্তু আজ অবধি ক'জন জর্মান তার নিন্দা বা জর্মানীর দোষারোপ করেছে। যাক্ ইভন, তোমার আমার পথ স্বতন্ত্র। তাই আজ হৃদয় বিনিময় করার আগে বিদায় নেওয়া যাক। তোমাকে আমি কখনই ভুল বুঝবো না। তুমি সুখ চাও। হয়তো আজকে দেশ তোমাকে লণ্ডন-পারীর সুখ দিতে পারবে না। কিন্তু আমার দেশের যৎকিঞ্চিৎ নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। তাই আমি ফিরতে চাই।

এই বলে রতন থামে। আমি কোন জবাব দিইনে। বুঝতে পারি রতনের দৃঢ়তা। যে সংকল্প সে করেছে, সেই পণ সে কখনই ভাঙবেনা। ওকে বোঝাতে যে আমি চেষ্টা করিনি এমন নয় কিন্তু ওর মন গিয়ে বসেছে দেশে। কোন প্রকারেই সেদিন ওর মত আমি পাল্টাতে পারিনি।

রতন দেশে ফিরে গেলো। শুনলাম, সেইখানে বোম্বাইর জে-জে হাসপাতালে কাজ নিয়েছে। আমি ফিরে এলাম প্যারীতে। আবার ভাষা শিখবার জন্যে স্কুলে ভর্তি হলাম। জীবনে যে আমার পরিবর্তন হয়নি সে কথা অস্বীকার করবোনা কিন্তু নিজের জীবনের পরিবর্তন বোঝবার ক্ষমতা সেদিন আমার ছিলোনা।

* * *

দীর্ঘ দু বছর বাদে ···

ইভন পেরেরা একটু চুপ করে। অন্ধকারের আলোয় আমি দেখতে পেলাম ওর চোখে জল এসেছে। তবে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকে : দীর্ঘ দুবছর বাদে একদিন লণ্ডনে ক্রীসমাসের ছুটিতে গিয়েছিলাম। আমারই এক বান্ধবী বড়দিনের রাত্রে তার এক বান্ধবীর বড়ী নিয়ে গেলো। সেদিন খুব হৈ-হল্লা হয়েছিলো। আমিও সেই হৈ-হল্লায় যোগ দিয়েছিলাম। নাচ-গান হলো। অনেকক্ষণ নেচে আমি ক্লান্ত হয়েছিলাম। বিশ্রাম নেবার জন্যে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, একটু বিশ্রাম করতে পারি কী?

নিশ্চয়। আমার শোবার ঘরে গিয়ে বসুন। আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না।

ভদ্রমহিলা আমারই সমবয়সী। তাই বিনা দ্বিধায় ওর ঘরে গেলাম।

অন্ধকারে প্রথমে ঘরের জিনিসপত্র আমার নজরে পড়েনি। কিন্তু তবু টেবিলের উপর একটা ছোট ছবি দেখলাম। খুবই পরিচিত চেহারা। তাই একটু ব্যস্ত হয়ে আলো জ্বালালাম। দেখলাম রতন মধুকরের ফটো। এই ফটোরই একটা কপি আমার কাছে ছিলো।

সেদিন ছবির রতন মধুকরকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। বিক্রমাদিত্য, দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ আপনার পরিচিত কারু কোন ছবি যদি দেখতে পান বা তার কোন খবর পান তাহলে আপনার মনের কী অবস্থা হয় একথা হয়তো আপনাকে বলতে হবে না। তাই সেদিন রতন মধুকরের ছবি দেখে আমিও একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম।

আমার এই উত্তেজনা ক্ষণিকের। একটু বাদেই আবার সবার সঙ্গে এসে বাইরের ঘরে বসলাম। প্রতি মুহূর্তেই আমি ভাবতে লাগলাম কী করে ভদ্রমহিলাকে রতন মধুকরের সংবাদ জিজ্ঞেস করি।

সেদিন প্রায় রাত বারোটা অবধি আমাদের হৈ-হল্লা চললো। ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করার কোন মৌকা মেলেনি। কিন্তু হৈ-হল্লা মেটবার পর

নিজের উৎকণ্ঠা মেটাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রতন মধুকরকে আপনি চেনেন ?

বিস্মিত হতবাক হয়ে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন ঃ রতন মধুকর ? আপনি চেনেন তাকে ?

বহুদিন আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো । আমি সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ় জবাব দিই ।

হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি । বেশ একটু গম্ভীর কণ্ঠেই ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন । এই জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ভারী গম্ভীর হলো । হয়তো তার গাম্ভীর্য আমার বান্ধবীকে একটু বিরক্ত করে । ভাবে আমার প্রশ্ন হয়তো অশোভনীয় হয়েছে । আত্মীয় স্বজন নিয়ে প্রশ্ন করা রুচিসঙ্গত নয় । তিনি এবার আমাদের আলোচনার বাধা দিলেন । তাই যাবার জন্য তাড়া দিলেন ।

আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম । হয়তো আমার এই কৌতূহল ভদ্রমহিলার নজর এড়ায় নি । তাই একটু মৃদু কণ্ঠে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন রতন মধুকর আমার দাদা, উনি আমার মাকে বাঁচিয়েছেন ।

এই প্রশ্নের জবাবে আমি কী যেন বলতে চাইছিলাম । বান্ধবী বাধা দিলেন । উনি ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ নমস্কার । আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইনে । আজকের পার্টি ভারী চমৎকার হয়েছে । উপভোগ করেছি, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

রতন মধুকর সম্বন্ধে আমার আরো জানবার আকাঙ্ক্ষা ছিলো । কিন্তু সেদিন জানবার অবকাশ পাইনি ।

পেয়েছিলাম বেশ কিছুদিন বাদে । শুনুন সেই কাহিনী ।

* * *

প্যারীতে ফিরে এসে রতন মধুকরের কাছে দুখানা চিঠি লিখলাম । প্রথমে লিখতে একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম । কিন্তু মনের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে চিঠি লিখলাম । কিন্তু বিক্রমাদিত্য, ওর কাছ থেকে কোন জবাব পাইনি । রতন মধুকরের এক বন্ধুর সঙ্গে আমার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ছিলো । তার নাম কিষেণলাল । এবার কিষেণের কাছে চিঠি দিলাম । বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো । জবাবের প্রতীক্ষায় দিন গুণেছি··· একদিন কিষেণের চিঠি পেলাম । কিষেণও ডাক্তার । রতনের সঙ্গে একই হাসপাতালে কাজ করতো ।

কিষেণের চিঠি আজ আমার সঙ্গে নেই বিক্রমাদিত্য, কিন্তু তার ভাষা এবং বক্তব্য স্পষ্ট মনে আছে । এই কাহিনী শেষ করার জন্যে সেই চিঠির সারাংশ মৌখিক আপনাকে দিচ্ছি ।

···মিস পেরেরা আপনার চিঠি পেয়ে যে বিস্মিত হইনি একথা বলবো না । এর কারণ বহুদিন আগেই আপনার কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশা করেছিলাম । আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়কে ভিত্তি করে কোন পত্রালাপ করা শোভন কিনা

জানিনে কিন্তু তবু আপনার চিঠি পাবো ভেবেছিলাম। কারণ আমি জানতাম রতন মধুকর আপনার বন্ধু।

রতনের কাছ থেকে আপনার বহু কথা শুনেছি কিন্তু যা শুনেছি সবই এক তরফা। অতএব আপনাদের মনোমালিন্যের কিছুটা আভাস পেলেও কাউকে দোষারোপ করার অধিকার আমার নেই।

মিস পেরেরা, রতন মধুকর আমার জীবনে এসেছিলো উল্কার মতো। লণ্ডনে পাঠ্যাবস্থায় ওর সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়েছিলো। আমাদের মতের পার্থক্য ছিলো কিন্তু বন্ধুত্বে ফাঁক ছিলো না।

রতন দেশকে ভালোবাসতো তাই আমরা ওকে দেশপ্রেমিক বলে ডাকতাম। সার্জারি পাশ করে যখন দেশে ফিরবার আহ্বান এলো বন্ধুদের ভেতর রতনই ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

রতন ভালো ডাক্তার। অপারেশনে পারদর্শিতার জন্যে তার নামডাক ছিলো। তাই যেদিন দেশে ফিরে যাবার ডাক এলো সেদিন আমরা তাকে উৎসাহ দিইনি। বলেছি, তোমার মতো প্রতিভাবান ডাক্তার, বিদেশে শুধু অর্থ নয়, খ্যাতিও অর্জন করবে। বিদেশে চাকুরী নাও। সেদিন রতন আমাদের প্রস্তাবে কান দেয়নি। হেসে জবাব দিয়েছিলো : আমি ভারতীয়। ভারতের বাইরে আমি যেখানেই যাইনে কেন, আমি বিদেশে অস্তিত্ব বিহীন। কিন্তু আমার দেশ, তার উপর আমার দাবী আছে, অধিকার আছে। আমরা সেদিন রতনকে বিদ্রূপ করেছিলাম। রতন আমাদের হেসে জবাব দিয়েছিল : কিষেণ, তোমার মা যখন বৃদ্ধা বা অসুস্থ হন তখন কী তুমি তাকে অবহেলা করো।

না। আমি জবাব দিই।

এই জন্যেই আমি ভারতবর্ষকে গালমন্দ করে সুনাম অর্জন করিনে। আজ দেশের বাইরে এসে ভুলে গেছি যে দেশের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। সেই দায়িত্বকে উপেক্ষা করি বলেই আজ আমার দেশের এই দুর্দিন। না কিষেণ, দেশকে অবহেলা করবো না। আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাবো।

দেশে ফিরে এসে রতন বোম্বাইর জে জে. হাসপাতালে কাজ নিলো। জানিনে কেন, রতনের কথায় আকৃষ্ট হয়ে আমিও দেশে ফিরে এলাম।

একই হাসপাতালে আমরা দুজনে কাজ করতাম। আমাদের হাসপাতালে রুগীর কী ভীড় হয় জানেন তো। তাই সমস্ত রুগী দেখবার পর অন্য কারুর সঙ্গে বড়ো একটা দেখাশোনা করার মতো ধৈর্য বা উৎসাহ আমার ছিলো না। বেশ কিছুদিন রতনের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। হঠাৎ একদিন দেখা হলো। কী কারণে, বলছি।

একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা আমার ওয়ার্ডে এলেন। টিউমার কেস। বেশ কঠিন কেস। অপারেশন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমি অপারেশন

করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। বলতে পারেন সাহস হয়নি। রতন টিউমার অপারেশনে পারদর্শী। অন্ততঃ আমার চাইতে তার হাত নিপুণ। বাধ্য হয়ে রতনের শরণাপন্ন হতে হলো।

কেসটা রতন হাতে নিলো। শুধু হাতে নিলো নয়, বললে অপারেশন অবিলম্বে করা দরকার।

অপারেশন বেশ নির্বিঘ্নে হয়ে গেলো। অপারেশন করার সময় পুঁজ বার করার দরকার হলো। রতন বললে—টিউব দিয়ে সেই পুঁজ চুষে বার করবে। আমি বাধা দিলাম। বললাম : পাগল হয়েছিস। এ মারাত্মক কাজ। কক্ষনো করিসনে। অনেক বিপদ আছে। কোন প্রকারে সেই পুঁজ কিংবা কোন বীজাণু যদি মুখে যায় তাহলে তোকে প্রাণ দিতে হবে।

হেসে রতন জবাব দিলো : কিষেণ, ডাক্তার হয়ে প্রাণের মায়া করবো এ কখনও কল্পনা করিনি।

আমার বাধা আর আপত্তি অগ্রাহ্য করে রতন টিউব দিয়ে পুঁজ চুষে বার করলো।

রোগী বাঁচলো বটে কিন্তু তার পরিবর্তে প্রাণ দিলে রতন।

* * *

অপারেশনের প্রায় দিন পাঁচেক বাদে হঠাৎ একদিন রতনের মুখ ফুলে উঠলো। আমাদের সিনিয়র ডাক্তার ওকে দেখলেন বললেন, পুঁজের বীজাণু মুখে গিয়ে সেপটিক হয়েছে। বাঁচবার আশা কম। আজকালকার দিনে সেপটিকের হাত থেকে রেহাই পাওয়া মুস্কিল নয়। কিন্তু রতনের কেস বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমি স্তম্ভিত—হতবাক। অন্যের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে রতন প্রাণ দিলো। ডাক্তার হয়ে কখনই কল্পনা করিনি রুগীর জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু রতন নিজের হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নিলো।

মৃত্যুকে কিন্তু রতন একটুও ভয় পায়নি। ডাক্তার যখন জবাব দিয়ে গেলেন তখনও রতনের মুখে ম্লান হাসি। সেদিন আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারিনি। বলি : রতন এ তুই কী করলি! বোম্বাইর চিকিৎসক মহলে তোর ছিলো প্রতিপত্তি। তোর সমস্ত জীবন এখনও যে পড়ে ছিলো। তুই কতো বড়ো হতে পারতিস। দেশের উপকার হতো।

রতন জবাব দিলো : আমি দেশের উপকারে আসিনি একথা অস্বীকার করবনা। হয়তো আজ আর আমার প্রয়োজন নেই। তাই আজ মৃত্যুর ডাক পড়েছে।

জানিস কিষেণ শুধু দেশকে ভালোবাসাই ধর্ম নয়—দেশবাসীকে নিজের আপনজন, পরম নিকট আত্মীয় করে নেওয়াই হলো দেশ সেবার নিদর্শন। তুইতো কতোদিন আমাকে বলেছিস এ সহস্র জনতার মঙ্গল, তার সেবা—

আমরা দুজনে কী করে করবো। আমরা দুজনে হলাম সমুদ্রের এক বিন্দু। কিন্তু তবু আমি নিজেকে তুচ্ছ বলে স্বীকার করিনি। ভেবেছি, এই জনতার একজনেরও যদি কোন উপকার করতে পারি তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে। এমনি করে আমরা সবাই যদি সমাজের কাজ করি তাহলে আমাদের জীবন কখনই ব্যর্থ হবেনা।

কিষেণ, দীর্ঘকাল তুই আর আমি দেশের বাইরে কাটিয়েছি। প্রবাসে কী দেখেছি—কী শুনেছি ? দেখেছি ভারতের দৈন্য, শুনেছি ভারতের ধিক্কার। বহুজনার এই সমালোচনা আমাকে ভারত প্রেমের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাই নিজেকে কখনই বড়ো মনে করিনি—দেশবাসীকেই দিয়েছি বড়োর আসন। আজ এই সংসার ত্যাগ করতে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি যে, আমি কর্তব্যের কোন অবহেলাই করিনি।

মিস পেরেরা, রতন মারা যাবার আগে দুঃখ করেনি—ভয়ও পায়নি। শুধু শেষ কথা বলেছিলো—দেশের মাটিতে মরতে পারলাম এই আমার সবচাইতে বড়ো গৌরব। বিদেশে বড়ো ডাক্তার হয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু দেশের মাটি পেতাম না।

* * *

এবার ইভন পেরেরা একটু চুপ করে। প্লেনের যাত্রীরা তখনও প্রায় ঘুমিয়ে আছে।

ইভন পেরেরার কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

আমি স্তব্ধ হয়ে তার কথাগুলো শুনলাম। রতন মধুকরের জীবনী সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছিলো। ছন্নছাড়া যাযাবর আমি। দেশ-দেশান্তরে ঘুরি। কতো পরিচিত অপরিচিতের সংস্পর্শে এসেছি তার হিসেব নিকেশ রাখিনি। কারু জীবনের কাহিনী আমার জীবনে রেখাপাত করেনি। কিন্তু রতন মধুকরের জীবন সত্যিই আমার জীবনকে নাড়া দিয়েছিলো। কেন জানিনে। আপনি যদি ইভন পেরেরার কাহিনীর শ্রোতা হতেন তাহলে আপনি রতন মধুকরের জীবন কাহিনীতে আকৃষ্ট হতেন, দেশের প্রতি আমার গাঢ় ভালোবাসা প্রীতি যা—দেশে থেকে আমি অনুভব করিনি। কিন্তু দীর্ঘকালের প্রবাসী হয়ে আমিও যেন রতন মধুকরের মতো হয়েছিলাম।

ইভন পেরেরাকে কোন সহানুভূতি জানাতে পারিনি। কারণ সেদিন রতন মধুকরের দেশপ্রেমের কাছে ইভন পেরেরা এবং রতনের ভালোবাসা ম্লান হয়ে গিয়েছিলো।

* * *

তারপর বেশ খানিকক্ষণ আমরা চুপচাপ ছিলাম। ইভন পেরেরাই নিস্তব্ধতা ভাঙলো। বললে : মরবার আগে একবারও রতন আমার কথা বলেনি। ইচ্ছে করেই কিষেণকে লিখেছিলাম যে, আমার কথা মৃত্যুর আগে কখনও উল্লেখ করেছে

কিনা? তার সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়েছিলাম: না। কারণ আমি জানতাম যে, রতনের জীবনে আমার চাইতে বড়ো এবং মহান ছিলো তার দেশ এবং দেশবাসী।

ইভন পেরেরা আবার একটু থামে। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে: বিক্রমাদিত্য, ঐ পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। প্রভাতের আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! আর ঐ মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, বহুদূরে মাটির বুকে ক্ষীণ প্রদীপের মতো জ্বলছে বোম্বাইর বাতি। প্রভাতের আলোয় স্তিমিত হয়ে গেছে।

বিক্রমাদিত্য, আমরা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছি। যে ভারতের তীব্র মোহ রতনকে বিদেশ থেকে টেনে এনেছিলো। যে দেশের মাটি আপনাকে আমাকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই দেশ ঐ সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠছে।

আমি নীচে মাটির দিকে তাকাই। ক্রমে ক্রমে দূরে বোম্বাইর ক্ষীণ আলো সতেজ হয়ে ওঠে।

আরব বেদুইনের নেশা ভেঙ্গে যায়। একটু বাদেই তীব্র আর্তনাদ করে প্লেন এসে বোম্বাইর বিমানবন্দরে থামলো।

আমার কাহিনীও এইখানে শেষ হলো।